যুক্তিবিদ্যা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোডঃ HSC- 2860

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

এইচএসসি প্রোগ্রাম

যুক্তিবিদ্যা

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : **HSC- 2860**

রচনা

নাজনীন জাহান
মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

সম্পাদনা
মোস্তফা নাজমুল মানছুর

সমন্বয়কারী

নাজনীন জাহান

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

যুক্তিবিদ্যা
দ্বিতীয় পত্র
কোর্স কোড: HSC- 2860
এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল ঃ জুন, ২০১৮
পূণ: মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, ২০১৯
পূণ: মুদ্রণ ঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
অনলাইন ভার্সন ঃ জানুয়ারি, ২০২২

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

অক্ষর বিন্যাস ও পেইজ লে-আউট
শাহাবুদ্দিন মোল্লা

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN : 978-984-34-3177-6

প্রি-প্রেস কার্যক্রম
ডিটিপি পুল, পিপিডি বিভাগ, বাউবি



? কোর্স বই অনুসরণ করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ

কোর্স পরিচিতি

কোর্সের নাম : যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2860

জাতীয় উন্নয়ন ও গতিশীল জাতি গঠনে শিক্ষার বিকল্প নেই। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা এবং প্রাথমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যোগ্য করে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সমকালীন চাহিদা ও পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগের দিকটি বিবেচনায় রেখে **যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র** কোর্সটি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পাঠসামগ্রীটি স্ব-শিখন পাঠসামগ্রীরূপে রচনা করা হয়েছে। এ পাঠ্যসামগ্রী প্রণয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, শিক্ষালাভের প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। যেহেতু, এখানে পাঠসামগ্রী একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে, তাই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। পাঠসামগ্রীটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা, ইউনিট সম্পর্কীয় নির্দেশনা ও ইউনিট বিভাজন (পাঠ) দেয়া হয়েছে। আবার প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থী উদ্দেশ্য অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কীনা তা যাচাই করতে পারে। শিক্ষার্থীর কাছে পাঠটিকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও সহজতর করার জন্য বিষয় আলোচনার সময় মাঝে মাঝে 'শিক্ষার্থীর কাজ' সংযোজন করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী চিত্র সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ আলোচনার শেষে ঐ পাঠের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে (সারাংশ) দেয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীগণ পাঠটি পুনরায় যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে রয়েছে পাঠোত্তর মূল্যায়ন। এ অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নমালাসহ ইউনিটের শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন, রচনামূলক প্রশ্ন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের কাছে বইটি আনন্দময় পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি। এ বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দ্যেশ্যে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো:

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করুন।
- প্রথমে পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এ পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর পাঠের বিষয়বস্তু ভালভাবে অধ্যয়ন করুন। বিষয়বস্তু অধ্যয়নের পর উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হলো কীনা তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি উদ্দেশ্য অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোনো ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীর কাজ সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীর কাজ সম্পন্ন করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কী না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবারও পড়ুন।

টিউটোরিয়াল ক্লাস সম্পর্কিত পরামর্শ

ওপেন স্কুলের এ পাঠসামগ্রীটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য প্রতি মাসে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশ গ্রহণ করুন।

টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যসামগ্রীটির সমগ্র ইউনিটকে টিউটোরিয়াল ক্লাসের সংখ্যা অনুযায়ী ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত প্রথম অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে যেগুলো কঠিন/দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত করেছেন সেসব বিষয় বুঝতে সংশ্লিষ্ট টিউটরের সহায়তা নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো ইউনিট অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। নিচে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

					
কোর্স বই অনুসরণের পরামর্শ	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	অডিও	ভিডিও
					
শিক্ষার্থীর কাজ	সারাংশ	পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	প্রয়োজনে

	**কোর্স সমাপ্তির সময়**	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩৬ সপ্তাহ**

 অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য **যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র** বিষয়ের অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় সংশ্লিষ্ট আলোচনার বিষয়গুলো বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নোট করার জন্য কাগজ-কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

 **প্রয়োজনে**	**যে কোনো সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–** ১. আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর অথবা ২. **কোর্স সমন্বয়কারী** নাজনীন জাহান

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ইউনিট ১ : যৌক্তিক সংজ্ঞা ০১-২২

পাঠ ১.১ : যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা ০২
পাঠ ১.২ : সংজ্ঞা : পদ্ধতি ও প্রকারভেদ ০৫
পাঠ ১.৩ : সংজ্ঞা ও বর্ণনা ০৯
পাঠ ১.৪ : সংজ্ঞার নিয়মাবলি ১১
পাঠ ১.৫ : সংজ্ঞার নিয়মাবলি লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি ১৪
পাঠ ১.৬ : যৌক্তিক সংজ্ঞার গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা ১৮

ইউনিট ২ : যৌক্তিক বিভাগ ২৩-৪২

পাঠ - ২.১ : যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা ২৪
পাঠ - ২.২ : যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলি ২৭
পাঠ - ২.৩ : যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি ৩১
পাঠ - ২.৪ : দ্বিকোটিক বিভাগ এবং এর সুবিধা-অসুবিধা ৩৪
পাঠ - ২.৫ : যৌক্তিক বিভাগের গুরুত্ব ৩৭
পাঠ - ২.৬ : যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা ৩৯

ইউনিট ৩ : আরোহের প্রকারভেদ ৪৩-৯৮

পাঠ -৩.১ : আরোহের শ্রেণীবিভাগ ৪৪
পাঠ -৩.২ : বৈজ্ঞানিক আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য ৪৮
পাঠ -৩.৩ : বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য ৫২
পাঠ -৩.৪ : অবৈজ্ঞানিক আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য ৫৪
পাঠ -৩.৫ : অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য ৫৭
পাঠ -৩.৬ : বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক ৫৯
পাঠ -৩.৭ : সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ ৬২
পাঠ -৩.৮ : সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য ৬৭
পাঠ -৩.৯ : সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ ৬৯
পাঠ -৩.১০ : সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ ৭২
পাঠ -৩.১১ : সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব ৭৫
পাঠ -৩.১২ : পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য ৭৮
পাঠ -৩.১৩ : পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক ৮১
পাঠ -৩.১৪ : পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য ৮৩
পাঠ -৩.১৫ : যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ৮৫
পাঠ -৩.১৬ : যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে সম্পর্ক ৮৮
পাঠ -৩.১৭ : ঘটনা সংযোজন ও এর প্রকৃতি ৯১
পাঠ -৩.১৮ : ঘটনা সংযোজন সম্পর্কে মিলের অভিমত ৯৩
পাঠ -৩.১৯ : ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের পার্থক্য ৯৫

ইউনিট ৪ : প্রকল্প ৯৯-১৩৪

পাঠ -৪.১ : প্রকল্পের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা ১০০
পাঠ -৪.২ : প্রকল্পের উৎস ১০৪

পাঠ -৪.৩ : প্রকল্পের স্তর ১০৬
পাঠ -৪.৪ : প্রকল্পের প্রকারভেদ ১০৮
পাঠ -৪.৫ : প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম ও ঘটনা ১১১
পাঠ -৪.৬ : প্রকল্প সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা ১১৩
পাঠ -৪.৭ : কারণ ও নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প ১১৮
পাঠ -৪.৮ : ব্যাখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক প্রকল্প ১২১
পাঠ -৪.৯ : বৈধ বা সুসংগত প্রকল্পের শর্তাবলি ১২৩
পাঠ -৪.১০ : প্রকল্পের প্রমাণ ১২৭
পাঠ -৪.১১ : প্রকল্পের গুরুত্ব ১৩১

ইউনিট ৫ : কার্যকারণ সম্পর্ক প্রমাণ পদ্ধতি ১৩৫-১৯৬
পাঠ -৫.১ : কার্যকারণ নীতি ১৩৬
পাঠ -৫.২ : পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও এর প্রকৃতি ১৩৯
পাঠ -৫.৩ : পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও অপনয়ন সূত্র ১৪২
পাঠ -৫.৪ : অন্বয়ী পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র ১৪৫
পাঠ -৫.৫ : অন্বয়ী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ১৪৯
পাঠ -৫.৬ : অন্বয়ী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি ১৫২
পাঠ -৫.৭ : ব্যতিরেকী পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র ১৫৫
পাঠ -৫.৮ : ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ১৫৯
পাঠ -৫.৯ : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি ১৬২
পাঠ -৫.১০ : যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি ১৬৭
পাঠ -৫.১১ : যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ১৭০
পাঠ -৫.১২: যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি ১৭৩
পাঠ -৫.১৩ : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র ১৭৬
পাঠ -৫.১৪ : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ১৮০
পাঠ -৫.১৫ : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত অনুপপত্তিসমূহ ১৮৩
পাঠ -৫.১৬ : পরিশেষ পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র ১৮৬
পাঠ -৫.১৭ : পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ১৯০
পাঠ -৫.১৮ : ব্যবহারিক জীবনে পরীক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব ১৯৩

ইউনিট ৬ : ব্যাখ্যা ১৯৭-২১৬
পাঠ -৬.১ : ব্যাখ্যার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা ১৯৮
পাঠ -৬.২ : ব্যাখ্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ২০১
পাঠ -৬.৩ : ব্যাখ্যার প্রকারভেদ: বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক ব্যাখ্যা ২০৩
পাঠ -৬.৪ : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ ২০৫
পাঠ -৬.৫ : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিভিন্ন রূপ ২০৯
পাঠ -৬.৬ : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতাসমূহ ২১২

ইউনিট ৭ : শ্রেণিকরণ ২১৭-২৩৬
পাঠ -৭.১ : শ্রেণিকরণের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও নিয়মাবলি ২১৮
পাঠ -৭.২ : শ্রেণিকরণের ভিত্তি ২২২
পাঠ -৭.৩ : শ্রেণিকরণের প্রকারভেদ ২২৪
পাঠ -৭.৪ : প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ ২২৯
পাঠ -৭.৫ : শ্রেণিকরণের সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ ২৩৩

ইউনিট ৮ : সম্ভাব্যতা.....২৩৭-২৫৯
পাঠ -৮.১ : সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা ২৩৮
পাঠ -৮.২ : সম্ভাব্যতার প্রকৃতি ও ভিত্তি ২৪১
পাঠ -৮.৩ : আকস্মিকতা: প্রকৃতি ও অপনয়ন ২৪৫
পাঠ -৮.৪ : সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সম্পর্ক ২৪৯
পাঠ -৮.৫ : সম্ভাব্যতা ও আরোহ ২৫২
পাঠ -৮.৬ : সম্ভাব্যতা পরিমাপের নিয়মাবলি ২৫৫

পরিশিষ্ট
নমুনা প্রশ্ন ও মানবন্টন ২৬০-২৬৮
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ২৬৯

যৌক্তিক সংজ্ঞা
(Logical Definition)

ইউনিট ১

ভূমিকা

যে পদ্ধতির সাহায্যে শব্দ বা পদের অর্থ সহজ, সরল ও সুনির্দিষ্ট করা যায় তাই যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞা হিসেবে পরিচিত। যুক্তিবিদ্যার জনক গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল (Aristotle) সর্বপ্রথম কোনো বিষয়ে যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদানের প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেন। তবে আধুনিক ও সমকালীন যুক্তিবিদ্যায় এল. এস. স্টেবিং (L.S. Stebbing), আাই. এম. কপি (I. M. Copi), এম. আর. কোহেন (M.R. Cohen), ই. নেগেল (E. Nagel), এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (H.W.B. Joseph), জন হসপার্স (John Hospers) প্রমুখ যুক্তিবিদদের চিন্তায় যৌক্তিক সংজ্ঞার ধারণাটি বিকশিত হয়। একটি শব্দ বা পদের প্রকৃত অর্থ কী অথবা একটি বস্তু বা বিষয় প্রকৃতপক্ষে কী- তা অনুধাবন করতে না পারলে সঠিকভাবে যুক্তি প্রদান করা সম্ভব নয়। যৌক্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে শব্দ বা পদের দ্ব্যর্থকতা অপসারণ, অর্থের স্পষ্টকরণ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যায়। তাই যুক্তিবিদ্যায় যৌক্তিক সংজ্ঞার আলোচনা অপরিহার্য। বর্তমান ইউনিটে আমরা যৌক্তিক সংজ্ঞা, এর প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা, সংজ্ঞা দানের পদ্ধতি, সংজ্ঞা ও বর্ণনা, সংজ্ঞার নিয়মাবলি ও নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি এবং এর গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময় : সর্বোচ্চ ০৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১: যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা
পাঠ-১.২: সংজ্ঞা : পদ্ধতি ও প্রকারভেদ
পাঠ-১.৩ : সংজ্ঞা ও বর্ণনা
পাঠ-১.৪: সংজ্ঞার নিয়মাবলি
পাঠ-১.৫: সংজ্ঞার নিয়মাবলি লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি
পাঠ-১.৬: যৌক্তিক সংজ্ঞার গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা

পাঠ-১.১ যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা (Nature and Relevance of Logical Definition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

যৌক্তিক সংজ্ঞার অর্থ (Meaning of Logical Definition)

সংজ্ঞার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো `Definition'। `Definition' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ `Definitio' হতে উদ্ভূত। Definitio শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুর মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করা। কোনো কিছুর মূল বৈশিষ্ট্য হলো, যে বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া কোনো একটি বস্তু বা বিষয় আর সে বস্তু বা বিষয় বলে গণ্য হতে পারে না। তাই সংজ্ঞা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বলা যায় যে, একটি পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ (মূল বৈশিষ্ট্যগুলো) স্পষ্ট করে প্রকাশ করাই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা। যেমন, মানুষ পদটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলি, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব'। আমরা জানি মানুষ পদটির সম্পূর্ণ জাত্যর্থ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি ও জৈববৃত্তি। অর্থাৎ এখানে মানুষ পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে এর সম্পূর্ণ জাত্যর্থ বা মূল বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ' মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব'- এ সংজ্ঞাটি মানুষ পদের যথার্থ সংজ্ঞা।

যুক্তিবিদ ওয়েল্টন (Welton) তাঁর *Manual of Logic* গ্রন্থে যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, "কোনো পদের জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা।" (" Definition is the explicit statement of the connotation of a term." Vol-1,1922, p. 107)।

যুক্তিবিদ ল্যাটা ও ম্যাকবেথ (Latta and Macbeath) তাঁদের *The Elements of Logic* গ্রন্থে যৌক্তিক সংজ্ঞার আলোচনায় বলেন, "সংজ্ঞা হলো কোনো সংজ্ঞায়িত বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিবৃতি; অথবা, আধুনিক ভাষায় এটি হলো একটি পদের জাত্যর্থের সুস্পষ্টকরণ।" ("A definition is thus a of the whole essential nature of the things defined, or, in modern language, it is the explicit statement of the connotation of a term. " 1929, P. 143)

যুক্তিবিদ এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (H.W.B. Joseph) তাঁর *An Introduction to Logic* গ্রন্থে বলেন, "কোনো বিষয়ের সংজ্ঞা হলো তার সারবস্তুর বিবৃতি যা শুধু ঐ বিষয়টিকেই নির্দেশ করে, অন্য কিছুকে নয়।" ("The definition of anything is the statement of its essence what makes it that, and not something else. " 1916, P. 72)

সুতরাং উপরোল্লেখিত যুক্তিবিদগণের মতামতের আলোকে বলা যায় যে, কোনো শব্দ বা পদের সারধর্ম যথার্থভাবে প্রকাশের মাধ্যমে এর সঠিক অর্থ বা প্রকৃত পরিচয় নির্ধারণ করার প্রক্রিয়াকেই যৌক্তিক সংজ্ঞা বলে।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি (Nature of Logical Definition)

যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যুক্তিবিদ্যা যুক্তিপদ্ধতি বা অনুমান ছাড়াও কতকগুলো সহায়ক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে, যে প্রক্রিয়াগুলো যুক্তি বা অনুমান গঠনে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। যৌক্তিক সংজ্ঞা এ প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত কোনো পদের অর্থ ও তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যই তার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। যৌক্তিক সংজ্ঞা আমাদেরকে একটি জিনিস আসলে কী এবং কী নয় তা বুঝতে সহায়তা করে। এটি মূলত একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কেননা এর সাহায্যে একটি পদের পরিপূর্ণ জাত্যর্থ প্রকাশ করে তার বিজ্ঞানসম্মত রূপ ও প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা হয়। উল্লেখ্য, কোনো পদের প্রকৃত অর্থ কেবল যৌক্তিক সংজ্ঞার সাহায্যেই

প্রকাশ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে এল. এস. স্টেবিং (L.S. Stebbing) তাঁর *Introduction to Logic* বইয়ে বলেন, "সংজ্ঞা হলো একটি শব্দের অর্থ বোঝার একমাত্র উপায়" ("Definition is only one of the means through which we come to understand words. " 1942, P. 422) আবার যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুক্তিবিদ হাওয়ার্ড কাহেনও প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি তাঁর *Logic and Philosophy* গ্রন্থে বলেন, "একটি সংজ্ঞা হলো একটি শব্দ (বা শব্দ সমষ্টির) অর্থ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা।" ("A definition is an explanation of the meaning of a word (or phrase)." P. 176)। যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি সম্পর্কিত এ আলোচনা থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করতে পারি:

১। যৌক্তিক সংজ্ঞা সব সময়ই একটি পদ বিষয়ক প্রক্রিয়া। কারণ পদকে কেন্দ্র করেই এর আলোচনা আবর্তিত।

২। যৌক্তিক সংজ্ঞা হচ্ছে জাত্যর্থের একটি পরিপূর্ণ বর্ণনা। কারণ কোনো পদের অর্থ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করার একমাত্র উপায় হলো এর জাত্যর্থকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা। জাত্যর্থ বলতে বোঝায় পদের সাধারণ ও অনিবার্য গুণসমূহকে যা ঐ পদের অন্তর্গত সকল সদস্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

৩। যৌক্তিক সংজ্ঞা কেবলমাত্র শ্রেণিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সকল পদের ক্ষেত্রে এটি প্রজোয্য নয়। কেবল শ্রেণিবাচক পদকেই সংজ্ঞায়িত করা যায়, ব্যক্তিবাচক পদের বা বিশিষ্ট বস্তুর সংজ্ঞা দেয়া যায় না। কারণ ব্যক্তিবাচক পদের বা বিশিষ্ট বস্তুর অসংখ্য বৈশিষ্ট্য থাকে।

৪। যৌক্তিক সংজ্ঞার দু'টি দিক রয়েছে। যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলে এর মধ্যে দু'টি দিক লক্ষ্য করা যায়। যথা- সংজ্ঞেয় (Definiendum) ও সংজ্ঞার্থ (Definiens) । যে পদটির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় তাকে 'সংজ্ঞেয়' বলে এবং যে সব শব্দ ব্যবহার করে পদটির সংজ্ঞা নির্ণয় করা হয় তাকে 'সংজ্ঞার্থ' বলে। যেমন, মানুষ পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় "মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব"। এখানে 'মানুষ' পদটি হচ্ছে সংজ্ঞেয়। আর 'বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব'- এ শব্দগুচ্ছ হলো সংজ্ঞার্থ।

৫। যৌক্তিক সংজ্ঞা সব সময় একটি সমীকরণ নির্দেশ করে। অর্থাৎ সংজ্ঞেয় ও সংজ্ঞার্থ - এ দু'য়ের ব্যক্তর্থ সব সময় সমান হয়। যেমন, সংজ্ঞেয় = 'মানুষ' এবং সংজ্ঞার্থ = 'বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব' এদের উভয়ই একই পরিমাণ ব্যক্তর্থ প্রকাশ করে। কারণ 'মানুষ' বলতে যা বোঝায়, 'বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব' বলতেও তাই বোঝায়। আর এ কারণেই বলা হয়, সংজ্ঞেয় = সংজ্ঞার্থ।

৬। যৌক্তিক সংজ্ঞা কেবল জাত্যর্থক পদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অজাত্যর্থক পদের সংজ্ঞা দেয়া যায় না। কারণ কোনো অজাত্যর্থক পদকে তার আসন্নতম জাতি (proximate genus) ও বিভেদক লক্ষণ (differentia) - এ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য কোনো উপজাতির সবচেয়ে নিকটবর্তী জাতিকে বলা হয় আসন্নতম জাতি। আর যে গুণের জন্য একই জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উপজাতি তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক তাকে ঐ উপজাতির লক্ষণ বা বিভেদক লক্ষণ বলে।

৭। যৌক্তিক সংজ্ঞা হচ্ছে কোনো শব্দ বা পদের ভাষাগত অর্থ সম্পর্কিত বিবরণ। এ বিবরণের সাহায্যে একটি পদের মূল বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।

যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা
(Relevance of Logical Definition)

আপনাদের অবগতির জন্য পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অনুমান তথা যৌক্তিক চিন্তা পদ্ধতি নির্ভুল ও সুসংগত হওয়ার জন্য যুক্তিবিদ্যায় কিছু সহায়ক বা আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন। এ সহায়ক বা আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে যৌক্তিক সংজ্ঞা অন্যতম। কারণ যৌক্তিক সংজ্ঞা পদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নির্ণয়ের মাধ্যমে জাত্যর্থ সম্পর্কিত জ্ঞান স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ যৌক্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে শব্দ বা পদের অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকরূপে উপলব্দি করা যায়। তাই যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় যৌক্তিক সংজ্ঞার অবতারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এর প্রাসঙ্গিকতার দিকসমূহ নিম্নরূপ :

১। কোনো যুক্তিতে যুক্তিবাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত পদসমূহের সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অর্থ জানা না থাকলে সেই যুক্তির প্রয়োগ যথার্থ হয় না। তাই যুক্তির যথার্থ প্রয়োগের জন্য যৌক্তিক সংজ্ঞার আলোচনা যুক্তিবিদ্যায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

২। অনেক ক্ষেত্রে পদের অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করি। ফলে পদের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রয়োগ করলে পদের অর্থ স্পষ্ট ও বোধগোম্য হয়।

৩। যৌক্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে নতুন নতুন শব্দের সাথে আমাদের উত্তরোত্তর পরিচয় ঘটে। আর এভাবেই যৌক্তিক সংজ্ঞা আমাদেরকে শব্দের সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৪। যৌক্তিক সংজ্ঞা দুর্বোধ্য বিষয়কে সুবোধ্য করে, জটিল বিষয়কে সরল করে এবং কঠিন বিষয়কে সহজ করে। তাই যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত দুর্বোধ্য, জটিল ও কঠিন বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যর ক্ষেত্রে যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

৫। যৌক্তিক সংজ্ঞার দ্বারা যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ ও শব্দের দ্ব্যর্থকতা দূর করা যায়।

৬। যৌক্তিক সংজ্ঞা একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলে এর সাহায্যে মানব মনের বিভিন্ন বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা যায়।

৭। যুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে এর সহায়ক বিষয়াবলির, যেমন- পদ, যুক্তিবাক্য, সংযোজক, অনুমান ইত্যাদি ধারণার প্রাঞ্জলতার ক্ষেত্রে যৌক্তিক সংজ্ঞা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। তবে এটি যে কেবলমাত্র যুক্তিবিদ্যার আলোচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি খুবই প্রয়োজন। অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যার ন্যায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রেও যৌক্তিক সংজ্ঞা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রাসঙ্গিকতার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

একটি পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ স্পষ্ট করে প্রকাশ করাই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞা । যৌক্তিক সংজ্ঞা আমাদেরকে একটি বিষয় আসলে কী এবং কী নয় তা বুঝতে সহায়তা করে। যৌক্তিক সংজ্ঞা কেবলমাত্র শ্রেণিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। এটি সব সময় একটি সমীকরণ নির্দেশ করে। এর সাহায্যে শব্দ বা পদের অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকরূপে উপলব্ধি করা যায়। তাই যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় যৌক্তিক সংজ্ঞার অবতারণা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যুক্তিবিদ্যার ন্যায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রেও যৌক্তিক সংজ্ঞা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যৌক্তিক সংজ্ঞা হলো—
(i) একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া (ii) একটি শব্দের অর্থ বোঝার উপায়
(iii) একটি পদের জাত্যর্থের পরিপূর্ণ বর্ণনা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ii ও iii (খ) i, ii, ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

২। *An Introduction to Logic* গ্রন্থটি কে লিখেছেন ?
(ক) সক্রেটিস (খ) ওয়েল্টন (গ) ল্যাটা ও ম্যাকবেথ (ঘ) এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ

৩। যৌক্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে মানব মনের বিভিন্ন বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা যায়। কারণ-
(ক) এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া (খ) এটি একটি অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া
(গ) এটি একটি লৌকিক প্রক্রিয়া (ঘ) এটি একটি সরল প্রক্রিয়া

পাঠ-১.২ সংজ্ঞা : পদ্ধতি ও প্রকারভেদ (Definition : Methods and Classification)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সংজ্ঞা প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।
- সংজ্ঞার প্রকারভেদ বলতে পারবেন।
- সংজ্ঞার প্রকারভেদ সম্পর্কে আই.এম.কপির মত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা প্রদানের পদ্ধতি (Methods of Definition)

যুক্তিবিদ্যার জনক এরিস্টটল থেকে শুরু করে সমকালীন অনেক যুক্তিবিদ সংজ্ঞা প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। তবে আধুনিক পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ কপি শব্দ বা পদের সংজ্ঞা প্রদানের জন্য দু'টি পদ্ধতির কথা বলেছেন, যা অধিকতর গ্রহনযোগ্য। তাঁর মতানুসারে সংজ্ঞা প্রদানের এ পদ্ধতি দু'টি হলো—

১. ব্যক্ত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞা (Denotative Definition)
২. জাত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞা (Connotative Definition)

১। **ব্যক্ত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞা (Denotative Definition) :** সংজ্ঞায়নের যে পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট শব্দ বা পদের অন্তর্ভুক্ত বস্তু বা বিষয়ের উদাহরণ প্রদান করে শব্দ বা পদটির অর্থ বুঝানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে তাকে ব্যক্ত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞা বলা হয়। যেমন আমরা যদি 'অভিনেতা' পদটিকে সংজ্ঞায়িত করতে চাই তাহলে এ পদের অন্তর্ভুক্ত কয়েকজন অভিনয় শিল্পীর নাম উল্লেখ করে এর সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ মৌসুমী হামিদ, রাজ্জাক, শাবানা প্রমুখ অভিনয় শিল্পীর উদাহরণের সাহায্যে এ পদ্ধতিতে 'অভিনেতা' পদটিকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যুক্তিবিদগণের মতে, ব্যক্ত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞায়নের পদ্ধতিটি অধিকতর সহজ, সরল ও সুস্পষ্ট পদ্ধতি হলেও এ পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই একে সংজ্ঞায়নের যথার্থ পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

২। **জাত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞা (Connotative Definition) :** সংজ্ঞায়নের যে পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট যে কোনো জাতিবাচক পদকে এর পরিপূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট উল্লেখের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাকে জাত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞা বলা হয়। আর কোনো পদের জাত্যর্থ এর আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ নিয়ে গঠিত। তাই এ পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করেই সেই পদটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। আসন্নতম জাতি একটি পদ কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত তা নির্দেশ করে এবং বিভেদক লক্ষণ পদটিকে এর সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি থেকে পৃথক করে। যেমন, 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় বলা হয়, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী'। অর্থাৎ এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এর আসন্নতম জাতি 'প্রাণী' এবং বিভেদক লক্ষণ 'বুদ্ধিবৃত্তি' উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আসন্নতম জাতি 'প্রাণী' শব্দটি দ্বারা মানুষকে প্রাণী শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং 'বুদ্ধিবৃত্তি' নামক মানুষের বিভেদক লক্ষণ দ্বারা মানুষকে তার সমজাতীয় অন্যান্য উপজাতি যেমন- গরু, ঘোরা, মহিষ, ছাগল, বিড়াল ইত্যাদি থেকে পৃথক করা হয়েছে। এর ফলে মানুষের প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়েছে। আর এভাবে পদের অর্থ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করাকেই বলা হয় যৌক্তিক সংজ্ঞা। সংজ্ঞায়নের এ পদ্ধতিকে আধুনিক যুক্তিবিদদের অনেকেই একটি সহজবোধ্য ও গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি বলে মনে করেন।

সংজ্ঞার প্রকারভেদ (Classification of Definition)

বিখ্যাত আমেরিকান যুক্তিবিদ আই. এম. কপি (I. M. Copi)-র মতে যৌক্তিক সংজ্ঞাকে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যেতে পারে। যথা—

১. আরোপক সংজ্ঞা (Stipulative Definition)
২. আভিধানিক, আক্ষরিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞা (Lexical Definition)
৩. সুনির্দিষ্টকারী সংজ্ঞা (Precising Definition)
৪. তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা (Theoretical Definition)
৫. প্ররোচক বা প্রবর্তনকারী সংজ্ঞা (Persuasive Definition)

তবে সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনে প্রদর্শনমূলক বা প্রতীয়মান্য সংজ্ঞা (Ostensive Definition) ও ক্ষেত্রগত বা ক্ষেত্রিক সংজ্ঞা (Situational Definition) নামে আরো দু'ধরনের সংজ্ঞার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাই বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা মোট সাত প্রকারের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করব।

১। **আরোপক সংজ্ঞা (Stipulative Definition) ঃ** কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যখন আমরা স্বাধীনভাবে একটি নতুন শব্দ বা প্রতীক ব্যবহার করে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী সেই নতুন শব্দ বা প্রতীকের অর্থ প্রদান করি তখন তাকে আরোপক সংজ্ঞা (Stipulative Definition) বলে। অর্থাৎ স্বেচ্ছামূলক অর্থ আরোপ থেকে সৃষ্ট সংজ্ঞাকেই বলা হয় আরোপক সংজ্ঞা। এ ধরনের সংজ্ঞায় যে কোনো ব্যক্তি তার পছন্দ অনুযায়ী শব্দ আরোপ করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির উদ্দেশ্যই মূখ্য। তবে আরোপক সংজ্ঞার একটি পূর্বশর্ত হলো এই যে, কোনো শব্দকে যদি পূর্বে অন্য কোনো অর্থে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে আরোপক সংজ্ঞায় তাকে ব্যবহার করা যাবে না। **যুক্তিবিদ** আই. এম. কপি (I. M. Copi)-র মতে, এ ধরনের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে সত্যতা বা মিথ্যাত্ব কোনোটিই আরোপ করা যায় না। আর এ কারণেই আরোপক সংজ্ঞাকে তথ্যমূলক বলে আখ্যায়িত না করে নির্দেশনী বলে অভিহিত করা যায়। সাবেকী যুক্তিবিদ্যায় এ জাতীয় সংজ্ঞাকে নামিক সংজ্ঞা (Nominal Definition) বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে।

২। **আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞা (Lexical Definition) :** যে ধরণের সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের প্রচলিত ব্যবহার রীতির একটি প্রতিবেদন দেয়া হয় তাকেই আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞা বলা হয়। আমরা জানি সংজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পদের দ্ব্যর্থকতা নিরসন এবং যার উদ্দেশ্যে সংজ্ঞা প্রদান করা হচ্ছে তার শব্দভান্ডার বাড়ানো। কিন্তু আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের নতুন কোনো অর্থ প্রদান করা হয় না, বরং পূর্ব থেকেই যে অর্থ আছে তার উল্লেখ করা হয় মাত্র। আর এ কারণেই আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞা সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে। যেমন, 'তিনটি বাহু দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভুজ বলা হয়'- ত্রিভুজ সংক্রান্ত এ সংজ্ঞাটি সত্য। কিন্তু 'ত্রিভুজ হয় এমন বস্তু, যা কয়েকটি পর্বতের সমন্বয়ে গঠিত'- ত্রিভুজ সংক্রান্ত এ সংজ্ঞাটি মিথ্যা। এক্ষেত্রে আরোপক সংজ্ঞার সাথে আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞার একটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আর তা হলো, আরোপক সংজ্ঞায় পদের সংজ্ঞা দানের পূর্বে এর কোনো অর্থ থাকে না। কাজেই এ সংজ্ঞা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। অন্যদিকে আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞায় যেহেতু সংজ্ঞেয় পদের পূর্ব থেকে একটি স্বাধীন অর্থ থাকে সেহেতু সে অর্থ সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কি-না তার উপর নির্ভর করে এ সংজ্ঞা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞাকে অনেক সময় বাস্তব সংজ্ঞাও (Real Definition) বলা হয়।

৩। **সুনির্দিষ্টকারী সংজ্ঞা (Precising Definition) :** যে সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদের সাধারণ ব্যবহার অতিক্রম করে বা অস্পষ্টতা দূর করে এর একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা হয় তাকে সুনির্দিষ্টকারী সংজ্ঞা (Precising Definition) বলে। যুক্তিবিদ আই. এম. কপি (I. M. Copi)-র মতে, আরোপক সংজ্ঞা বা প্রতিবেদক সংজ্ঞা, এদের কোনোটিই পদের অস্পষ্টতা দূর করতে পারে না। অস্পষ্ট পদে সীমান্তবর্তী উদাহরণ (borderline case)-এর সম্ভাবনা থাকে। যার জন্য অনেক সময় একটি পদ কোথায় প্রযোজ্য, আর কোথায় প্রযোজ্য নয় তা নির্ধারণ করা যায় না। সুনির্দিষ্টকারী সংজ্ঞা এ অসুবিধা অনেকাংশে দূর করতে পারে। তাই কোনো পদের অস্পষ্টতা দূর করার জন্য সুনির্দিষ্টকারী সংজ্ঞা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জীবনের বাস্তবতায় আমরা লক্ষ্য করি যে, প্রায় প্রতিটি পদই কমবেশি অস্পষ্ট। কিন্তু অস্পষ্টতার মাত্রা যদি অধিক হয় তাহলে অনেক বাস্তব সমস্যার সৃষ্টি হয়। যেমন, 'ট্রাক' একটি অস্পষ্ট শব্দ। কারণ এমন অনেক মোটরযান আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে 'ট্রাক' শব্দটি প্রযোজ্য কিনা তা আমরা নিশ্চিত নই। এমতাবস্থায়, মোটরযান প্রস্তুতকারীদের

বা সরবরাহকারীদের উচিত কোন মোটরযানটি ট্রাক, আর কোনটি ট্রাক নয় তার একটি সুনির্দিষ্টকারী সংজ্ঞা প্রদান করা। তাহলেই কেবলমাত্র আমরা এ সংক্রান্ত একটি বাস্তব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি। পদের অস্পষ্টতা দূরীকরণে সুনির্দিষ্টকারী সংজ্ঞার এরূপ ভূমিকার কারণে একে কেউ কেউ যথাযথকরণের সংজ্ঞা বলেও অভিহিত করে থাকেন।

৪। **তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা (Theoretical Definition) :** যুক্তিবিদ আই. এম. কপি (I. M. Copi) নির্দেশিত চতুর্থ সংজ্ঞাটির নাম তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা। কোনো শব্দ বা পদকে যখন বিজ্ঞান বা কোনো তাত্ত্বিক মতবাদে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সংজ্ঞায়ন করা হয় তখন সেই সংজ্ঞাকে তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা (Theoretical Definition) বলে। তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদটি যে বস্তু সমষ্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তার একটি তত্ত্বগতভাবে পর্যাপ্ত এবং বৈজ্ঞানিকভাবে কার্যকর বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তাই কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এবং তাত্ত্বিক বোধের বিকাশ ঘটলে পূর্ববর্তী সংজ্ঞার স্থলে নতুন সংজ্ঞা গৃহীত হতে পারে। যেমন, বিজ্ঞানীরা তাপকে এক সময় পরিমাপের অযোগ্য তরল পদার্থ বলে ব্যাখ্যা করতেন। কিন্তু এখন তাঁরা তাপকে বস্তুর অণুর অনিয়মিত গতিজনিত শক্তি বলে মনে করেন। অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে 'তাপ' শব্দটির তাত্ত্বিক সংজ্ঞা দিয়ে আসছেন। আর এর ফলে তাপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ও তাত্ত্বিক উপলব্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫। **প্ররোচক বা প্রবর্তনকারী সংজ্ঞা (Persuasive Definition) :** যুক্তিবিদ আই. এম. কপি (I. M. Copi) নির্দেশিত সর্বশেষ সংজ্ঞাটির নাম প্ররোচক বা প্রবর্তনকারী সংজ্ঞা (Persuasive Definition)। যখন কারো অনুভূতিতে নাড়া দেয়ার জন্য কিংবা তার আচরণে পরিবর্তন আনয়নের জন্য কোনো শব্দ বা পদের সংজ্ঞায়ন করা হয় তখন সেই শব্দ বা পদের সংজ্ঞায়নকে প্ররোচক বা প্রবর্তনকারী সংজ্ঞা (Persuasive Definition) বলা হয়। অর্থাৎ অন্যের মনোভাবের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাই হচ্ছে প্ররোচক বা প্রবর্তনকারী সংজ্ঞার মূল কাজ। এ কারণে কোনো কোনো যুক্তিবিদ এ জাতীয় সংজ্ঞাকে প্রভাব বিস্তারকারী সংজ্ঞা বলেও অভিহিত করে থাকেন।

প্ররোচক বা প্রবর্তনকারী সংজ্ঞাটিকে জন হসপার্স (John Hospers) একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, বর্তমানে অনেক মানুষকে আমরা সংস্কৃতিবান বলি। কিন্তু এক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি দেখা দেয় তা হলো এই শব্দটি আমরা প্রথম কোথা থেকে পেলাম? জন হসপার্স (John Hospers)- এর মতে, শিল্প-কলার সাথে পরিচিত ব্যক্তিদেরকেই প্রথমে সংস্কৃতিবান বলা হতো। এক্ষেত্রে সংস্কৃতিবান শব্দটির জ্ঞানীয় অর্থ ছিল শিল্পকলার সাথে পরিচিতি। কিন্তু যেসব ব্যক্তি শিল্প-কলার সাথে পরিচিত ছিল তাদেরকে শ্রদ্ধার সাথে দেখা হতো বলে উত্তরকালে সংস্কৃতিবান শব্দটি পূর্বপ্রচলিত জ্ঞানীয় অর্থের সাথে শ্রদ্ধাসূচক শব্দ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবেই কালক্রমে শব্দটি শ্রদ্ধাসূচক অর্থে জনমানসে ব্যাপক পরিচিতি লাভে সক্ষম হয়। জন হসপার্স (John Hospers)- এর মতে, এভাবে আমরা একটি শব্দের সংজ্ঞার মাধ্যমে এর প্রচলিত জ্ঞানীয় অর্থের পরিবর্তে অন্য একটি অর্থ গ্রহণ করতেও বক্তাকে প্ররোচিত করি। আর একেই বলে **প্ররোচক সংজ্ঞা** (*An Introduction to Philosophical Analysis,* New Delhi, 1971.PP. 53-54)।

৬। **প্রদর্শনমূলক বা প্রতীয়মান্য সংজ্ঞা (Ostensive Definition) :** কোনো শব্দ বা পদ যে সব বস্তুর নির্দেশক, সেসব বস্তুর কতিপয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে যখন কোনো ব্যক্তির কাছে সংশ্লিষ্ট কোনো শব্দ বা পদের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয় তখন সেই ব্যাখ্যার প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় প্রদর্শনমূলক বা প্রতীয়মান্য সংজ্ঞা (Ostensive Definition)। এ জাতীয় সংজ্ঞায় কোনো পদকে সরাসরিভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বস্তু বা সত্ত্বার সাহায্যে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন, এ প্রক্রিয়ায় কাউকে লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, গোলাপী ইত্যাদি বর্ণনির্দেশক পদের অর্থ বুঝানোর জন্য তাকে এ সব বর্ণবিশিষ্ট বস্তুর উদাহরণের সাহায্যে পদগুলোর অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়। কোনো শব্দ বা পদের অর্থ নির্ধারণের এ প্রক্রিয়াই হচ্ছে প্রদর্শনমূলক বা প্রতীয়মান্য সংজ্ঞা। প্রদর্শনমূলক বা প্রতীয়মান্য সংজ্ঞার সাহায্যে যে ব্যক্তি তার জীবনে কখনো রঙীন বস্তু দেখেনি তাকেও যৌক্তিকভাবে রঙীন পদের অর্থ বোঝানো যেতে পারে।

৭। **ক্ষেত্রগত বা ক্ষেত্রিক সংজ্ঞা (Contextual Definition) :** কোনো শব্দ বা পদ যে বাক্যে ব্যবহৃত হয় সেই বাক্যটি যে পরিবেশ-পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয় সেই পরিবেশ-পরিস্থিতির নানাবিধ উপাদান বিশ্লেষণ করে ঐ শব্দ বা পদটির অর্থ নির্ধারণ করাকেই ক্ষেত্রগত বা ক্ষেত্রিক সংজ্ঞা (Contextual Definition) বলে। পাশ্চাত্যের সমকালীন বিশ্লেষণী দর্শনে ক্ষেত্রগত বা ক্ষেত্রিক সংজ্ঞার বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অধিকাংশ বিশ্লেষণী দার্শনিকের মতে, দার্শনিক বিশ্লেষণের মূল কাজই হলো বিভিন্ন পদের ক্ষেত্রগত সংজ্ঞা প্রদান করা। কারণ ক্ষেত্রগত সংজ্ঞার সাহায্যে অতি সহজেই অর্থহীন বিতর্কগুলোকে দর্শন থেকে অপসারণ করা যায়।

সারসংক্ষেপ

আধুনিক পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যায় শব্দ বা পদের সংজ্ঞা প্রদানের জন্য দু'টি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। সংজ্ঞা প্রদানের এ পদ্ধতি দু'টি হলো- ব্যক্ত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞা ও জাত্যর্থভিত্তিক সংজ্ঞা। আবার সংজ্ঞার প্রকৃতি অনুসারে যুক্তিবিদগণ মোট সাত প্রকারের সংজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো- আরোপক সংজ্ঞা, আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞা, সুনির্দিষ্টকারী সংজ্ঞা, তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা, প্ররোচক বা প্রবর্তনকারী সংজ্ঞা, প্রদর্শনমূলক বা প্রতীয়মান্য সংজ্ঞা ও ক্ষেত্রগত বা ক্ষেত্রিক সংজ্ঞা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। আরোপক সংজ্ঞায়-
(i) ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন শব্দ বা প্রতীকের অর্থ প্রদান করে থাকে
(ii) সত্যতা বা মিথ্যাত্ব কোনোটিই আরোপ করা যায় না (iii) ব্যক্তির উদ্দেশ্যই মূখ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ii ও iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

২। দার্শনিক বিশ্লেষণের মূল কাজই হলো-
(ক) বিভিন্ন পদের ক্ষেত্রগত সংজ্ঞা প্রদান করা (খ) প্রদর্শনমূলক বা প্রতীয়মান্য সংজ্ঞা প্রদান করা
(গ) আরোপক সংজ্ঞা প্রদান করা (ঘ) আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞা প্রদান করা

৩। প্রদর্শনমূলক বা প্রতীয়মান্য সংজ্ঞার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো-
(ক) Persuasive Definition (খ) Ostensive Definition
(গ) Theoretical Definition (ঘ) Precising Definition

পাঠ-১.৩ সংজ্ঞা ও বর্ণনা (Definition and Description)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সংজ্ঞা ও বর্ণনার প্রকৃতি বুঝবেন।
- সংজ্ঞা ও বর্ণনার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- সংজ্ঞা ও বর্ণনা কেন একই প্রকৃতির নয় তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সংজ্ঞা ও বর্ণনা (Definition and Description)

কোনো পদের অর্থ স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করার জন্য যৌক্তিক সংজ্ঞা ও বর্ণনা সম্পর্কিত আলোচনা যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সংজ্ঞা ও বর্ণনার প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার ফলে অনেকে কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে সে পদের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। তাই সংজ্ঞা ও বর্ণনার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা জানা প্রয়োজন। আমরা জানি, কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থের, অর্থাৎ পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণের উল্লেখ করাই হচ্ছে সংজ্ঞা। যেমন, যদি বলা হয় 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী' তাহলে এটি হবে মানুষ পদের একটি যথার্থ সংজ্ঞা। কারণ এখানে মানুষ পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ, অর্থাৎ আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উভয়ই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কোনো পদের ব্যাখ্যায় উপলক্ষণ বা অবান্তর অথবা উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ উভয়ই উল্লেখ করাই হচ্ছে বর্ণনা। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণনায় বর্ণনীয় বিষয়ের উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণের সাথে জাত্যর্থের অংশবিশেষও উল্লেখ করা হতে পারে। যেমন, যদি বলা হয় 'মানুষ হয় পালকহীন দ্বিপদবিশিষ্ট প্রাণী' তাহলে এটি হবে মানুষ পদের একটি বর্ণনা। কারণ এখানে মানুষ পদের জাত্যর্থের অংশবিশেষের সাথে এর উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং যৌক্তিক সংজ্ঞা ও বর্ণনা একই প্রকৃতির নয়, বরং উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। উল্লেখ্য যে গুণ কোনো একটি পদের জাত্যর্থ নয় অথচ জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় সে গুণকেই বলা হয় উপলক্ষণ। আর যে গুণ বা গুণাবলি কোনো পদের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নি:সৃতও হয় না তাকে অবান্তর লক্ষণ বলে।

সংজ্ঞা ও বর্ণনার পার্থক্য (Difference between Definition and Description)

সংজ্ঞা ও বর্ণনার প্রকৃতি সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে উভয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

১। কোনো পদের সংজ্ঞায় এর সম্পূর্ণ জাত্যর্থ, অর্থাৎ পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে, কোনো পদের বর্ণনায় উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণ অথবা উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ উভয়ই উল্লেখ করা হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্ণনায় বর্ণনীয় বিষয়ের উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণের সাথে জাত্যর্থের অংশবিশেষও উল্লেখ করা হতে পারে।

২। সংজ্ঞা হলো একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কারণ সংজ্ঞার মাধ্যমে একটি পদ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব। কিন্তু বর্ণনা হলো একটি লৌকিক প্রক্রিয়া। কারণ বর্ণনার মাধ্যমে কেবলমাত্র কোনো বিষয়েয় পরিচয় বা সম্ভাব্য ধারণা লাভ করা যায়।

৩। সকল পদের সংজ্ঞা দেয়া যায় না। সকল পদেরই বর্ণনা দেয়া যায়।

৪। কোনো পদের সংজ্ঞা সর্বদা সুনির্দিষ্ট। কারণ প্রত্যেক পদের জাত্যর্থ সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পদের বর্ণনা ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্নভাবে দেয়া যেতে পারে।

৫। অজাত্যর্থক পদ অর্থাৎ স্বকীয় নামবাচক পদ ও বিশিষ্ট গুণবাচক পদের জাত্যর্থ নেই বলে এ জাতীয় পদের সংজ্ঞা দেয়া যায় না। কিন্তু জাত্যর্থক ও অজাত্যর্থক সকল পদেরই বর্ণনা দেয়া যায়।

৬। পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করা তুলনামূলকভাবে এর বর্ণনা দেয়ার চেয়ে জটিল। কারণ কোনো পদের বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। কিন্তু কোনো পদের বর্ণনায় বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করার প্রয়োজন নেই বিধায় এটি তুলনামূলকভাবে সহজ।

৭। সংজ্ঞায় কতিপয় নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু বর্ণনায় কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয় না।

৮। সংজ্ঞায় সংশ্লিষ্ট নিয়ম অনুসরণ না করলে যৌক্তিক ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটে। পক্ষান্তরে বর্ণনায় কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয় না বলে এক্ষেত্রে যৌক্তিক ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটার অবকাশ থাকে না।

৯। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সংজ্ঞা সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বর্ণনা সর্বজনগ্রাহ্য হয় না।

১০। যে পদের সংজ্ঞা দেয়া হয় তার ব্যক্ত্যর্থ সর্বদা সংজ্ঞায় বর্ণিত পদের ব্যক্তর্থের সমান হয়ে থাকে। সুতরাং সংজ্ঞা হলো একটি গাণিতিক সমীকরণ তুল্য বিষয়। কিন্তু যে পদের বর্ণনা দেয়া হয় তার সাথে উদ্ধৃত বর্ণনার কোনো প্রকার সমীকরণের সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না।

সুতরাং সংজ্ঞা ও বর্ণনা কোনোভাবেই এক হতে পারে না, এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

শিক্ষার্থীর কাজ : সংজ্ঞা ও বর্ণনার মধ্যেকার পার্থক্যসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

সংজ্ঞা ও বর্ণনার প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। কোনো পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থের উল্লেখ করাই হচ্ছে সংজ্ঞা। অন্যদিকে কোনো পদের ব্যাখ্যায় উপলক্ষণ বা অবান্তর লক্ষণ অথবা উপলক্ষণ ও অবান্তর লক্ষণ উভয়ই উল্লেখ করাই হচ্ছে বর্ণনা। সংজ্ঞা হলো একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। কিন্তু বর্ণনা হলো একটি লৌকিক প্রক্রিয়া। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সংজ্ঞা সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে বর্ণনা সর্বজনগ্রাহ্য হয় না। সুতরাং সংজ্ঞা ও বর্ণনা কোনোভাবেই এক নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোনো পদের সংজ্ঞায় এর—
(ক) সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয় (খ) আংশিক জাত্যর্থ উল্লেখ করা হয়
(গ) বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করা হয় (ঘ) আসন্নতম জাতি উল্লেখ করা হয়

২। সংজ্ঞা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে—
(i) সংজ্ঞার ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম অনুসরণ করতে হয়
(ii) বর্ণনার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয় না
(iii) সংজ্ঞা ও বর্ণনা উভয়ের ক্ষেত্রেই কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হয় না

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ii ও iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-১.৪ সংজ্ঞার নিয়মাবলি (Rules of Definition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সংজ্ঞার নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- সঠিকভাবে সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন নিয়ম লঙ্ঘনে কোন অনুপপত্তি ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সংজ্ঞার নিয়মাবলি (Rules of Definition)

আমরা জানি, কোনো পদের পূর্ণ জাত্যর্থের সুস্পষ্ট বিবৃতির মাধ্যমে ঐ পদের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। আর কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে যাতে এর জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে ও শুদ্ধরূপে উল্লেখ করা যায় সে উদ্দেশ্যে যুক্তিবিদগণ কতগুলো নিয়ম বা বিধি প্রণয়ন করেছেন। এ নিয়ম বা বিধিসমূহই যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ে যৌক্তিক সংজ্ঞা হিসেবে পরিচিত। যৌক্তিক সংজ্ঞায়নে এ নিয়ম বা বিধিসমূহ অনুসরণ না করলে যৌক্তিক ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটে। নিম্নে এ নিয়মগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম নিয়ম ঃ কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে সেই পদটির সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, কোনোক্রমেই জাত্যর্থের অতিরিক্ত কিছু বা জাত্যর্থের অংশবিশেষ উল্লেখ করা যাবে না। অর্থাৎ এ নিয়ম অনুসারে, কোনো পদের সংজ্ঞায়নের সময় শুধুমাত্র এর আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হবে, এর বেশিও নয় কমও নয়। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে যে সকল যৌক্তিক ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটে সেগুলো নিম্নরূপ :-

(ক) বাহুল্য সংজ্ঞা (Redundant Definition) : সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি যদি 'উপলক্ষণ' হয়, তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে বাহুল্য সংজ্ঞা (Redundant Definition) বলে। যেমন, 'মানুষ হয় এমন প্রাণী যার বিচার ক্ষমতা আছে'-মানুষের এ সংজ্ঞাটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট। কারণ এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় 'বিচার ক্ষমতা' গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে যা এর একটি উপলক্ষণ।

(খ) অতি ব্যাপক বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Too Wide or Incomplete Definition) : কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি জাত্যর্থের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে অতি ব্যাপক বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা (Fallacy of Too Wide or Incomplete Definition) বলে। সাধারণত একটি পদ দ্বারা যে বিষয় বা বস্তুসমূহকে নির্দেশ করা হয় সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে যদি সে পদের ব্যপকতা তার চেয়ে বেড়ে যায় তখন পদটি অতিব্যাপক বলে ধরা হয়। যেমন, 'মানুষ হয় এক শ্রেণীর প্রাণী' -মানুষের এ সংজ্ঞাটি অতি ব্যাপক বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দোষে দুষ্ট। কারণ এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় মানুষ কী ধরনের প্রাণী তা উল্লেখ না করায় অন্যান্য প্রাণী থেকে মানুষকে পৃথক করা যায়নি। অর্থাৎ এখানে মানুষ পদের সংজ্ঞায় অন্যান্য প্রাণীও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে সংজ্ঞাটি অসম্পূর্ণ এবং এতে অতি ব্যাপক অনুপপত্তি ঘটেছে।

(গ) আপতিক বা অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা (Accidental Definition) : সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি যদি 'অবান্তর লক্ষণ' হয়, তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে আপতিক বা অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা (Accidental Definition) বলে। যেমন, 'মানুষ হয় এক শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হাস্যপ্রিয় প্রাণী '-মানুষের এ সংজ্ঞাটি আপতিক বা অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা দোষে দুষ্ট। কারণ এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় 'হাস্যপ্রিয়তা' গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে যা এর একটি অবান্তর লক্ষণ।

(ঘ) অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Too Narrow Definition) : সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি যদি 'বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ' হয়, তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Too Narrow Definition) বলে। সাধারণত একটি পদ দ্বারা যে বিষয় বা বস্তুসমূহকে নির্দেশ করা হয় সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে যদি সে পদের ব্যপকতা তার চেয়ে কমে যায় তখন পদটি অব্যাপক বলে ধরা হয়। যেমন, 'মানুষ হয় এক শ্রেণির সভ্য বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী '-মানুষের এ সংজ্ঞাটি অব্যাপক সংজ্ঞা দোষে দুষ্ট। কারণ এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় 'সভ্য' গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে যা এর একটি বিচ্ছেদ্য অবান্তর লক্ষণ। আর 'সভ্য' গুণটি উল্লেখ করায় এখানে মানুষ পদের সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশিত হয়নি বলে এ সংজ্ঞাটিতে অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

দ্বিতীয় নিয়ম ঃ সংজ্ঞেয় পদের ব্যক্তর্থ সংজ্ঞায় বর্ণিত পদের ব্যক্তর্থের সমান হতে হবে, এর কম বা বেশি হলে চলবে না। যেমন, মানুষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যখন বলা হয়, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী' তখন 'মানুষ'-এর ব্যক্তর্থ এবং 'বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী'-এর ব্যক্তর্থ পরস্পর সমান। তাই সংজ্ঞাটি যথার্থ। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে দু'ধরনের যৌক্তিক ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটে। যথা- (ক) অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ও (খ) অতিব্যাপক বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এ পাঠে উল্লেখিত প্রথম নিয়মটি লঙ্ঘনেও এ যৌক্তিক ভ্রান্তি বা অনুপপত্তিদ্বয় সংঘটিত হয়েছে।

(ক) অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of too Narrow Definition) : কোনো পদের সংজ্ঞা দেয়ার পর যদি দেখা যায় যে সংজ্ঞায় প্রকাশিত ব্যক্তর্থ পদটি দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তর্থের চেয়ে কম তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাই অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of too Narrow Definition)। যেমন- 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত প্রাণী'। মানুষের এ সংজ্ঞাটি অব্যাপক সংজ্ঞা দোষে দুষ্ট। কারণ এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় 'শিক্ষিত' গুণটি উল্লেখ করায় সকল অশিক্ষিত মানুষ বাদ পড়ে 'মানুষ' পদটির ব্যক্তর্থ কমে গেছে।

(খ) অতি ব্যাপক বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of too Wide or Incomplete Definition) : কোনো পদের সংজ্ঞা দেয়ার পর যদি দেখা যায় যে সংজ্ঞায় প্রকাশিত ব্যক্তর্থ পদটি দ্বারা নির্দেশিত ব্যক্তর্থের চেয়ে বেশি তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাই অতি ব্যাপক বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of too Wide or Incomplete Definition)। যেমন- 'সকল মানুষ হয় প্রাণী'। আমরা জানি, 'মানুষ' পদের ব্যক্তর্থ হলো সকল মানুষ আর প্রাণী পদের ব্যক্তর্থ হলো সকল মানুষ এবং অন্যান্য সকল প্রাণী। তাই 'মানুষ' পদকে শুধু প্রাণী বলে সংজ্ঞায়িত করায় এর ব্যক্তর্থ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এতে অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

তৃতীয় নিয়ম ঃ যে পদের সংজ্ঞা দেয়া হবে সংজ্ঞায় সে পদের সমার্থক পদ বা সংজ্ঞেয় পদ ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ একই পদের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কোনো পদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যাবে না। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Circular or Tautologous Definition) ঘটে।

চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Circular or Tautologous Definition) : কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি সে পদের সমার্থক পদ বা সংজ্ঞেয় পদ ব্যবহার করা হয় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Circular or Tautologous Definition) বলে। যেমন, 'মানুষ হয় মানব সন্তান'-মানুষের এ সংজ্ঞাটি চক্রক সংজ্ঞা দোষে দুষ্ট। কারণ এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় 'মানব সন্তান'-এ সমার্থক পদ উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থ নিয়ম : যে পদের সংজ্ঞা দেয়া হবে সংজ্ঞাটিকে সেই পদ অপেক্ষা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হতে হবে এবং সংজ্ঞাটিকে কিছুতেই কোনো রূপকের মাধ্যমে বা দুর্বোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ সংজ্ঞায় সর্বদা সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করতে হয় এবং রূপক বা আলঙ্কারিক শব্দ কিংবা জটিল ভাষা পরিহার করতে হয়। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে যে সকল যৌক্তিক ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটে সেগুলো নিম্নরূপ:-

(ক) রূপক বা আলঙ্কারিক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Figurative Definition) : কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি রূপক বা আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে রূপক বা আলঙ্কারিক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Figurative Definition) বলে। যেমন, 'উট হলো মরুভূমির জাহাজ' অথবা, 'সিংহ হয় পশুর

'রাজা' উল্লিখিত বাক্য দু'টিতে 'মরুভূমির জাহাজ' এবং 'পশুর রাজা' শব্দগুলি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে রূপক বা আলঙ্কারিক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

(খ) দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Obscure Definition) : কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি কঠিন বা দুর্বোধ্য শব্দ এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে তা বুঝতে পারা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Obscure Definition) বলে। যেমন, 'শিক্ষা হচ্ছে শারীরবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের একমাত্র মাধ্যম' এ সংজ্ঞায় কঠিন বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

পঞ্চম নিয়ম : যেক্ষেত্রে সদর্থক সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব, সেক্ষেত্রে নঞর্থক সংজ্ঞা দেয়া যাবে না। অর্থাৎ সংজ্ঞেয় পদ নঞর্থক না হলে সংজ্ঞা কখনও নঞর্থক হবে না। কারণ সংজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো পদের অর্থ স্পষ্ট করা বা একটি পদ আসলে কী তা নির্দেশ করা। অর্থাৎ পদটি কী নয় তা নির্দেশ করা সংজ্ঞার কাজ নয়। এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে যে যৌক্তিক ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটে তা নিম্নরূপ ঃ

নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Negative Definition)

কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Negative Definition) বলে। যেমন, 'পাপ নয় পূণ্য' এ সংজ্ঞায় নেতিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এতে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

সারসংক্ষেপ

কোনো পদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে যাতে এর জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে ও শুদ্ধরূপে উল্লেখ করা যায় সে উদ্দেশ্যে যুক্তিবিদগণ কতগুলো নিয়ম বা বিধি প্রণয়ন করেছেন। এ নিয়ম বা বিধিসমূহ অনুসরণ করলে যৌক্তিক সংজ্ঞায়নে কোনো প্রকার ভ্রান্তি বা অনুপপত্তি ঘটে না। যৌক্তিক সংজ্ঞায়নের মোট পাঁচটি নিয়ম রয়েছে। নিয়মগুলো যথাক্রমে- ১. কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে সেই পদটির সম্পূর্ণ জাত্যর্থ উল্লেখ করতে হবে, ২. সংজ্ঞেয় পদের ব্যক্ত্যর্থ সংজ্ঞায় বর্ণিত পদের ব্যক্ত্যর্থের সমান হতে হবে, ৩. যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সংজ্ঞায় সে পদের সমার্থক পদ ব্যবহার করা যাবে না, ৪. যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সংজ্ঞাটিকে সেই পদ অপেক্ষা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হতে হবে এবং ৫. যেক্ষেত্রে সদর্থক সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব সেক্ষেত্রে নঞর্থক সংজ্ঞা দেয়া যাবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি জাত্যর্থের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয় তাহলে সংজ্ঞায়নে কোন্ ত্রুটি দেখা দেয়?
(ক) অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (খ) অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি
(গ) বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (ঘ) দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি

২। 'কোনো মানুষ নয় অমর' এ সংজ্ঞায় কোন্ ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে?
(ক) দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি (খ) অতিব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি
(গ) নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (ঘ) বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি

৩। নিচের কোন্টিতে রূপক বা আলঙ্কারিক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে?
(ক) পাপ নয় পূণ্য (খ) সিংহ হয় পশুর রাজা
(গ) মানুষ হয় মানব সন্তান (ঘ) মানুষ হয় এক শ্রেণীর প্রাণী

পাঠ-১.৫ সংজ্ঞার নিয়মাবলি লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of the Violations of Rules of Definition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- কোনো বিষয়ের সংজ্ঞা যথার্থ কি-না তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Redundant Definition)

মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারক্ষমতাসম্পন্ন জীব।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে সেই পদটির সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, কোনোক্রমেই জাত্যর্থের অতিরিক্ত কিছু বা জাত্যর্থের অংশবিশেষ উল্লেখ করা যাবে না। অর্থাৎ এ নিয়ম অনুসারে, কোনো পদের সংজ্ঞায়নের সময় শুধুমাত্র এর আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হবে, এর বেশিও নয় কমও নয়। কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করে সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি যদি 'উপলক্ষণ' হয়, তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Redundant Definition) বলে। এক্ষেত্রে মানুষ পদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারক্ষমতাসম্পন্ন জীব'। এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় এর জাত্যর্থের অতিরিক্ত একটি গুণ 'বিচারক্ষমতা' উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি হলো এর 'উপলক্ষণ'। কারণ 'বিচারক্ষমতা' গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থ 'বুদ্ধিবৃত্তি' থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়েছে। তাই মানুষের এ সংজ্ঞাটিতে বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির আরও দৃষ্টান্ত :

১। মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন ও চিন্তাশীল প্রাণী।

২। হাতি হয় ক্ষুধার্ত প্রাণী।

অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Accidental Definition)

মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হাস্যপ্রিয় জীব।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে সেই পদটির সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, কোনোক্রমেই জাত্যর্থের অতিরিক্ত কিছু বা জাত্যর্থের অংশবিশেষ উল্লেখ করা যাবে না। কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করে সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি যদি 'অবিচ্ছেদ্য অবান্তরলক্ষণ' হয়, তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Accidental Definition) বলে। এক্ষেত্রে মানুষ পদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হাস্যপ্রিয় জীব'। এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় এর জাত্যর্থের অতিরিক্ত একটি গুণ 'হাপস্যপ্রিয়তা' উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি হলো এর 'অবিচ্ছেদ্য অবান্তরলক্ষণ'। কারণ 'হাস্যপ্রিয়' গুণটি মানুষ পদের জাত্যর্থও নয়, আবার জাত্যর্থ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃতও নয়। তাই মানুষের এ সংজ্ঞাটিতে অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

অবান্তর লক্ষণজনিত অনুপপত্তির আরও দৃষ্টান্ত :

১। ঘোড়া হলো চার পা বিশিষ্ট প্রাণী।
২। কবি নজরুল হন এমন ব্যক্তি যিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহন করেন।
৩। পাখি হয় ডানাওয়ালা প্রাণী।

অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি
(Fallacy of Too Narrow Definition)

মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষত জীব

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে সেই পদটির সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ এ নিয়ম অনুসারে, কোনো পদের সংজ্ঞায়নের সময় শুধুমাত্র এর আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হবে, এর বেশিও নয় কমও নয়। কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করে সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো গুণের উল্লেখ করা হয় এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি যদি 'বিচ্ছেদ্য অবান্তরলক্ষণ' হয়, তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Too Narrow Definition) বলে। এক্ষেত্রে মানুষ পদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত জীব'। এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় এর জাত্যর্থের অতিরিক্ত একটি গুণ 'শিক্ষা' উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই অতিরিক্ত গুণটি হলো এর 'বিচ্ছেদ্য অবান্তরলক্ষণ'। ফলে এ সংজ্ঞাটি সকল মানষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই মানুষের এ সংজ্ঞাটিতে অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তির আরও দৃষ্টান্ত :

১। ছাগল হলো কালো রং বিশিষ্ট প্রাণী।
২। যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে একটি মানসিক বিজ্ঞান।
৩। বক হয় সাদা প্রাণী।

অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি
(Fallacy of Too Wide Definition)

মানুষ হয় জীব

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে হলে সেই পদটির সম্পূর্ণ জাত্যর্থ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়, এর বেশিও নয় কমও নয়। কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করে সংজ্ঞায় যদি জাত্যর্থের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়, তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Too Wide Definition) বলে। এক্ষেত্রে মানুষ পদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'মানুষ হয় জীব'। অর্থাৎ এখানে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় এর জাত্যর্থের অংশবিশেষ উল্লেখ করায় এ পদটি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, বরং অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য। কারণ মানুষ পদের এ সংজ্ঞাটিতে এর জাত্যর্থের একটি অংশ 'বুদ্ধিবৃত্তি' উল্লেখ করা হয়নি। ফলে এ সংজ্ঞাটিতে অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তির আরও দৃষ্টান্ত :

১। দোয়েল হয় পাখি।
২। হাইড্রোজেন হয় গ্যাস।
৩। বিশ্ববিদ্যালয় হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।

রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি
(Fallacy of Figurative Definition)

দেহ হচ্ছে আত্মার বন্দিশালা।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সংজ্ঞাটিকে সেই পদ অপেক্ষা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হতে হবে এবং সংজ্ঞাটিকে কিছুতেই কোনো রূপকের মাধ্যমে বা দুর্বোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। কিন্তু এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি রূপক বা আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয়

তাকে রূপক বা আলঙ্কারিক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Figurative Definition) বলে। এক্ষেত্রে দেহ পদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'দেহ হচ্ছে আত্মার বন্দিশালা'। এখানে 'দেহ' পদটির সংজ্ঞায় এর কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ না করে 'আত্মার বন্দিশালা' রূপক শব্দগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে রূপক বা আলঙ্কারিক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

রূপক বা আলঙ্কারিক সংজ্ঞা অনুপপত্তির আরও দৃষ্টান্ত :

১। চরিত্র মানব জীবনের মুকুটস্বরূপ।
২। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলো বিদ্যামন্দির।
৩। মিশর হচ্ছে নীল দরিয়ার দান।

দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি
(Fallacy of Obscure Definition)

শিক্ষা হচ্ছে শারীরবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধক একমাত্র মাধ্যম।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সংজ্ঞাটিকে সেই পদ অপেক্ষা স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হতে হবে এবং সংজ্ঞাটিকে কিছুতেই কোনো রূপকের মাধ্যমে বা দুর্বোধ্য ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। কিন্তু এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি কঠিন বা দুর্বোধ্য শব্দ এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে তা বুঝতে পারা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Obscure Definition) বলে। এক্ষেত্রে 'শিক্ষা' শব্দটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'শিক্ষা হচ্ছে শারীরবৃত্তিক ও মনোবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধক একমাত্র মাধ্যম'। শিক্ষার এ সংজ্ঞায় কঠিন বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে 'শিক্ষা' শব্দটির অর্থ স্পষ্ট না হয়ে আরো জটিল রূপ ধারণ করেছে। তাই এ সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

দুর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তির আরও দৃষ্টান্ত :

১। বটবৃক্ষ হচ্ছে জটাজুট লাঞ্ছিত সবিতাতপ নিরোধক মহাস্থবির পাদপ।
২। সংগীত হলো দুর্মূল্য কোলাহল।
৩। হাতী হচ্ছে প্রচন্ড মত্ত চৌপায়ী দেহধারী আত্মা।
৪। ভাস্কর্য হচ্ছে প্রস্তরীভূত সঙ্গীত।

চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি
(Fallacy of Circular or Tautologous Definition)

মানুষ হয় মানব সন্তান।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সংজ্ঞায় সে পদের সমার্থক পদ বা সংজ্ঞেয় পদ ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ একই পদের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কোনো পদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যাবে না। কিন্তু এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি সে পদের সমার্থক পদ বা সংজ্ঞেয় পদ ব্যবহার করা হয় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (Fallacy of Circular or Tautologous Definition) বলে। এক্ষেত্রে 'মানুষ' পদটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'মানুষ হয় মানব সন্তান' । এ সংজ্ঞায় 'মানুষ' পদটির সমার্থক পদ হচ্ছে 'মানব সন্তান'। অর্থাৎ এ সংজ্ঞাটিতে সমার্থক পদ বা সংজ্ঞেয় পদ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে।

চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তির আরও দৃষ্টান্ত :

১। যে সর্বস্ব হারিয়েছে সে সর্বহারা।
২। যার বিশেষ খ্যাতি আছে সে বিখ্যাত।
৩। আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে যার বিশ্বাস আছে সে আস্তিক।
৪। যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে তা পরগাছা।

নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি
(Fallacy of Negative Definition)
পাপ নয় পূণ্য ।

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম অনুসারে যেক্ষেত্রে সদর্থক সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব, সেক্ষেত্রে নঞর্থক সংজ্ঞা দেয়া যাবে না । অর্থাৎ সংজ্ঞেয় পদ নঞর্থক না হলে সংজ্ঞা কখনও নঞর্থক হবে না । কারণ সংজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো পদের অর্থ স্পষ্ট করা বা একটি পদ আসলে কী তা নির্দেশ করা । অর্থাৎ পদটি কী নয় তা নির্দেশ করা সংজ্ঞার কাজ নয় । কিন্তু এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যদি নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে সংজ্ঞায়নে যে ত্রুটি দেখা দেয় তাকে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি (Fallacy of Negative Definition) বলে । এক্ষেত্রে 'পাপ নয় পূণ্য' এ সংজ্ঞায় নেতিবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ এ সংজ্ঞায় পাপ কী তা ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে পাপ কী নয় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে । তাই এ সংজ্ঞাটি ত্রুটিপূর্ণ এবং এতে নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে । ।

নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির আরও দৃষ্টান্ত :
১ । অন্ধকার নয় আলো ।
২ । বেদনা নয় আনন্দ ।
৩ । জীব নয় জড় ।
৪ । নিদ্রা নয় জাগরণ ।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মলঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করুন ।

সারসংক্ষেপ

যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মসমূহ অনুসরণ না করলে সাধারণত বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি, অতি ব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি, অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা অনুপপত্তি, অব্যাপক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি, চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি, রূপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি, দূর্বোধ্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি ও নঞর্থক সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটে থাকে । তবে যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়মসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করলে উল্লেখিত অনুপপত্তিসমূহ এড়ানো যায় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন ।

১ । নিচের কোন্‌টি চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তির দৃষ্টান্ত?
(ক) নিদ্রা নয় জাগরণ (খ) যার বিশেষ খ্যাতি আছে সে বিখ্যাত
(গ) সংগীত হলো দুর্মূল্য কোলাহল (ঘ) মিশর হচ্ছে নীল দরিয়ার দান

২ । 'হাতী হয় ক্ষুধার্ত প্রাণী'- এটি কোন্ ধরনের অনুপপত্তির দৃষ্টান্ত?
(ক) অবান্তর লক্ষণজনিত অনুপপত্তির (খ) অব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তির
(গ) বাহুল্য সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তির (ঘ) অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তির

৩ । 'অবান্তর লক্ষণজনিত সংজ্ঞা অনুপপত্তি'- এর সঠিক ইংরেজি পরিভাষা কোন্‌টি?
(ক) Fallacy of Figurative Definition (খ) Fallacy of Too Wide Definition
(গ) Fallacy of Too Narrow Definition (ঘ) Fallacy of Accidental Definition

পাঠ-১.৬ যৌক্তিক সংজ্ঞার গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা (Importance and Limitations of Logical Definition)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- যৌক্তিক সংজ্ঞার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।
- যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- যৌক্তি সংজ্ঞার সাহায্যে চিন্তাধারাকে স্পষ্ট ও নির্ভুল করতে পারবেন।

যৌক্তিক সংজ্ঞার গুরুত্ব (Importance of Logical Definition)

যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সংজ্ঞা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা সংজ্ঞা পদের অর্থ সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও প্রাঞ্জল করে তোলে এবং আমাদের চিন্তাধারা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। তাই যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ:

১। **চিন্তাধারাকে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল করে :** সংজ্ঞার সাহায্যে আমরা আমাদের চিন্তাধারাকে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল করে তুলতে পারি। সুতরাং যে কোনো চিন্তার শুরুতেই যৌক্তিক সংজ্ঞার প্রয়োজন।

২। **বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ জানতে সহায়তা করে :** সংজ্ঞা কোনো বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ জানতে সহায়তা করে। অনেক সময় সঠিক জ্ঞানের অভাবে আমরা একটি বস্তুকে অন্য বস্তু বলে ভুল করি; যেমন- বাদুড়কে ভুল করে বলি পাখি, আর তিমিকে ভুল করে বলি মাছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাদুড় পাখি নয় এবং তিমি মাছ নয়। পাখি এবং মাছ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকার জন্যই এমনটি ঘটে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কোন্ জিনিসটি আসলে কী তা সঠিকভাবে জানার জন্য যৌক্তিক সংজ্ঞার জ্ঞান অপরিহার্য।

৩। **পদের দ্ব্যর্থকতা রোধ করে :** দু'টি যুক্তিবাক্যে যাতে একই পদ একাধিক অর্থে ব্যবহার করা না হয় কিংবা ব্যবহৃত পদের অর্থ নিয়ে যাতে কোনো প্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেজন্য আগেই সংজ্ঞার সাহায্যে পদের অর্থ সুনির্দিষ্ট করে নিতে হয়। অর্থাৎ পদের অর্থ সুনির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে এর দ্ব্যর্থকতা রোধ করার ক্ষেত্রেও যৌক্তিক সংজ্ঞার জ্ঞান অপরিহার্য।

৪। **সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক :** সঠিক অনুমানের সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। আর অনুমানের যথার্থতা নির্ভর করে পদের সঠিক জ্ঞানের উপর, যে জ্ঞান আমরা পাই সংজ্ঞার সাহায্যে। সুতরাং সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সংজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫। **বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সহায়ক :** যেকোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শুরুতেই তার সঠিক সংজ্ঞার প্রয়োজন হয়। কারণ কার্যকরী সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে যেকোনো বিজ্ঞান এর বিষয়বস্তুর প্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে।

৬। **বৈধ অনুমান গঠনে সহায়ক :** সংজ্ঞার মাধ্যমে পদের দুর্বোধ্যতা দূর হয় এবং এর অর্থ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হয়। ফলে অনুমান গঠনের ক্ষেত্রে পদের যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব হয়। তাই বৈধ অনুমান গঠন করতে হলে সংজ্ঞার জ্ঞান থাকা দরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যুক্তিবিদ আই. এম. কপি (I. M. Copi) যৌক্তিক সংজ্ঞার মাত্র পাঁচটি প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। যথা:

১. যৌক্তিক সংজ্ঞার মাধ্যমে শব্দের ভান্ডার বৃদ্ধি করা যায়।

২. যৌক্তিক সংজ্ঞার মাধ্যমে পদের দ্ব্যর্থকতা দূর করা যায়।

৩. যৌক্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে পদের অর্থ সুস্পষ্ট করা যায়।

৪. যৌক্তিক সংজ্ঞা দ্বারা পদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়।

৫. যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদানের মাধ্যমে নিজের মত দ্বারা অন্যের মতকে প্রভাবিত করা যায়।

যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা
(Limitations of Logical Definition)

সাধারণত কোনো পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখপূর্বক এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। তাই যে সকল পদের আসন্নতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না সে সকল পদের সংজ্ঞা প্রদানও সম্ভব হয় না। আর এটিই হলো যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা। যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নরূপ:

১। **পরমতম জাতি :** পরমতম জাতির ব্যক্ত্যর্থ এত বেশি যে এর চেয়ে অধিক ব্যক্ত্যর্থসম্পন্ন আর কোনো জাতি নেই। অর্থাৎ পরমতম জাতির কোনো আসন্নতম জাতি নেই। আর তাই এর যৌক্তিক সংজ্ঞা দেয়া যায় না। যেমন- 'দ্রব্য' একটি পরমতম জাতি বলে এর যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়।

২। **বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা স্বকীয় নামবাচক পদ:** বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু বা স্বকীয় নামবাচক পদের অসংখ্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকে বলে এদের বিভেদক লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না। এজন্য প্রশান্ত মহাসাগর, চীনের মহাপ্রাচীর, সক্রেটিস ইত্যাদি জাতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর সংজ্ঞা দেয়া যায় না।

৩। **বিশিষ্ট গুণবাচক পদ :** সততা, সত্যবাদিতা, শুভ্রতা, চতুষ্কোণতা ইত্যাদি বিশিষ্ট গুণবাচক পদগুলোকে আর কোনো সরলতম উপাদানে বিশ্লেষণ করা যায় না বলে এগুলোর সংজ্ঞা দেয়া যায় না।

৪। **অনন্য বা মৌলিক বিষয় :** ঈশ্বর, আত্মা, দেশ, কাল ইত্যাদি অনন্য বা মৌলিক বিষয় বলে এগুলোকে অন্য কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাই এসব অনন্য বা মৌলিক বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদানও সম্ভব নয়।

৫। **সরল ও মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়া :** সুখ-দঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি সরল ও মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়াগুলো অতুলনীয় বলে এগুলোর সংজ্ঞা দেয়া যায় না।

৬। **পরম নিয়ম :** প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি, কার্যকারণ নিয়ম ইত্যাদি পরম নিয়মসমূহকে অন্য কোনো উচ্চতর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বলে এগুলোর সংজ্ঞা দেয়া যায় না।

যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, এটি একটি সীমিত প্রক্রিয়া। তবে যে সব পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয় বর্ণনার সাহায্যে সে সব পদের অর্থ স্পষ্ট করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ্যায় সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ এটি মানুষের চিন্তাধারাকে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল করে, বস্তু বা বিষয়ের স্বরূপ জানতে সহায়তা করে, পদের দ্ব্যর্থকতা রোধ করে, সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনে সহায়ক ও বৈধ অনুমান গঠনে সহায়ক। তাই যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সংজ্ঞা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় যৌক্তিক সংজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এটি একটি সীমিত প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যৌক্তিক সংজ্ঞার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এটি মানুষের চিন্তাধারাকে -
(i) সুস্পষ্ট করে (ii) অনির্দিষ্ট করে (iii) নির্ভুল করে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ii ও iii (খ) i, ii, ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

২। যুক্তিবিদ আই. এম. কপি যৌক্তিক সংজ্ঞার কয়টি প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন?
(ক) চারটি (খ) পাঁচটি
(গ) ছয়টি (ঘ) সাতটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট- ১

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। যুক্তিবিদ কপি শব্দ বা পদের সংজ্ঞা প্রদানের জন্য কয়টি পদ্ধতির কথা বলেছেন ?
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। নিচের কোন্‌টিতে চক্রক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে?
(ক) পাপ নয় পূণ্য (খ) সিংহ হয় পশুর রাজা
(গ) মানুষ হয় মানব সন্তান (ঘ) মানুষ হয় এক শ্রেণীর প্রাণী

৩। যৌক্তিক সংজ্ঞা-

(i) দুর্বোধ্য বিষয়কে সুবোধ্য করে (ii) ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করে

(iii) পদ ও শব্দের দ্ব্যর্থকতা দূর করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রহমান সাহেব তার বড় ভাই ইয়াছিন সাহেবকে মানুষের সংজ্ঞা দিতে বলায় তিনি বললেন, "মানুষ হয় এক শ্রেণীর প্রাণী"। কিন্তু রহমান সাহেব তাঁর সংজ্ঞায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে তিনি তাঁকে জানালেন যে, " মানুষ হয় এমন প্রাণী যার বিচার ক্ষমতা আছে"।

৪। উদ্দীপকটির ইয়াছিন সাহেবের উক্তিতে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে?

(ক) সমষ্টি সংজ্ঞা অনুপপত্তি (খ) বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি

(গ) অতি ব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (ঘ) সমগ্র সংজ্ঞা অনুপপত্তি

৫। উদ্দীপকে রহমান সাহেবের উক্তিতে-

(i) যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে

(ii) যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয়েনি

(iii) অতি ব্যাপক বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। যুক্তিবিদ্যার শিক্ষক জনাব অঙ্গনা রহমান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে এমন একটি বিষয় আছে যা পদের সম্পূর্ণ জাত্যর্থ স্পষ্ট করে প্রকাশ করে। এটি আমাদেরকে একটি জিনিস আসলে কী এবং কী নয় তা বুঝতে সহায়তা করে এবং এটি কেবলমাত্র শ্রেণিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। এটি সব সময় একটি সমীকরণ নির্দেশ করে। এর সাহায্যে শব্দ বা পদের অর্থ ও তাৎপর্য সঠিকরূপে উপলব্ধি করা যায়। যুক্তিবিদ্যার ন্যায় বৈজ্ঞানিক আলোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

(ক) বর্ণনা কাকে বলে?

(খ) সকল পদের যৌক্তিক সংজ্ঞা দেয়া যায় না কেন? বুঝিয়ে লিখুন।

(গ) উদ্দীপকে যুক্তবিদ্যার আলোচ্য বিষয়সমূহ থেকে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি কী বর্ণনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? না হলে তা কীভাবে পৃথক? ব্যাখ্যা করুন।

২। দৃশ্যকল্প-১ : মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন শিক্ষিত জীব।

দৃশ্যকল্প-২ : মানুষ হয় জীব।

দৃশ্যকল্প-৩ : দেহ হচ্ছে আত্মার বন্দিশালা।

(ক) যৌক্তিক সংজ্ঞা কাকে বলে?

(খ) যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় যৌক্তিক সংজ্ঞা কেন অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ বিষয়? বুঝিয়ে লিখুন।

(গ) দৃশ্যকল্প-৩ এ যৌক্তিক সংজ্ঞার কোন্ নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ এ কী একই প্রকৃতির অনুপপত্তি ঘটেছে? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২ ঃ ১-ঘ, ২-ক, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩ ঃ ১-ক, ২-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬ ঃ ১-গ, ২-খ

ইউনিট
২

যৌক্তিক বিভাগ
(Logical Division)

ভূমিকা

যৌক্তিক বিভাগ যুক্তিবিদ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয় । একটি গ্রহণযোগ্য নীতির ভিত্তিতে একটি জাতিকে এর অন্তর্গত উপজাতির মধ্যে বিভক্ত করাকেই বলা হয় যৌক্তিক বিভাগ । অর্থাৎ বিভাজন প্রক্রিয়া যখন বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিগত হয় তখন তাকে বলা হয় যৌক্তিক বিভাগ । যৌক্তিক বিভাগের যথাযথ আলোচনা এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা প্রকৃতিতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণি ও এদের অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতি বা উপশ্রেণি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান বা সঠিক ধারণা লাভ করতে পারি । যৌক্তিক বিভাগ একদিকে যেমন পদের অর্থগত, পরিমাণগত ও বৈশিষ্ট্যগত দিকটি প্রকাশ করে, অন্যদিকে তেমনি অনুমান, যুক্তি গঠন, যুক্তি প্রণয়ন, জাতি-উপজাতির বিভাজন, শ্রেণিকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখে । তাই যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় যৌক্তিক বিভাগ একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।

ইউনিট সমাপ্তির সময় : সর্বোচ্চ ০৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১: যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা

পাঠ-২.২: যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলি

পাঠ-২.৩ : যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি

পাঠ-২.৪: দ্বিকোটিক বিভাগ এবং এর সুবিধা-অসুবিধা

পাঠ-২.৫: যৌক্তিক বিভাগের গুরুত্ব

পাঠ-২.৬: যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা

পাঠ-২.১ যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা (Definition, Nature and Relevance of Logical Division)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা (Definition of Logical Division)

কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থের বিশ্লেষণই হচ্ছে যৌক্তিক বিভাগের মূল বিষয়। এ কারণেই বিভাগ প্রক্রিয়ায় সকল ক্ষেত্রেই কোনো শ্রেণিকে তার অন্তর্ভুক্ত উপশ্রেণিসমূহে ভাগ করা হয়। যৌক্তিক বিভাগের এ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন যুক্তিবিদ যৌক্তিক বিভাগের নানাবিধ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন-

যুক্তিবিদ জে. এন. কীনস (J. N. Keynes) তাঁর *Formal Logic* গ্রন্থে বলেন, "যখন একটি জাতিকে এর অন্তর্ভুক্ত উপজাতিসমূহে পৃথকীকরণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় যৌক্তিক বিভাগ।" (1900, p.441)

যুক্তিবিদ এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (H.W.B. Joseph) তাঁর *An Introduction to Logic* গ্রন্থে বলেন, "একটি জাতিকে বিভিন্ন উপজাতিতে, যে উপজাতিগুলো ঐ জাতির মধ্যে অবস্থান করে, আলাদা করা বা পৃথক করার প্রক্রিয়াকে যৌক্তিক বিভাগ বলে।"("The process of distinguishing or breaking up a genus into the species that belong to it is called logical division." (1916, P.115)

যুক্তিবিদ এল. এস. স্টেবিং (L.S. Stebbing) তাঁর *A Modern Introduction to Logic* বইয়ে বলেন, "একটি শ্রেণিকে এর গঠনকারী উপাদান অংশ হিসেবে উপশ্রেণীতে ভাগ করার প্রক্রিয়াই হলো যৌক্তিক বিভাগ" ("The process of splitting a class into its constituent sub-classes is known as logical division." (1942, P. 434)

পরিশেষে যুক্তিবিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাসমূহের ভিত্তিতে যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞায় বলা যায় যে, কোনো একটি মূলসূত্রের উপর ভিত্তি করে একটি জাতি বা উচ্চতর শ্রেণিকে এর অন্তর্গত উপজাতি বা নিম্নতর উপশ্রেণীসমূহে মানসিকভাবে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় যৌক্তিক বিভাগ।

নিম্নোক্ত উদাহরণের সাহায্যে যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞাটি আরও স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন, 'সততা' নীতির ভিত্তিতে 'মানুষ' শ্রেণিকে 'সৎ মানুষ' ও 'অসৎ মানুষ'- এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। আবার 'শিক্ষা' গুণটির ভিত্তিতে 'মানুষ' শ্রেণিকে 'শিক্ষিত মানুষ' ও 'অশিক্ষিত মানুষ'- এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র নিয়ম বা গুণ অনুসারে যৌক্তিক বিভাগ করা যেতে পারে।

যৌক্তিক বিভাগের প্রকৃতি (Nature of Logical Division)

যুক্তিবিদগণ কর্তৃক প্রদত্ত উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহের ভিত্তিতে যৌক্তিক বিভাগের প্রকৃতিকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যায়-

১। যৌক্তিক বিভাগ কেবলমাত্র শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্ভব, কোনো একক ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যেমন, বর্ণ অনুসারে 'মানুষ' শ্রেণিবাচক পদটিকে 'শ্বেতকায়' ও 'অশ্বেতকায়' এ দু'ভাগে বিভক্ত করা হলে তা হবে যৌক্তিক বিভাগ।

২। যৌক্তিক বিভাগ হলো একটি মানসিক প্রক্রিয়া। বৈচিত্র্যময় এ বিশ্বের যাবতীয় বিষয় একই সাথে জানা বা মনে রাখা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ একটি অপরিহার্য সহায়ক বিষয়। কিন্তু কোনো শ্রেণি বা জাতিকে ভাগ করতে হলে আমাদেরকে প্রথমে কোন্ গুণ বা সূত্রের ভিত্তিতে ভাগ করবো, তা মানসিকভাবে ঠিক করে নিতে হয়। সুতরাং যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়াটি হলো একটি মানসিক প্রক্রিয়া।

৩। যৌক্তিক বিভাগ অঙ্গগত বিভাগ ও গুণগত বিভাগ থেকে সম্পূর্ণরূপে একটি পৃথক প্রক্রিয়া। কেননা যৌক্তিক বিভাগে বিভাজ্য শ্রেণিটি উপশ্রেণিগুলোর প্রতিটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হলেও অঙ্গগত বিভাগ ও গুণগত বিভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৪। যৌক্তিক বিভাজনের ক্ষেত্রে সব সময় একটি মাত্র নীতি বা সূত্র অনুসরণ করতে হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, কোনো একটি শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদকে সব সময় একই নীতি বা সূত্রের ভিত্তিতে বিভাজন করতে হবে। বরং এর অর্থ হলো, একই সাথে একটির অধিক নীতি অনুসরণ করা না গেলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অনুসরণ করা যাবে। যেমন, 'সভ্যতা' নীতির ভিত্তিতে 'মানুষ' শ্রেণিকে 'সভ্য মানুষ' ও 'অসভ্য মানুষ'- এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। আবার 'নৈতিকতা' গুণটির ভিত্তিতে 'মানুষ' শ্রেণিকে 'নৈতিক মানুষ' ও 'অনৈতিক মানুষ'- এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট জাতি বা শ্রেণিকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র নিয়ম বা গুণ অনুসারে যৌক্তিক বিভাগ করা যেতে পারে।

৫। যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে সব সময় একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় বলে এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

৬। যৌক্তিক বিভাগ করার সময় এমন একটি গুণ অনুসরণ করতে হয় যা একটি জাতি বা শ্রেণির কিছু অংশে বিদ্যমান এবং কিছু অংশে বিদ্যমান নয়, অথবা এমন একটি নীতি বা সূত্র অনুসরণ করতে হয় যা একটি জাতি বা শ্রেণির কিছু অংশে প্রযোজ্য এবং কিছু অংশে প্রযোজ্য নয়।

৭। যৌক্তিক বিভাগে বিভক্তমূল, বিভাজক উপশ্রেণি ও সহ-বিভাগ এ তিনটি বিষয় বিদ্যমান। যৌক্তিক বিভাগে যে শ্রেণিবাচক পদটিকে ভাগ করা হয় তাকে বলা হয় 'বিভক্তমূল' (totum division)। আবার বিভক্তমূলকে যে বিভিন্ন উপশ্রেণি বা উপজাতিতে ভাগ করা হয় তাকে বলা হয় 'বিভাজক উপশ্রেণি' (dividing members)। আর যৌক্তিক বিভাগে যখন একই শ্রেণিকে বিভিন্ন মূলসূত্র অনুসারে বিভিন্ন উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয় তখন তাকে বলা হয় 'সহ-বিভাগ' (co-division)।

যৌক্তিক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা
(Relevance of Logical Division)

যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে যে সকল সহায়ক প্রক্রিয়া রয়েছে যৌক্তিক বিভাগ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে যৌক্তিক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ নিম্নে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

১। যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো যুক্তি। আর যুক্তি পদ্ধতি যথার্থ হওয়ার জন্য যৌক্তিক বিভাগ সম্পর্কিত জ্ঞান অপরিহার্য। কারণ বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্যময়তা ও বিশালতার জন্য এর সব কিছু সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় যৌক্তিক বিভাজনের সাহায্যে বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের আলোকে এগুলোকে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত করে খুব সহজেই এগুলো সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা লাভ করা যায় যা যথার্থ যুক্তি গঠনে সহায়তা করে। তাই যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় যৌক্তিক বিভাগ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

২। যৌক্তিক বিভাগ সব সময় বিভাজিত উপজাতিগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে একটি জাতির অধীনে কতগুলো উপজাতি রয়েছে তা নির্ধারণ করে এবং বিভিন্ন উপজাতির মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক ও পার্থক্য নির্দেশ করে।

৩। অনেক ক্ষেত্রেই একটি জাতির বা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সব কিছু মনে রাখা সম্ভব হয় না। কিন্তু যখন একটি জাতি বা শ্রেণিকে বিভিন্ন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এর অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতি বা উপশ্রেণিসমূহে বিভক্ত করা হয় তখন তা সহজেই মনে রাখা যায়। সুতরাং যৌক্তিক বিভাগ আমাদের স্মৃতিশক্তির সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

৪। যৌক্তিক বিভাগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বলে এটি আমাদের মননশীল শক্তি বৃদ্ধি করে। আবার এটি একটি বিশেষ নীতি বা সূত্রের সাহায্যে বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বলে তা যুক্তিবিদ্যার যেকোনো জটিল বিষয় সহজে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়।

৫। যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়াটি যে শুধুমাত্র যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক তা কিন্তু নয়, এটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়। কারণ প্রতিটি বিজ্ঞানই যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করে এর অনুসন্ধেয় বা গবেষণার বিষয়টি প্রকৃতির অন্যান্য বিষয় থেকে পৃথক করে। এর ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য অনেক সহজ হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট, যথার্থ ও সহজ-সরল ধারণা প্রদান করাই যৌক্তিক বিভাগের মূল কাজ। এছাড়াও এ প্রক্রিয়াটি আমাদের বাস্তবমুখী প্রাত্যহিক জীবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের অজান্তেই যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের কার্য সম্পাদন করে থাকি। তাই যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে যৌক্তিক বিভাগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক বিভাগের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিন।

সারসংক্ষেপ

একটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে একটি জাতিকে এর অন্তর্গত উপজাতিসমূহের মধ্যে বিভক্ত করাই হলো যৌক্তিক বিভাগ। এটি কেবলমাত্র শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্ভব, কোনো একক ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। যৌক্তিক বিভাজনের ক্ষেত্রে সব সময় একটি মাত্র নীতি বা সূত্র অনুসরণ করতে হয়। এ প্রক্রিয়াটি যুক্তিবিদ্যার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বা গবেষণার ক্ষেত্রেও একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "যখন একটি জাতিকে এর অন্তর্ভুক্ত উপজাতিসমূহে পৃথকীকরণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় যৌক্তিক বিভাগ।"- যৌক্তিক বিভাগের এ সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন?

(ক) জে. এন. কীনস (খ) এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ

(গ) এল. এস. স্টেবিং (ঘ) আই. এম. কপি

২। নিচের কোন্ ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব?

(ক) ব্যক্তিবাচক পদের ক্ষেত্রে (খ) জাতিবাচক পদের ক্ষেত্রে

(গ) একক পদের ক্ষেত্রে (ঘ) বিশিষ্ট পদের ক্ষেত্রে

৩। যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হিসেবে যৌক্তিক বিভাগের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে, কারণ এটি-

(i) বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজন (ii) আমাদের স্মৃতিশক্তির সহায়ক হিসেবে কাজ করে

(iii) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

পাঠ-২.২ যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলি (Rules of Logical Division)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলি লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের কোন নিয়ম লঙ্ঘনে কোন অনুপপত্তি ঘটে তা জানতে পারবেন।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলি (Rules of Logical Division)

সঠিকভাবে যৌক্তিক বিভাজনের জন্য যুক্তিবিদগণ যৌক্তিক বিভাগের মোট ছয়টি নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে যৌক্তিক বিভাগের নিয়মাবলি আলোচনা করা হলো :

প্রথম নিয়ম : যৌক্তিক বিভাগে বিভাজ্য পদটিকে সর্বদা শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদ হতে হবে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু হলে চলবে না।

এ নিয়মের মূল তাৎপর্য হলো যৌক্তিক বিভাগে সব সময় কোনো জাতি বা শ্রেণিকেই ভাগ করা হয়ে থাকে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে নয়। যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে নিম্নোক্ত অনুপপত্তি ঘটে :

(ক) অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Physical Division) : বিভাজন প্রক্রিয়ায় যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে এর বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয় তখন এক্ষেত্রে যে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয় তাকে অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of physical division) বলে। যেমন: একটি হাতীকে এর মাথা, শুর, লেজ, পা ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।

(খ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Metaphysical Division) : বিভাজন প্রক্রিয়ায় যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে এর বিভিন্ন গুণের ভিত্তিতে ভাগ করা হয় তখন এক্ষেত্রে যে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয় তাকে গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Metaphysical Division) বলে। যেমন, একটি কমলা লেবুকে এর বিভিন্ন রং, আকার, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি গুণে ভাগ করা।

দ্বিতীয় নিয়ম : যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় সব সময় একটি মাত্র নীতিকে মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

এ নিয়ম অনুসারে কোনো জাতিবাচক পদকে তার অন্তর্গত উপজাতিসমূহে বিভক্ত করতে হলে একবারে একটিমাত্র মূলসূত্র গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ একটি জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের অসংখ্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় ঐ জাতিবাচক বা শ্রেণিবাচক পদের অসংখ্য গুণ বা বৈশিষ্ট্য থেকে মূলসূত্র হিসেবে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নীতি বা বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা গেলেও একই সময়ে একটির বেশি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করা যাবে না। যেমন, প্রাণি জাতিকে মেরুদন্ড মূলনীতির ভিত্তিতে মেরুদন্ডী ও অমেরুদন্ডী এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে নিম্নোক্ত অনুপপত্তি ঘটে :

সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Cross Division or Fallacy of Overlapping Division)

যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় নিয়মটি লঙ্ঘন করে একটির পরিবর্তে যদি একই সময়ে একাধিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয় তাহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Cross Division or Fallacy of Overlapping Division) বলে। যেমন, যদি 'মানুষ' জাতিকে ভাগ করতে গিয়ে 'সভ্যতা', 'সততা', 'সত্যবাদীতা' এ তিনটি নীতিকে বিভাগের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ যে 'সভ্য' সে 'সৎ' এবং 'সত্যবাদী'-ও হতে পারে, যে 'সৎ' সে 'সভ্য' এবং 'সত্যবাদী'-ও হতে পারে এবং যে 'সত্যবাদী' সে 'সভ্য' এবং 'সৎ' -ও হতে পারে।

তৃতীয় নিয়ম : যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজ্য পদের ব্যক্ত্যর্থ বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থের যোগফলের সমান হতে হবে, কম বা বেশি হলে চলবে না।

যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মটির অর্থ হলো একটি জাতিকে বিভিন্ন উপজাতিতে বিভাজন করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন এ থেকে কোনো উপজাতি বাদ না পড়ে, আবার অতিরিক্ত কোনো উপজাতি এর অন্তর্ভুক্ত না হয়। যেমন, মানুষকে 'সৎ মানুষ' ও 'অসৎ মানুষ' এ দুইউপজাতিতে ভাগ করা হলে 'সৎ মানুষ' ও 'অসৎ মানুষ' উপজাতির যোগফলের ব্যক্ত্যর্থ বিভাজ্য 'মানুষ' জাতির ব্যক্ত্যর্থের সমান হবে। যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে দু'ধরনের অনুপপত্তি ঘটে :

অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি
(Fallacy of Too Narrow Division)

যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজ্য পদের কোনো উপজাতি যদি বাদ দেয়া হয় তাহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Too Narrow Division) বলে। যেমন, ত্রিভুজকে ভাগ করতে গিয়ে যদি একে 'সমবাহু' ও 'বিষমবাহু' এ দু'ভাগে ভাগ করা হয় তবে এক্ষেত্রে 'সমদ্বিবাহু' ত্রিভুজ বাদ পড়ে যায়। ফলে এতে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে।

অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি
(Fallacy of Too Wide Division)

যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় যদি বিভাজ্য পদের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো উপজাতি উল্লেখ করা হয় তাহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Too Wide Division) বলে। যেমন, ত্রিভুজকে ভাগ করতে গিয়ে যদি একে 'সমবাহু' ও 'বিষমবাহু' 'সমদ্বিবাহু' ও 'দ্বিবাহু' এ চারভাগে ভাগ করা হয় তবে এক্ষেত্রে 'দ্বিবাহু' ত্রিভুজ অতিরিক্ত হওয়ায় অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে। কারণ দ্বিবাহু ত্রিভুজ 'ত্রিভুজ' শ্রেণির কোনো উপশ্রেণি নয়।

চতুর্থ নিয়ম : যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে হবে, কিছুতেই একটি অন্যটির সাথে মিশে যেতে পারবে না।

এ নিয়মটি মূলত যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়মের অনুসারী। অর্থাৎ একই সময়ে একই বিভাগ প্রক্রিয়ায় একটি মাত্র মূলসূত্র গ্রহণ করলে উপশ্রেণিগুলোর একটি অন্যটির সাথে মিশে যাবে না। যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে নিম্নোক্ত অনুপপত্তি ঘটে :

সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি
(Fallacy of Cross Division or Fallacy of Overlapping Division)

যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ার চতুর্থ নিয়মটি হচ্ছে বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে হবে। কিন্তু এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি কোনো শ্রেণিবাচক পদকে এমন ভাবে ভাগ করা হয় যে একটি উপশ্রেণি অন্যটির সাথে মিশে যায়, তহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Cross Division or Fallacy of Overlapping Division) বলে। যেমন, যদি 'ত্রিভুজ' শ্রেণিকে ভাগ করতে গিয়ে 'বাহু', 'কোণ' এ দু'টি নীতিকে বিভাগের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ যে ত্রিভুজটি 'সমকোণী' তা 'বিষমবাহু' বা 'সমবাহু'-ও হতে পারে। অর্থাৎ একটি উপশ্রেণি অন্যটির সাথে মিশে যেতে পারে।

পঞ্চম নিয়ম : বিভাজ্য শ্রেণি বা জাতির নাম বিভক্ত উপশ্রেণি বা উপজাতিগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একই অর্থে প্রযোজ্য হতে হবে।

এ নিয়মানুসারে একটি শ্রেণি বা জাতিকে যৌক্তিক বিভাজনের পরও এর নামের কোনো পরিবর্তন হবে না। যেমন, ত্রিভুজকে যদি 'সমবাহু', 'বিষমবাহু' ও 'সমদ্বিবাহু'-এ তিন ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে এ তিনটির ওপরই বিভাজ্য পদ 'ত্রিভুজ' কথাটি প্রযোজ্য হয়। যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মটি মূলত তৃতীয় নিয়ম থেকে অনুসৃত হয়েছে। কারণ যৌক্তিক বিভাজনের পর যদি এমন কোনো উপশ্রেণি পাওয়া যায় যার ওপর বিভাজ্য শ্রেণির নাম প্রযোজ্য নয়, তাহলে

উপশ্রেণিসমূহের ব্যক্ত্যর্থের যোগফল বিভাজ্য শ্রেণির ব্যক্ত্যর্থের যোগফলের সমান হবে না। তাই কোনো ক্ষেত্রে একটি পদকে বিভক্ত করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, বিভাজ্য পদের নাম বিভক্ত পদসমূহের ওপর প্রযোজ্য হয় না, তাহলে সেক্ষেত্রে অনুপপত্তি ঘটবে। যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে নিম্নোক্ত অনুপপত্তি ঘটে :

(ক) অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Physical Division) : বিভাজন প্রক্রিয়ায় যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে এর বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয় তখন এক্ষেত্রে বিভাজ্য পদটির নাম বিভাজিত অংশসমূহের কোনোটির ওপর প্রযোজ্য হয় না। এমতাবস্থায় যে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয় তাকে অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of physical division) বলে। যেমন, একটি গাছকে এর মূল, কান্ড, শাখা ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।

(খ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Metaphysical Division) : বিভাজন প্রক্রিয়ায় যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে এর বিভিন্ন গুণের ভিত্তিতে ভাগ করা হয় তখন এক্ষেত্রে বিভাজ্য পদটির নাম বিভাজিত গুণসমূহের কোনোটির ওপর প্রযোজ্য হয় না। এমতাবস্থায় যে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয় তাকে গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Metaphysical Division) বলে। যেমন, একটি আপেলকে এর বিভিন্ন রং, আকার, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি গুণে ভাগ করা।

ষষ্ঠ নিয়ম : ক্রমিক বিভাগে বিভাজ্য শ্রেণি বা জাতিকে এর নিকটতম উপশ্রেণি বা উপজাতিতে ভাগ করতে হবে, মধ্যবর্তী কোনো স্তর বাদ দেয়া যাবে না।

বস্তুত ক্রমিক বিভাগে অনেকগুলো ধাপ বা স্তর থাকে এবং এ ধাপ বা স্তরগুলোর কোনো একটিকেও বাদ দেয়া যায় না। অর্থাৎ যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মানুসারে বিভাগ প্রক্রিয়াকে প্রতিটি স্তর অনুসরণ করেই অগ্রসর হতে হয়। যেমন, 'প্রাণি' পদটির ক্রমিক বিভাজন করতে গিয়ে যদি প্রথমে একে 'মানুষ' ও 'অন্যান্য প্রাণি' এরপর 'মানুষ' পদটিকে 'সভ্য মানুষ' ও 'অসভ্য মানুষ' পদে বিভাজন করা হয় তাহলে তা হবে ক্রমিক বিভাজন। যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মটি লঙ্ঘন করলে নিম্নোক্ত অনুপপত্তি ঘটে :

উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি
(Fallacy of Division by Leap)

ক্রমিক বিভাগে বিভাজ্য শ্রেণি বা জাতিকে এর নিকটতম উপশ্রেণি বা উপজাতিতে ভাগ না করে যদি মধ্যবর্তী কোনো স্তর বাদ দেয়া হয় তাহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Division by Leap) বলে। যেমন, 'প্রাণি' পদটির ক্রমিক বিভাজন করতে গিয়ে যদি প্রথমেই একে 'সভ্য মানুষ' ও 'অসভ্য মানুষ' পদে বিভাজন করা হয় তাহলে তা হবে উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি। কারণ এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্তর 'মানুষ' ও 'অন্যান্য প্রাণি' বাদ পড়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক বিভাগের ৬টি নিয়ম তালিকাবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রতিটি বিষয়ের মতোই যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়ার কিছু বিশেষ নিয়ম রয়েছে। যথাযথভাবে যৌক্তিক বিভাজনের জন্য যুক্তিবিদগণ যৌক্তিক বিভাগের মোট ছয়টি নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। বিভাজন প্রক্রিয়াটিকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু সুশৃংখল ও সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এ নিয়মসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যৌক্তিক বিভাগে মোট কয়টি নিয়ম রয়েছে?
(ক) ৪টি (খ) ৫টি (গ) ৬টি (ঘ) ৭টি

২। যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় যদি একই সময়ে একাধিক মূলনীতি গ্রহন করা হয় তহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে বলে—
(ক) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি (খ) উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি
(গ) সংকর বিভাগ অনুপপত্তি (ঘ) অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি

৩। যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজ্য পদের ব্যক্ত্যর্থ বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থের যোগফলের—
(ক) বেশি হবে (খ) কম হবে (গ) কম বা বেশি উভয়ই হবে (ঘ) সমান হবে

পাঠ-২.৩ যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of the Violations of Rules of Logical Division)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যথাযথভাবে যৌক্তিক বিভাগ করতে পারবেন।

যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of the Violations of Rules of Logical Division)

আমরা জানি কোনো একটি নীতি বা সূত্রের ভিত্তিতে যখন একটি জাতিবাচক পদকে এর অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করা হয় তখন তাকে যৌক্তিক বিভাগ বলে। যৌক্তিক বিভাগে মোট ছয়টি নিয়ম রয়েছে। এ ছয়টি নিয়ম লঙ্ঘন করলে যে সকল অনুপপত্তি ঘটে সেগুলো নিম্নরূপ :

(ক) অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Physical Division)

একটি গাছকে এর মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।
সংঘটিত অনুপপত্তি : অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি
অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম অনুযায়ী বিভাজ্য পদটিকে সর্বদা শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদ হতে হবে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু হলে চলবে না। এ নিয়মের মূল তাৎপর্য হলো যৌক্তিক বিভাগে সব সময় কোনো জাতি বা শ্রেণিকেই ভাগ করা হয়ে থাকে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে নয়। কিন্তু এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে এর বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয় তখন এক্ষেত্রে যে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয় তাকে অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of physical division) বলে। আলোচ্য বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোনো শ্রেণিবাচক পদ ব্যবহার না করে একটি বিশেষ পদ অর্থাৎ একটি গাছকে এর মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি অংশে বা অঙ্গে ভাগ করা হয়েছে। তাই এখানে অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

অনুশীলনের জন্য অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তির আরও কিছু দৃষ্টান্ত (Some More Examples of the Fallacy of Physical Division for Practise)

১। একটি চেয়ারকে এর পায়া, হাতল, বসার ছাউনি ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।
২। একটি গাছকে মূল, কান্ড, পাতা, ফুল, ফল ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।
৩। একটি বইকে এর পৃষ্ঠা, মলাট, শব্দ, বর্ণ, ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।
৪। একটি দেশকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।
৫। একটি ফুলকে এর বৃন্ত, পাপড়ি, রেণু ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।
৬। একটি ঘোড়াকে তার মাথা, কান, লেজ, পা ইত্যাদি অংশে ভাগ করা।

(খ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Metaphysical Division)

একটি আপেলকে এর রং, স্বাদ ও গন্ধে ভাগ করা।
অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম অনুযায়ী বিভাজ্য পদটিকে সর্বদা শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদ হতে হবে, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু হলে চলবে না। কিন্তু এ নিয়মটি লঙ্ঘন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় যখন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুকে এর বিভিন্ন গুণের ভিত্তিতে ভাগ করা হয় তখন এক্ষেত্রে যে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয় তাকে গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Metaphysical Division) বলে। আলোচ্য বিভাজন প্রক্রিয়ায় কোনো শ্রেণিবাচক পদ ব্যবহার না

করে একটি আপেলকে এর বিশেষ গুণ অর্থাৎ রং, স্বাদ ও গন্ধে ভাগ করা হয়েছে। ফলে এখানে গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

অনুশীলনের জন্য গুণগত বিভাগ অনুপপত্তির আরও কিছু দৃষ্টান্ত (Some More Examples of the Fallacy of Metaphysical Division for Practise)

১। কোনো একটি বস্তুকে এর রং, ওজন ও মূল্য অনুযায়ী ভাগ করা।

২। কাঁচকে এর ঘনত্ব, স্বচ্ছতা ও ভঙ্গুরতা অনুসারে ভাগ করা।

সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি
(Fallacy of Cross Division or Fallacy of Overlapping Division)

মানুষ জাতিকে 'সভ্যতা', 'সততা' ও 'মহানুভবতা' এ তিনটি নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করা।

অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : যৌক্তিক বিভাগের দ্বিতীয় নিয়ম হলো বিভাজন প্রক্রিয়ায় সব সময় একটি মাত্র নীতিকে মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। আর চতুর্থ নিয়ম হলো বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভক্ত উপজাতিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে হবে, কিছুতেই একটি অন্যটির সাথে মিশে যেতে পারবে না। দ্বিতীয় নিয়মটি লঙ্ঘন করে একটির পরিবর্তে যদি একই সময়ে একাধিক মূলনীতি গ্রহন করা হয় অথবা চতুর্থ নিয়মটি লঙ্ঘন করে যদি কোনো শ্রেণিবাচক পদকে এমন ভাবে ভাগ করা হয় যে একটি উপশ্রেণি অন্যটির সাথে মিশে যায়, তহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Cross Division or Fallacy of Overlapping Division) বলে। আলোচ্য বিভাজন প্রক্রিয়ায় 'মানুষ' জাতিকে ভাগ করতে গিয়ে 'সভ্যতা', 'সততা', 'মহানুভবতা' এ তিনটি নীতিকে বিভাগের সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করা হয়েছে। ফলে একটি উপশ্রেণি অন্যটির সাথে মিশে গিয়েছে। কারণ যে 'সভ্য' সে 'সৎ' এবং 'মহানুভব'-ও হতে পারে, যে 'সৎ' সে 'সভ্য' এবং 'মহানুভব'-ও হতে পারে এবং যে 'মহানুভব' সে 'সভ্য' এবং 'সৎ'-ও হতে পারে। সুতরাং বিভাজন প্রক্রিয়াটি যথাযথ নয় এবং এতে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

অনুশীলনের জন্য সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তির আরও কিছু দৃষ্টান্ত (Some More Examples of the Fallacy of Cross Division or Fallacy of Overlapping Division for Practise)

১। মানুষ জাতিকে লিঙ্গ, বয়স ও উচ্চতার ভিত্তিতে ভাগ করা।

২। জড় বস্তুকে এর ওজন, আয়তন ও আকৃতি অনুসারে ভাগ করা।

অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Too Narrow Division)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্কুল ও কলেজ উপশ্রেণিতে ভাগ করা।

অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম হলো বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজ্য পদের ব্যক্ত্যর্থ বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থের যোগফলের সমান হতে হবে, কম বা বেশি হলে চলবে না। অর্থাৎ একটি জাতিকে বিভিন্ন উপজাতিতে বিভাজন করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন এ থেকে কোনো উপজাতি বাদ না পড়ে, আবার অতিরিক্ত কোনো উপজাতি এর অন্তর্ভুক্ত না হয়। কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজ্য পদের কোনো উপজাতি যদি বাদ দেয়া হয় তাহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Too Narrow Division) বলে। আলোচ্য বিভাজন প্রক্রিয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্কুল ও কলেজ উপশ্রেণিতে ভাগ করায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় বাদ পড়েছে। ফলে এতে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে।

অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Too Wide Division)

মূদ্রাকে সোনা, রূপা, তামা, ব্যাংক নোট ইত্যাদিতে বিভক্ত করা।

অনুপপত্তির ব্যাখ্যা: যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়ম হলো বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজ্য পদের ব্যক্ত্যর্থ বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থের যোগফলের সমান হতে হবে, কম বা বেশি হলে চলবে না। অর্থাৎ একটি জাতিকে বিভিন্ন উপজাতিতে বিভাজন করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন এ থেকে কোনো উপজাতি বাদ না পড়ে, আবার অতিরিক্ত কোনো উপজাতি এর অন্তর্ভুক্ত না হয়। কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় যদি বিভাজ্য পদের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন

কোনো উপজাতি উল্লেখ করা হয় তাহলে উপজাতিগুলোর মোট ব্যক্ত্যর্থ জাতির ব্যক্ত্যর্থের তুলনায় অধিক হয় । এর ফলে এতে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Too Wide Division) ঘটে । আলোচ্য বিভাজন প্রক্রিয়ায় মুদ্রাকে সোনা, রূপা, তামা, ব্যাংক নোট ইত্যাদিতে বিভক্ত করায় বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থ মুদ্রার ব্যক্ত্যর্থের তুলনায় অধিক হয়েছে । অর্থাৎ এক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগের তৃতীয় নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়েছে এবং এতে অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে ।

উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Division by Leap)

জীব জাতিকে দার্শনিক, সহিত্যিক ও অন্যান্য পেশাজীবী উপজাতিতে বিভক্ত করা ।

অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : যৌক্তিক বিভাগের ষষ্ঠ নিয়ম হলো ক্রমিক বিভাগে বিভাজ্য শ্রেণি বা জাতিকে এর নিকটতম উপশ্রেণি বা উপজাতিতে ভাগ করতে হবে, মধ্যবর্তী কোনো স্তর বাদ দেয়া যাবে না । কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় যদি বিভাজ্য শ্রেণি বা জাতিকে এর নিকটতম উপশ্রেণি বা উপজাতিতে ভাগ না করে এর মধ্যবর্তী কোনো স্তর বাদ দেয়া হয় তাহলে এতে উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি (Fallacy of Division by Leap) ঘটে । বর্তমান বিভাজনের ক্ষেত্রে জীব জাতিকে দার্শনিক, সহিত্যিক ও অন্যান্য পেশাজীবী উপজাতিতে বিভক্ত করায় জীব ও মানুষের মধ্যবর্তী শ্রেণি 'অন্যান্য প্রাণি' বাদ পড়েছে । অর্থাৎ এতে উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে ।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন ।

সারসংক্ষেপ

যৌক্তিক বিভাগে মোট ছয়টি নিয়ম রয়েছে । এ নিয়মগুলো অনুসরণ করলে বিভাগ প্রক্রিয়া যেমন যথার্থ হয় তেমনি লঙ্ঘন করলে অনুপপত্তি ঘটে । যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘনজনিত অনুপপত্তিগুলো হলো- অঙ্গঅঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি, গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি, সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি, অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি, অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি এবং উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন ।

১ । বিভাজ্য শ্রেণি বা জাতিকে এর নিকটতম উপশ্রেণি বা উপজাতিতে ভাগ না করে মধ্যবর্তী কোনো স্তর বাদ দেয়া হলে কোন্ ধরনের অনুপপত্তি ঘটে?

(ক) পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি (খ) উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি
(গ) অঙ্গঅঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (ঘ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি

২ । মুদ্রাকে সোনা, রূপা, তামা, ব্যাংক নোট ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হলে নিচের কোন্টি ঘটে?

(ক) অঙ্গঅঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (খ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি
(গ) অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি (ঘ) অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি

৩ । যৌক্তিক বিভাগের প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করলে বিভাজন প্রক্রিয়ায় যে ধরনের অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়-

(i) অঙ্গঅঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি (ii) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি
(iii) সংকর বিভাগ অনুপপত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii, ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

পাঠ-২.৪ দ্বিকোটিক বিভাগ এবং এর সুবিধা-অসুবিধা
Division by Dichotomy and Its Merits-Demerits)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দ্বিকোটিক বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।
- দ্বিকোটিক বিভাগের সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয় করতে পারবেন।
- দ্বিকোটিক বিভাগের মাধ্যমে কয়টি বিরুদ্ধ উপজাতি পাওয়া যায় তা জানতে পারবেন।

দ্বিকোটিক বিভাগ
(Division by Dichotomy)

সাধারণত কোনো একটি জাতিকে এর অন্তর্ভুক্ত দু'টি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করাকে দ্বিকোটিক বিভাগ বলে। যৌক্তিক বিভাগ প্রক্রিয়াটি পদের ব্যক্ত্যর্থের সাথে সম্পৃক্ত। তাই বিভাগ করতে গেলে পদের ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকতে হয়। কিন্তু এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলেও যাতে কোনো কিছুই বিভাগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ না পড়ে সেজন্য প্রখ্যাত যুক্তিবিদ বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) 'দ্বিকোটিক বিভাগ' (Division by Dichotomy) নামক এক ধরনের বিভাজন প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেন। 'দ্বিকোটিক'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ' Dichotomy' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'dicha' এবং 'temno' থেকে উদ্ভূত। 'dicha' অর্থ 'দু'ভাগে' এবং 'temno' অর্থ 'ভাগ করা'। সুতরাং ' Dichotomy' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো- কোনো কিছুকে দু'ভাগে ভাগ করা।

দ্বিকোটিক বিভাগে একটি জাতিকে এমন দু'টি উপজাতিতে ভাগ করা হয়, যাদের একটিতে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে এবং অন্যটিতে অনুপস্থিত থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটি জাতিকে দু'টি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করা হয়। এদের একটি সদর্থক এবং অন্যটি নঞর্থক। উদাহরণস্বরূপ- দ্রব্যকে এর অন্তর্ভুক্ত দু'টি উপশ্রেণি 'সপ্রাণ' ও 'অপ্রাণ' হিসেবে বিভক্ত করা। এখানে লক্ষণীয় যে, বিভক্ত উপজাতি দু'টি মিলে জাতিটির সমস্ত ব্যক্ত্যর্থকে নির্দেশ করছে। তাই এ জাতির মধ্যে উল্লিখিত উপজাতিদ্বয় ছাড়া তৃতীয় কোনো বিকল্প উপজাতি নেই। যৌক্তিক বিভাগের এ প্রক্রিয়াটি যুক্তিবিদ্যার দু'টি মৌলিক নিয়ম; যথা- বিরোধবাধক নিয়ম (Law of Contradiction) এবং নির্মধ্যম নিয়ম (Law of Excluded Middle) এর উপর নির্ভরশীল। তাই যৌক্তিক বিভাগ একটি বৈধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিম্নোক্ত ছকের সাহায্যে দ্বিকোটিক বিভাগ প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করা হলো-

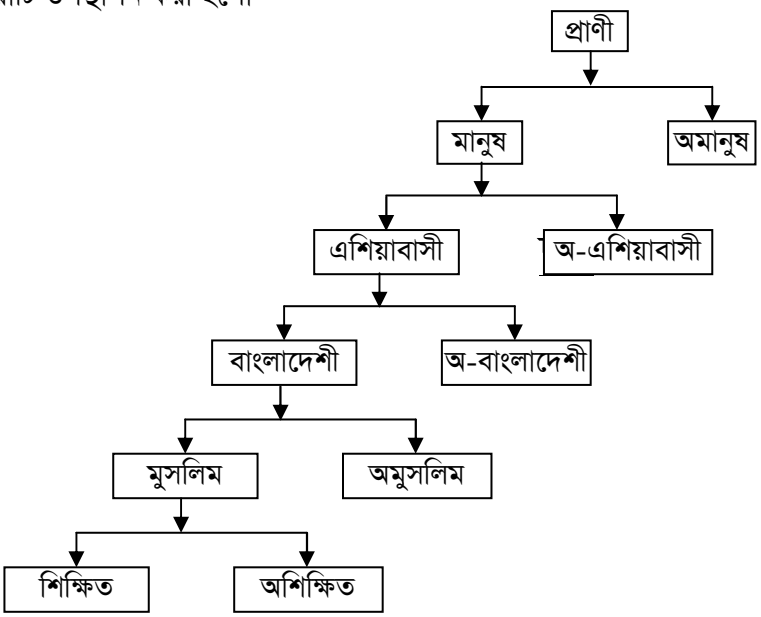

দ্বিকোটিক বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Division by Dichotomy)

দ্বিকোটিক বিভাগের উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, এর যেমন বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে কিছু অসুবিধা। নিম্নে এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো-

সুবিধাসমূহ (Merits)

১। দ্বিকোটিক বিভাগে উপশ্রেণিগুলোর ব্যক্ত্যর্থের যোগফল বিভাজ্য শ্রেণির ব্যক্ত্যর্থের সমান হয় বলে এখানে অব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ও অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

২। যৌক্তিক বিভাগের এ প্রক্রিয়াটি যুক্তিবিদ্যার দু'টি মৌলিক নিয়ম; যথা- বিরোধবাধক নিয়ম এবং নির্মধ্যম নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এতে সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে না।

৩। দ্বিকোটিক বিভাগে কেবল সদর্থক ও নঞর্থক গুণের ভিত্তিতে জাতিবাচক পদকে কেবলমাত্র দু'টি উপশ্রেণিতে ভাগ করা হয় বলে এটি অত্যন্ত সহজ-সরল প্রক্রিয়া।

৪। দ্বিকোটিক বিভাগ একটি আকারগত প্রক্রিয়া বলে পদের ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান ছাড়াই বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।

৫। দ্বিকোটিক বিভাগে উপশ্রেণিগুলোর যে কোনো পর্যায় থেকে আরম্ভ করে অন্য যে কোনো পর্যায়ে শেষ করলেও বিভাগ ত্রুটিমুক্ত থাকে।

৬। দ্বিকোটিক বিভাগ একটি নিখুঁত ও নির্ভুল প্রক্রিয়া।

অসুবিধাসমূহ
(Demerits)

১। দ্বিকোটিক বিভাগে নঞর্থক পদ দ্বারা যে উপজাতিকে নির্দেশ করা হয় তা অস্পষ্ট। যেমন, প্রাণীকে যখন 'মানুষ' ও 'অমানুষ' এ দু'ভাগে ভাগ করা হয় তখন 'অমানুষ' দ্বারা আসলে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে কোনো কিছুকে নির্দেশ করা হয় না।

২। পরস্পর বিরোধী পদ ব্যবহার করা হয় বলে দ্বিকোটিক বিভাগ একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ার শেষ কোথায় তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন।

৩। দ্বিকোটিক বিভাগে ব্যবহৃত নঞর্থক পদটি বাস্তব ঘটনা ভিত্তিক নয়।

৪। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দ্বিকোটিক বিভাগ কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম নয়।

৫। দ্বিকোটিক বিভাগ প্রক্রিয়ায় কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল উপজাতি সম্পর্কে জানা যায় না বলে বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ : দ্বিকোটিক বিভাগের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

কোনো একটি জাতিকে এর অন্তর্ভুক্ত দু'টি বিরুদ্ধ উপজাতিতে বিভক্ত করাই হলো দ্বিকোটিক বিভাগ। বিভক্ত উপজাতিগুলোর একটি সদর্থক এবং অন্যটি নঞর্থক গুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে। দ্বিকোটিক বিভাগ বিরোধবাধক নিয়ম এবং নির্মধ্যম নিয়ম এর উপর নির্ভরশীল। তাই এটি একটি নিখুঁত ও নির্ভুল বিভাজন প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। 'Dichotomy' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো-
(ক) কোনো কিছুকে দু'ভাগে ভাগ করা (খ) কোনো কিছুকে তিন ভাগে ভাগ করা
(গ) কোনো কিছুকে সমান দু'ভাগে ভাগ করা (ঘ) কোনো কিছুকে সমান তিন ভাগে ভাগ করা

২। দ্বিকোটিক বিভাগ যে মৌলিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত তা হলো-
(i) বিরোধবাধক নিয়ম (ii) নির্মধ্যম নিয়ম (iii) কার্যকারণ নিয়ম

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

৩। দ্বিকোটিক বিভাগ হলো-
(i) আকারগত প্রক্রিয়া (ii) একটি নিখুঁত ও নির্ভুল প্রক্রিয়া (iii) সহজ-সরল প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

পাঠ-২.৫ যৌক্তিক বিভাগের গুরুত্ব (Importance of Logical Division)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যৌক্তিক বিভাগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগের গুরুত্বের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

যৌক্তিক বিভাগের গুরুত্ব (Importance of Logical Division)

যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে সেগুলোর সবই যৌক্তিক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যৌক্তিক বিভাগও কোনো উদ্দেশ্যহীন প্রক্রিয়া নয়। তাই অন্যান্য আলোচ্য বিষয়বস্তুর ন্যায় যৌক্তিক বিভাজনও একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নে এর প্রয়োজনীয়তার কতিপয় দিক সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—

১। পদের সুষ্ঠু প্রয়োগে সহায়ক : যৌক্তিক বিভাজনের সাহায্যে আমরা যেকোনো জাতিবাচক পদের ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করি। ফলে আমাদের পক্ষে পদসমূহের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হয়।

২। পদের সংজ্ঞা নির্ণয়ে সহায়তা করে : কোনো কিছুর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হলে তার নিকটতম জাতি ও বিভেদক লক্ষণ উল্লেখ করতে হয়। আর নিকটতম জাতি সম্পর্কিত ধারণা আমরা কেবলমাত্র যৌক্তিক বিভাগের মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। তাই বলা যায় যৌক্তিক বিভাগ আমাদেরকে যেকোনো পদের সংজ্ঞা নির্ণয়ে সহায়তা করে।

৩। জাতি ও উপজাতি নির্ণয়ে সহায়ক : যৌক্তিক বিভাগের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারি। অর্থাৎ একটি জাতির অধীনে কয়টি উপজাতি আছে এবং উপজাতিগুলোর সাথে জাতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এটি আমাদেরকে সহায়তা করে থাকে। কারণ যৌক্তিক বিভাগের মূল কাজই হলো একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট ধারণা প্রদান করা।

৪। স্মৃতি শক্তির সহায়ক : একটি জাতির অন্তর্গত সকল বিষয় একই সাথে মনে রাখা অনেক সময় আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় একটি জাতিকে যদি এর অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতিসমূহে বিভক্ত করা হয় তাহলে এর সাহায্যে বিষয়বস্তুর গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই যৌক্তিক বিভাগ আমাদের স্মৃতি শক্তির জন্য সহায়ক।

৫। ব্যক্তি মনের বদ্ধমূল ধারণা দূর করে : যে কোনো পদের যৌক্তিক বিভাজন অতি সহজেই ব্যক্তি মনের কুসংস্কার দূর করে এবং বদ্ধমূল ধারণাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ অপরের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রেও যৌক্তিক বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সহায়তা করে : আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখাই বিভাজন প্রক্রিয়ার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই যৌক্তিক বিভাগ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, কোনো বিজ্ঞানী যদি পানি নিয়ে গবেষণা করতে চান তাহলে প্রথমেই তাঁকে বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর মধ্যে কী কী উপাদান রয়েছে তা বের করতে হয়।

৭। চিন্তাকে সুশৃঙ্খল করতে সহায়তা করে : যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়া আমাদের চিন্তাকে সুশৃঙ্খল করতে সহায়তা করে। কারণ আমরা জানি যে, বিভাজন প্রক্রিয়া হচ্ছে একটি সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া। তাই এর সাহায্যে আমরা যখন কোনো

কিছুকে বিভিন্ন উপবিভাগে ভাগ করি, তখন মূলত আমাদের সুশৃঙ্খল চিন্তা-চেতনারই প্রতিফলন ঘটাই। অর্থাৎ যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়া আমাদেরকে সুশৃঙ্খল চিন্তা-চেতনা বিকাশে সহায়তা করে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, যৌক্তিক বিভাগ যুক্তিবিদ্যার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। পদের সংজ্ঞা নির্ণয়ের মাধ্যমে এর সঠিক প্রয়োগ, জাতি ও উপজাতি নির্ণয়ে সহায়তা করা, স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করা, ব্যক্তি মনের বদ্ধমূল ধারণা দূর করা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাসহ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগের প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া যৌক্তিক বিভাগের যথাযথ আলোচনা এবং এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা প্রকৃতিতে অবস্থিত বিভিন্ন জাতি বা শ্রেণি ও এদের অন্তর্গত বিভিন্ন উপজাতি বা উপশ্রেণি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান বা সঠিক ধারণা লাভ করতে পারি। যৌক্তিক বিভাগ পদের অর্থগত, পরিমাণগত ও বৈশিষ্ট্যগত দিকটি প্রকাশ করে এবং যুক্তি গঠন, যুক্তি প্রণয়ন, জাতি-উপজাতির বিভাজন, শ্রেণিকরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। তাই যুক্তিবিদ্যার আলোচনায় যৌক্তিক বিভাগ একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক বিভাগের গুরুত্ব সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যৌক্তিক বিভাগ কোনো উদ্দেশ্যহীন প্রক্রিয়া নয়। যুক্তিবিদ্যার অন্যান্য আলোচ্য বিষয়বস্তুর ন্যায় যৌক্তিক বিভাজনও একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এটি পদের সুষ্ঠু প্রয়োগে, সংজ্ঞা নির্ণয়ে, জাতি ও উপজাতি নির্ণয়ে মনের বদ্ধমূল ধারণা দূরীকরণে ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সহায়তা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যৌক্তিক বিভাজনের সাহায্যে আমরা—
(ক) পদের ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করি (খ) পদের জাত্যর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করি
(গ) পদের ব্যক্ত্যর্থ ও জাত্যর্থ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করি (ঘ) উপরের কোনোটিই নয়

২। যৌক্তিক বিভাগের মূল কাজ হলো—
(ক) একক ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা (খ) বিভিন্ন উপজাতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা
(গ) সমষ্টিবাচক পদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা (ঘ) বিশিষ্ট গুণবাচক পদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা

৩। যৌক্তিক বিভাগ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এটি—
(i) পদের সুষ্ঠু প্রয়োগে সহায়তা করে (ii) সংজ্ঞা নির্ণয়ে সহায়তা করে
(iii) মনের বদ্ধমূল ধারণা দূরীকরণে সহায়তা করে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও iii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) i ও ii

পাঠ-২.৬ যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Logical Division)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতে পারবেন।
- যৌক্তিক বিভাগ কেন একটি সীমিত প্রক্রিয়া তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা (Limitations of Logical Division)

কোনো পদের ব্যক্ত্যর্থের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে যৌক্তিক বিভাগের মূল বিষয়। আর এ কাজটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ কতগুলো বিধিবদ্ধ নিয়মের উপর নির্ভরশীল। তাই যে সব ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগের এ নিয়মগুলো প্রয়োগ করা যায় না সে সব বিষয়ের যৌক্তিক বিভাজনও সম্ভব নয়। নিম্নে যৌক্তিক বিভাজনের সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হলো—

১। যৌক্তিক বিভাগ হলো মূলত ব্যক্ত্যর্থের বিশ্লেষণ। তাই যে সব পদের ব্যক্ত্যর্থ নেই শুধুমাত্র জাত্যর্থ আছে, এরূপ পদের যৌক্তিক বিভাজন সম্ভব নয়। যেমন- তূষারশুভ্রতা, সত্যবাদিতা, চতুষ্কোণতা ইত্যাদি পদের শুধু জাত্যর্থ আছে কিন্তু ব্যক্ত্যর্থ নেই। সুতরাং এ জাতীয় পদের যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব নয়।

২। মানব মনের মৌলিক অনুভূতিসমূহের যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না। অর্থাৎ সুখ-দঃখ, আনন্দ-বেদনা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়াগুলো অনন্য প্রকৃতির বলে এগুলোর যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না।

৩। বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ যেমন- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ইত্যাদি পদকে বিভক্ত করলে কোনো উপজাতি পাওয়া যায় না বরং বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু পাওয়া যায়। তাই এ জাতীয় বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদের যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না।

৪। একক কোনো বস্তু বা বিষয় যেমন- রহিম, একটি নির্দিষ্ট আম ইত্যাদিকে ভাগ করলে তা আর ঐ বস্তু বা বিষয় থাকে না বলে এগুলোর যৌক্তিক বিভাজন করা যায় না।

৫। ক্ষুদ্রতম উপজাতিকে ভাগ করলে একক ব্যক্তি বা বস্তু পাওয়া যায় বলে এর যৌক্তিক বিভাজন করা যায় না।

৬। যৌগিক বা মিশ্র গুণসম্পন্ন বস্তুসমূহের যৌক্তিক বিভাগ করা যায় না।

৭। যে সব পদের ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না সেগুলোর যৌক্তিক বিভাজন সম্ভব নয়।

৮। সরল ও মৌলিক পদসমূহকে এবং যে সকল পদকে যৌক্তিক বিভাগের নিয়মানুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় না সে সব পদের যৌক্তিক বিভাজন করা সম্ভব নয়।

অতএব, যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, এমন অনেক বিষয় যে সব বিষয়ে যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়টি সম্পূর্ণরূপে অচল। তাই এক কথায় বলা যায় যে, এটি একটি সীমিত প্রক্রিয়া।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক বিভাগের সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

যৌক্তিক বিভাগ একটি সীমিত প্রক্রিয়া। কারণ যৌক্তিক বিভাগের নিয়মগুলো সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। ব্যক্ত্যর্থহীন পদসমূহের, মৌলিক মানসিক প্রক্রিয়াগুলোর, বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদসমূহের, একক বস্তু বা বিষয়ের, ক্ষুদ্রতম উপজাতির, মিশ্র গুণসম্পন্ন বস্তুর এবং যে সব পদের ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না সেগুলোর যৌক্তিক বিভাজন সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। 'বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ' পদটির যৌক্তিক বিভাজন সম্ভব নয়, কারণ এটি একটি-
(ক) একক পদ (খ) বিশিষ্ট সমষ্টিবাচক পদ
(গ) মিশ্র গুণসম্পন্ন পদ (ঘ) গুণবাচক পদ

২। যৌক্তিক বিভাগ একটি
(ক) সীমাহীন প্রক্রিয়া (খ) সীমিত প্রক্রিয়া
(গ) জটিল প্রক্রিয়া (ঘ) সরল প্রক্রিয়া

৩। একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে যৌক্তিকভাবে বিভাজন করা যায় না, কারণ-
(i) ভাগ করলে তা আর ঐ বস্তু থাকে না (ii) এটি একটি একক পদ
(iii) মিশ্র গুণসম্পন্ন পদ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট- ২

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। একটি দেশকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ইত্যাদি অংশে ভাগ করা হলে তাতে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটে?

(ক) উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি (খ) অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি
(গ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি (ঘ) কোনো অনুপপত্তি ঘটেনি

২। নিচের কোন্‌টি সংকর বিভাগ অনুপপত্তি বা পরস্পরাঙ্গী বিভাগ অনুপপত্তি নির্দেশ করে ?

(ক) কাঁচকে এর ঘনত্ব, স্বচ্ছতা ও ভঙ্গুরতা অনুসারে ভাগ করা ।
(খ) মানুষ জাতিকে 'সভ্যতা', 'সততা' ও 'মহানুভবতা' এ তিনটি নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন উপজাতিতে ভাগ করা ।
(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্কুল ও কলেজ উপশ্রেণিতে ভাগ করা ।
(ঘ) জীব জাতিকে দার্শনিক, সহিত্যিক ও অন্যান্য পেশাজীবী উপজাতিতে বিভক্ত করা ।

৩। 'প্রাণি' পদটির ক্রমিক বিভাজন করতে গিয়ে প্রথমেই একে 'সভ্য মানুষ' ও 'অসভ্য মানুষ' পদে বিভাজন করা হলে তাতে-

(i) উল্লম্ফন বিভাগ অনুপপত্তি ঘটে (ii) যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘিত হয় না
(iii) যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম লঙ্ঘিত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

গণিতের শিক্ষার্থী আসাদ ত্রিভুজকে ভাগ করতে গিয়ে একে 'সমবাহু' ও 'বিষমবাহু' 'সমদ্বিবাহু' ও 'দ্বিবাহু' এ চারভাগে ভাগ করলো। অন্যদিকে পুষ্টিবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী জামান একটি আপেলকে এর বিভিন্ন রং, আকার, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি গুণে ভাগ করলো ।

৪। উদ্দীপকটিতে গণিতের শিক্ষার্থী আসাদ ত্রিভুজকে ভাগ করতে গিয়ে -

(ক) অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটিয়েছে (খ) অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটিয়েছে
(গ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটিয়েছে (ঘ) কোনো অনুপপত্তি ঘটায়নি

৫। উদ্দীপকে পুষ্টিবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী জামান এর বিভাজন প্রক্রিয়ায় -

(i) যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে
(ii) যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয়েনি
(iii) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। দৃশ্যকল্প-১ : বৈচিত্র্যময় এ বিশ্বের যাবতীয় বিষয় একই সাথে জানা বা মনে রাখা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই যুক্তিবিদগণ এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রবর্তন করেছেন যা কেবলমাত্র শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক পদের ক্ষেত্রেই সম্ভব, কোনো একক ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এ প্রক্রিয়াটি সব সময় একটিমাত্র নীতি বা সূত্র অনুসরণ করে থাকে। এতে বিভক্তমূল, বিভাজক উপশ্রেণি ও সহ-বিভাগ এ তিনটি বিষয় বিদ্যমান। এ প্রক্রিয়াটি যুক্তিবিদ্যার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

দৃশ্যকল্প-২ : এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলোর ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলেও যাতে কোনো কিছুই বিভাগ প্রক্রিয়া থেকে বাদ না পড়ে সেজন্য প্রখ্যাত যুক্তিবিদ বেনথাম এক বিশেষ ধরনের বিভাজন প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেন।

(ক) যৌক্তিক বিভাগের সংজ্ঞা দিন ১
(খ) উল্লম্ফন বিভাগ বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ কোন্ বিষয়টি নির্দেশ করছে? আপনার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
(ঘ) 'দৃশ্যকল্প-১ এ যে বিষয়টি নির্দেশ করছে তা থেকে দৃশ্যকল্প-২ এ একটি ভিন্ন মাত্রা রয়েছে'- উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। শিক্ষক এক শিক্ষার্থীর নিকট মুদ্রার প্রকারভেদ জানতে চাইলে জবাবে শিক্ষার্থী বলল,"মুদ্রা পাঁচ প্রকার, যথা- স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, তাম্রমুদ্রা, ব্রোঞ্জমুদ্রা ও কাগজের নোট।" এরপর শিক্ষকের অন্য প্রশ্নের জবাবে শিক্ষার্থী বলল," ত্রিভুজ দুই প্রকার, যথা- সমবাহু ত্রিভুজ ও বিষমবাহু ত্রিভুজ।"

ক. দ্বিকোটিক বিভাগ কাকে বলে? ১
খ. উল্লম্ফন বিভাগ কেন ত্রুটিপূর্ণ হয়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেকার একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২ ঃ ১-গ, ২-গ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬ ঃ ১-খ, ২-খ, ৩-ঘ

আরোহের প্রকারভেদ
(Kinds of Induction)

ইউনিট ৩

ভুমিকা

বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনার পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করাই হলো আরোহ অনুমান। যুক্তিবিদ্যার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আরোহ কথাটিকে বিভিন্ন যুক্তিবিদ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন। যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) এর পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ণাঙ্গ আরোহ, আংশিক বা সাধারণ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহ এই তিন প্রকারের আরোহ অনুমানের প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) আরোহের এক বিশেষ শ্রেণিকরণ করেন। তিনি আরোহকে প্রধানত প্রকৃত ও অপ্রকৃত এ দু'ভাগে ভাগ করেন এবং প্রকৃত ও অপ্রকৃত আরোহের প্রত্যেকটিকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করেন। অর্থাৎ যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) আরোহকে মোট ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) প্রদত্ত আরোহের এ শ্রেনিবিভাগ অদ্যাবধি অনুসৃত হয়ে আসছে। এ ইউনিটে আমরা জে. এস. মিল (J. S. Mill) প্রদত্ত আরোহের শ্রেনিবিভাগের ভিত্তিতেই বিভিন্ন প্রকার আরোহ নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময় : সর্বোচ্চ ০৬ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১: আরোহের শ্রেণীবিভাগ
পাঠ-৩.২: বৈজ্ঞানিক আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৩.৩: বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য
পাঠ-৩.৪: অবৈজ্ঞানিক আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৩.৫: অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য
পাঠ-৩.৬: বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক
পাঠ-৩.৭: সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ
পাঠ-৩.৮: সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য
পাঠ-৩.৯: সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ
পাঠ-৩.১০: সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ
পাঠ-৩.১১: সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব
পাঠ-৩.১২: পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৩.১৩: পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক
পাঠ-৩.১৪: পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য
পাঠ-৩.১৫: যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ
পাঠ-৩.১৬: যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে সম্পর্ক
পাঠ-৩.১৭: ঘটনা সংযোজন ও এর প্রকৃতি
পাঠ-৩.১৮: ঘটনা সংযোজন সম্পর্কে মিলের অভিমত
পাঠ-৩.১৯: ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের পার্থক্য

পাঠ-৩.১ আরোহের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- আরোহের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার আরোহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ (Definition and Esxample of Induction)

আরোহের শ্রেণিবিভাগ আলোচনার পূর্বে আরোহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে আরোহ বলে। আমাদের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাস্তব জগতের কতিপয় বিশিষ্ট ঘটনা সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তার উপর নির্ভর করে আরোহ অনুমানের সাহায্যে কোনো একটি শ্রেণি সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। অর্থাৎ এ অনুমানে আমরা কিছু থেকে সমগ্রে, নিরীক্ষিত ঘটনা থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায় এবং বিশেষ থেকে সার্বিক বাক্যে পদার্পণ করি। এক্ষেত্রে কতিপয় দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে আরোমূলক লম্ফের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির সকল সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এরূপ অনুমানের আশ্রয়বাক্যগুলো সাধারণত বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য এবং সিদ্ধান্ত সার্বিক যুক্তিবাক্য হয়ে থাকে। যেমন—

রাশেক হয় মরণশীল।
বারেক হয় মরণশীল।
শাকের হয় মরণশীল।
জাকের হয় মরণশীল।
রাশেদা হয় মরণশীল।
মোর্শেদা হয় মরণশীল।
তামান্না হয় মরণশীল।
অতএব সকল মানুষ হয় মরণশীল।

আলোচ্য দৃষ্টান্ত অনুসারে আমরা প্রথমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রাশেক, বারেক, শাকের, জাকের, রাশেদা, মোর্শেদা ও তামান্নার মরণশীলতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করি। এরপর প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে সব মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করি। আর সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপনের এ প্রক্রিয়াই হলো আরোহ অনুমান। বিভিন্ন যুক্তিবিদ কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নোক্ত সংজ্ঞায় আরোহ অনুমানের এ বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়।

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন, "আরোহ হচ্ছে মনের সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা অনুমান করি যে, যাকে আমরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্য বলে জানি তা অনুরূপ সকল ক্ষেত্রেই সত্য হবে।" ("Induction then, is that operation of the mind by which we infer that what we know to be true in particular case or cases will be true in all cases which resemble the former in certain assignable respects." 1889, p-188)

থমাস ফাউলার (Thomas Fowler) তাঁর *Inductive Logic* গ্রন্থে বলেন, "আরোহকে বিশেষ থেকে সার্বিক অথবা কম ব্যাপক থেকে বেশি ব্যাপক বাক্যের একটি ন্যায়সঙ্গত অনুমান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।" ("Induction may be defined as the legitimate inference of the general from the particular or of the more general from the less general." P-10)

যুক্তিবিদ বেইন (Bain) তাঁর *Logic -Induction* গ্রন্থে বলেন, "ঘটনাবলি নিরীক্ষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে পৌঁছানোকেই আরোহ বলে।" ("Induction is the arriving at general proposition by means of observation of facts." 1870, P-1)

যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read) তাঁর *Inductive Logic* বইয়ে বলেন, "আরোহ বলতে আমরা এমন একটি অনুমানকে বুঝি যেখানে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতায় বিশ্বাস স্থাপন করে পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে আমরা সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যে পদার্পণ করি।"("By induction we mean the inferential passage to the universal proposition based on observation in reliance on the uniformity of nature." P- XV)

সুতরাং উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা আরোহ অনুমানের সংজ্ঞায় বলতে পারি, যে অনুমান প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে আরোহাত্মক উল্লম্ফনের সাহায্যে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করাকে আরোহ অনুমান বলে।

আরোহের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Induction)

আরোহ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী যুক্তিবিদগণের মতামত বিচার-বিশ্লেষণ করে যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) আরোহের শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে প্রথমেই একে দু'টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—

১. প্রকৃত আরোহ বা যথার্থ আরোহ (Induction Proper) এবং
২. অপ্রকৃত আরোহ বা তথাকথিত আরোহ (Induction Improper or So-called Induction)।

১. প্রকৃত আরোহ বা যথার্থ আরোহ
(Induction Proper)

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর মতে, যে সব যুক্তিপদ্ধতিতে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য তথা আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান সেগুলোকে প্রকৃত আরোহ বা যথার্থ আরোহ (Induction Proper) বলা হয়। প্রকৃত আরোহে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়ম অনুসরণ করে। যেমন—

মৌসুমী হয় মরণশীল।
রবি হয় মরণশীল।
রফিক হয় মরণশীল।
কেয়া হয় মরণশীল।
অতএব সকল মানুষ হয় মরণশীল।

আলোচ্য দৃষ্টান্তে দেখা যাচ্ছে যে, প্রথমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মৌসুমী, রবি, রফিক, কেয়া প্রমুখের মরণশীলতা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা হয়েছে। এরপর প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কার্যকারণ নিয়ম অনুসরণ করে সব মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই এটি একটি প্রকৃত আরোহ। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) প্রকৃত আরোহকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

১. বৈজ্ঞানিক আরোহ (Scientific Induction)
২. অবৈজ্ঞানিক আরোহ (Unscientific Induction) ও
৩. সাদৃশ্যমূলক অনুমান (Analogy)

২. অপ্রকৃত আরোহ বা তথাকথিত আরোহ
(Induction Improper or So-called Induction)

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর মতে, যে সব অনুমান পদ্ধতিকে আপাতদৃষ্টিতে বা বাহ্যিকভাবে আরোহ বলে মনে হয়, কিন্তু সেগুলোর মধ্যে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য তথা আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান থাকে না সে সব অনুমান পদ্ধতিকে অপ্রকৃত আরোহ বা তথাকথিত আরোহ (Induction Improper or So-called Induction) বলা হয়। তিনি অপ্রকৃত আরোহকে আবার তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-

১. পূর্ণাঙ্গ আরোহ (Perfect Induction)
২. যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (Induction by Parity of Reasoning) ও
৩. ঘটনা সংযোজন (Colligation of Facts)

সুতরাং যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) আরোহকে মোট ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. বৈজ্ঞানিক আরোহ (Scientific Induction) ২. অবৈজ্ঞানিক আরোহ (Unscientific Induction) ৩. সাদৃশ্যমূলক অনুমান (Analogy) ৪. পূর্ণাঙ্গ আরোহ (Perfect Induction) ৫. যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (Induction by Parity of Reasoning) ও ৬. ঘটনা সংযোজন (Colligation of Facts)। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) প্রদত্ত আরোহের এ শ্রেণিকরণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হলো:

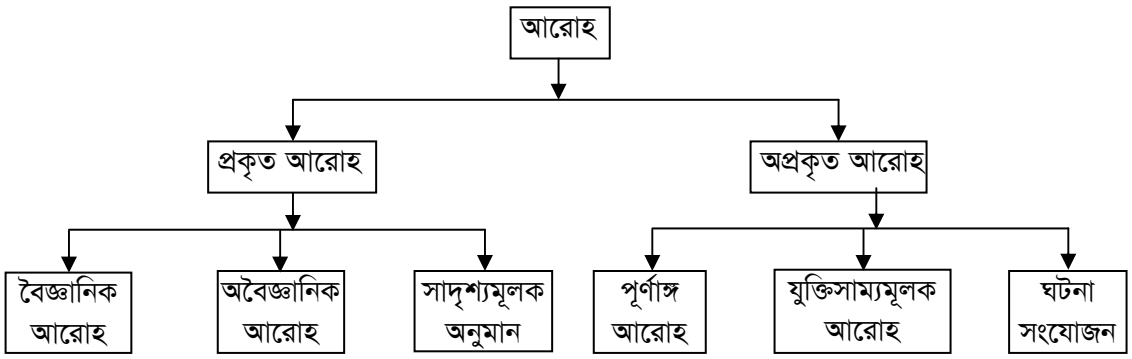

শিক্ষার্থীর কাজ : বিভিন্ন প্রকার আরোহ একটি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করুন।

সারসংক্ষেপ

যে অনুমান প্রক্রিয়ায় বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে আরোহ অনুমান বলে। এ অনুমানে আমরা কিছু থেকে সমগ্রে, নিরীক্ষিত ঘটনা থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায় এবং বিশেষ থেকে সার্বিক বাক্যে গমন করি। এক্ষেত্রে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষা করে আরোমূলক লম্ফের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট শ্রেণী সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল আরোহকে বৈজ্ঞানিক আরোহ, অবৈজ্ঞানিক আরোহ, সাদৃশ্যমূলক অনুমান, পূর্ণাঙ্গ আরোহ, যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও ঘটনা সংযোজন এ ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন ।

১। যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) আরোহকে প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত করেছেন?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। "ঘটনাবলি নিরীক্ষণের মাধ্যমে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যে পৌঁছানোকেই আরোহ বলে ।"- এ উক্তিটি নিচের কোন্ যুক্তিবিদের?
(ক) জন স্টুয়ার্ট মিল এর (খ) থমাস ফাউলার এর
(গ) বেইন এর (ঘ) কার্ভেথ রিড এর

৩। আরোহ অনুমানে আমরা পদার্পণ করি -
(i) কিছু থেকে সমগ্রে (ii) নিরীক্ষিত ঘটনা থেকে অনিরীক্ষিত ঘটনায়
(iii বিশেষ থেকে সার্বিক বাক্যে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ বৈজ্ঞানিক আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য (Scientific Induction and Its Characteristics)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক আরোহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক আরোহ এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক আরোহ (Scientific Induction)

আরোহ অনুমানের যে প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। বৈজ্ঞানিক আরোহে অন্যান্য আরোহের ন্যায় কেবল বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত টানা হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কও স্থাপন করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ ঃ

রাসেল হয় মরণশীল।
রাহেলা হয় মরণশীল।
রেহানা হয় মরণশীল।
রাজিব হয় মরণশীল।

∴ সকল মানুষ হয় মরণশীল।

আলোচ্য দৃষ্টান্তে রাসেল, রাহেলা, রেহানা, রাজিব প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে মানুষ ও মরণশীলতার মধ্যে একটি কার্য-কারণ আবিষ্কার পূর্বক প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করে সব মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং এটি বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি যথার্থ দৃষ্টান্ত।

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Scientific Induction)

বৈজ্ঞানিক আরোহের উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও উদাহরণ ব্যাখ্যা করলে এর যে বৈশিষ্ট্যগুলো অতি সহজেই উপরব্ধি করা যায় সেগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১। **বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় :** বৈজ্ঞানিক আরোহের এই বৈশিষ্ট্যটিতে মূলত তিনটি বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে। যথা-

(ক) এর সিদ্ধান্তে একটি যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় : আমরা জানি দু'টি পদের মধ্যকার সম্পর্কের বিবৃতিই হলো যুক্তিবাক্য। উদাহরণস্বরূপ উদ্দেশ্য পদ 'দার্শনিক'-এর সাথে বিধেয় পদ 'যুক্তিবাদী'-এর মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যে যুক্তিবাক্যটি পাওয়া যায় তাহলো- 'সকল দার্শনিক হন যুক্তিবাদী'।

(খ) এর সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য : যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলা হয়। যেমন- 'সকল দার্শনিক হন যুক্তিবাদী' এ যুক্তিবাক্যটির বিধেয় পদ 'যুক্তিবাদী'-এর উদ্দেশ্য পদ 'দার্শনিক'-এর সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ

সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য কোনো বিশেষ বা বিশিষ্ট বাক্য নয়।

(গ) এর সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য : বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা শুধুমাত্র একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যই নয় সংশ্লেষকও বটে। আমরা জানি যে, সংশ্লেষক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে নতুন তথ্য প্রদান করে। যেমন-'সকল মানুষ হয় মরণশীল'- এ বাক্যটি একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য। কারণ এর বিধেয় পদ 'মরণশীল' কথাটি মানুষ পদের জাত্যর্থের একটি অতিরিক্ত গুণ।

২। **বৈজ্ঞানিক আরোহ বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল :** সাধারণত পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। আর এ বিশেষ বিশেষ বাস্তব ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। যেমন- মনোয়ারা, কাশেম প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ তথা পর্যবেক্ষণ করে আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা অনুমান করি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত হিসেবে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

৩। **বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান :** আরোহ অনুমানে আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়াকে আরোহাত্মক উলম্ফন বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap) বলে। যেমন- যদি আমরা অল্প কয়েকজন বিশেষ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে এক বিশাল ব্যবধান অতিক্রম করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষ সম্পর্কে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি যে, 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' তাহলে তা হবে আরোহাত্মক উল্লম্ফন। কারণ এক্ষেত্রে অল্প কয়েকজন বিশেষ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে বিশাল ব্যবধান অতিক্রম করে সকল মানুষ সম্পর্কে সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রকৃত আরোহ অনুমানে আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্তে যাওয়ার ক্ষেত্রে যে ব্যবধান অতিক্রম করা হয় তা অনেকটা অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ার মতো বিপদজ্জনক। তাই প্রকৃত আরোহ অনুমান পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বেশ ঝুকিপূর্ণ বা সংকটাপন্ন হয়ে থাকে। আর এরূপ ঝুকিপূর্ণ বা সংকটাপন্ন অবস্থা অতিক্রম করার পদ্ধতিই হলো আরোহাত্মক উলম্ফন বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap)। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) ও আলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain)- এর মতে, এই আরোহাত্মক উলম্ফনই হলো প্রকৃত আরোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁরা মনে করেন, এ বৈশিষ্ট্যটি না থাকলে কোনো অনুমান প্রক্রিয়াকেই প্রকৃত আরোহ বলা যায় না। আর এ কারণেই যুক্তিবিদ মিল (Mill) ও বেইন (Bain) এই আরোহাত্মক উলম্ফনকে আরোহের প্রাণ বা অন্তঃসার বলে অভিহিত করেছেন।

৪। **বৈজ্ঞানিক আরোহ দু'টি মৌলিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত :** আমরা জানি যে, যেকোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই কিছু মৌলিক নিয়ম থাকে। তাই বৈজ্ঞানিক আরোহও বিজ্ঞানের দু'টি মৌলিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল। এ দু'টি মৌলিক নিয়ম হলো- (ক) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি (Law of Uniformity of Nature) এবং (খ) কার্য-কারণ নিয়ম (Law of Causation)।

(ক) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি (Law of Uniformity of Nature) : প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির অর্থ হলো- প্রকৃতি সব সময়ই একই অবস্থায় একই নিয়মে কাজ করে। প্রকৃতিতে এ নিয়মের কোনো ব্যাত্যয় ঘটে না। আমরা জানি বৈজ্ঞানিক আরোহে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। আর যে নীতির ভিত্তিতে এ ধরনের সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় তাহলো প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি (Law of Uniformity of Nature)। কারণ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি অনুসারে প্রকৃতিতে অভিন্ন অবস্থায় অভিন্ন ঘটনা ঘটে। তাই যে অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ঘটনা যেরূপে ঘটেছে অনুরূপ অবস্থায়

অবশিষ্ট যাবতীয় ঘটনাও সেরূপে ঘটবে বলে বিবেচনা পূর্বক 'বিশেষের ভিত্তিতে সার্বিক' বা 'কতিপয়ের ভিত্তিতে সব' সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেমন- যে অবস্থায় ও যে কারণে মনোয়ারা, কাশেম, রামেশা প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু ঘটে সে অবস্থা ও সে কারণ যাদের জীবনে আসবে তারাও মৃত্যুবরণ করবে। অর্থাৎ 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'।

(খ) কার্য-কারণ নিয়ম (Law of Causation) : কার্য-কারণ নিয়মের অর্থ হলো- প্রতিটি কার্য বা ঘটনারই একটি কারণ আছে। কারণহীন কোনো ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। কেননা নিছক শূণ্য থেকে কোনো ঘটনার সূত্রপাত হতে পারে না। তাই জগতের যাবতীয় ঘটনাই কার্য-কারণ নিয়মে শৃংখলিত। যেমন- মনোয়ারা, কাশেম, রামেশা প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু বিশেষ বিশেষ ঘটনা এবং প্রতিটি ঘটনার নিশ্চয়ই একটি কারণ আছে। মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা 'মানুষ' ও 'মরণশীলতা' এর মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করি এবং এর ভিত্তিতেই আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক আরোহ সর্বদাই কার্য-কারণ নিয়মের উপর নির্ভরশীল।

উল্লেখ্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং কার্য-কারণ নিয়ম এ দু'টি মৌলিক নিয়মের সহায়তায় আরোহ অনুমানের আকার পাওয়া যায় বা বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়া যায়। সেজন্যই এ দু'টি মৌলিক নিয়মকে আরোহের আকারগত ভিত্তি বলা হয়।

৫। **বৈজ্ঞানিক আরোহ আকারগত ও উপাদানগত উভয় সত্যই প্রতিষ্ঠা করে :** বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং কার্য-কারণ নিয়মের সহায়তায় একদিকে যেমন আকারগত সত্য প্রতিষ্ঠা করে, অন্যদিকে তেমনি বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উপাদানগত সত্যও প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ এতে আকারগত ও উপাদানগত উভয় সত্যই বিদ্যমান।

৬। **বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত হয় :** বৈজ্ঞানিক আরোহে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় সম্বলিত একটি শ্রেণির অন্তর্গত কিছু অনুকূল ও প্রতিকূল দৃষ্টান্ত সম্পর্কে বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান বা বস্তুগত সত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং কার্য-কারণ নিয়মের ভিত্তিতে সমগ্র শ্রেণি সম্পর্কে একটি সার্বিক সংশ্লেষক বাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে এক্ষেত্রে নতুন করে কোনো প্রতিকূল দৃষ্টান্ত দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই এর সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয়ে থাকে।

বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, আরোহের সকল বৈশিষ্ট্যই এতে বিদ্যমান। তাই এটি প্রকৃত আরোহ।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক বিভাগের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিন।

সারসংক্ষেপ

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা, বাস্তব ঘটনার পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভরতা, আরোহমূলক লম্ফ এবং আকারগত ও উপাদানগত উভয় সত্যই প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা বিধান করা। অর্থাৎ এতে আরোহের সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন ।

১ । রাসেল হয় মরণশীল ।
রাহেলা হয় মরণশীল ।
রেহানা হয় মরণশীল ।
রাজিব হয় মরণশীল ।
∴ সকল মানুষ হয় মরণশীল । - এটি কোন্ ধরনের আরোহ?

(ক) বৈজ্ঞানিক আরোহ (খ)অবৈজ্ঞানিক আরোহ
(গ) সাদৃশ্যানুমান (ঘ) ঘটনা সংযোজন

২ । বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তটি-
(ক)সম্ভাব্য হয় (খ) নিশ্চিত হয়
(গ) অনিশ্চিত হয় (ঘ) কোনোটিই নয়

৩ । বৈজ্ঞানিক আরোহে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় -
(i) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করে
(ii) কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে
(iii) বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

পাঠ-৩.৩ বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য (Value of Scientific Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য কীসের উপর নির্ভরশীল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য (Value of Scientific Induction)

আমরা জানি, প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক আরোহে শুধূমাত্র বিশেষ কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত টানা হয় না। এক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কও স্থাপন করা হয়। সুতরাং প্রকৃত আরোহের সবগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য আরোহের অন্য যেকোনো প্রকারের চেয়ে অনেক বেশি। নিম্নে বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো—

প্রথমত, বৈজ্ঞানিক আরোহ আকারগত ও উপাদানগত উভয় সত্যই প্রতিষ্ঠা করে। এটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং কার্য-কারণ নিয়মের সহায়তায় একদিকে যেমন আকারগত সত্য প্রতিষ্ঠা করে, অন্যদিকে তেমনি বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উপাদানগত সত্যও প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ এতে আকারগত ও উপাদানগত উভয় সত্যই বিদ্যমান। তাই এর মূল্য ও গুরত্বও অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত, আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত হিসেবে যে সার্বিক বাক্যটি স্থাপন করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পরীক্ষণ বা নিরীক্ষণের উপর। আর এই পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের সম্মিলিত রূপই হলো পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের সাহায্যেই মূলত বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান লাভ করা যায়। আর এ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মনগড়া ধারণার বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না। যেমন- রাশেদা, রহমান, রাসেল প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর বাস্তব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে আমরা সকল মানুষের মরণশীলতা অনুমান করি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক আরোহ সব সময়ই ঘটনা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক যা এটিকে আরও বেশি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান থাকায় এর সাহায্যে কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে একটি ব্যাপক ব্যবধান অতিক্রম করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর এভাবে অল্প ব্যাপক থেকে অধিক ব্যাপকে, নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্টে বা জানা থেকে অজানায় যাওয়ার প্রক্রিয়াই হলো আরোহাত্মক উল্লম্ফন। এর মাধ্যমেই কেবলমাত্র যেকোনো বিষয়ে নতুন তত্ত্ব বা নতুন তথ্য পাওয়া সম্ভব। তাই মানুষের মধ্যে অজানাকে জানার যে উদগ্র বাসনা রয়েছে সেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আরোহের এই বৈশিষ্ট্যটি অত্যন্ত সহায়কের ভূমিকা পালন করে। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে মানব জীবনে বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য অপরিসীম।

চতুর্থত, বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এর সিদ্ধান্ত সব সময় নিশ্চিত হয়। কারণ এতে বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ, সার্বিকীকরণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভন্ন বৈজ্ঞানিক স্তরসহ পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের বাস্তব প্রয়োগ রয়েছে। এসব সতর্কতামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় বলেই এর মাধ্যমে আমরা সঠিক তথা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পেয়ে থাকি। সুতরাং যথার্থ জ্ঞান বা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য অনস্বীকার্য।

পঞ্চমত, বৈজ্ঞানিক আরোহে যেকোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে এ পদ্ধতিতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অপনয়ন করা যায় । ফলে অতি সহজেই প্রকৃত সত্যের দ্বার উন্মোচিত হয় ।

ষষ্ঠত, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া । কারণ সকল বৈজ্ঞানিক সত্য এই আরোহের উপর প্রতিষ্ঠিত । তাছাড়া বিজ্ঞানের সকল স্তর অতিক্রম করে এই আরোহে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় বলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি ।

সপ্তমত, বৈজ্ঞানিক আরোহে দৃষ্টান্তের সংখ্যার চেয়ে দৃষ্টান্তের গুণগত মানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় বলে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনে এটি একটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে ।

সুতরাং পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সিদ্ধান্ত হিসেবে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপনের মাধ্যমে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব ও নিশ্চয়তা আনয়ন করার মধ্যেই বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য ও গুরুত্ব নিহিত ।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌক্তিক বিভাগের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিন ।

সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে প্রকৃত আরোহের সবগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে । ইহা আকারগত ও উপাদানগত উভয় সত্যই প্রতিষ্ঠা করে । এর সিদ্ধান্ত হিসেবে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য পাওয়া যায় এবং সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত হয় । তাই এর বৈজ্ঞানিক মূল্য রয়েছে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন ।

১ । বৈজ্ঞানিক আরোহ বাস্তব ঘটনা—
(ক) পরীক্ষণ ভিত্তিক (খ) পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক
(গ) নিরীক্ষণ ভিত্তিক (ঘ) কোনোটিই নয়

২ । বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং কার্য-কারণ নিয়মের সহায়তায় যে সত্য প্রতিষ্ঠা করে তাহলো—
(i) আকারগত সত্য (ii) উপাদানগত সত্য
(iii) সম্ভাব্য সত্য

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৪ অবৈজ্ঞানিক আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য (Unscientific Induction and Its Characteristics)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- অবৈজ্ঞানিক আরোহের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ (Definition and Example of Unscientific Induction)

যে আরোহ অনুমানে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও অবাধ বা বিরোধহীন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। এ অনুমান প্রক্রিয়ায় কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রচেষ্টা নেই বলেই এটিকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলা হয়। আবার এর সিদ্ধান্তে যে সার্বিক যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তার অন্তর্গত সকল দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ না করে অল্প সংখ্যক সমজাতীয় দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিকীকরণ করা হয় বলে একে অপূর্ণ গণনামূলক আরোহও বলা হয়ে থাকে।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সূত্র : অবৈজ্ঞানিক আরোহ মূলত যে সূত্রটি অনুসরণ করে তাহলো- 'এ ধরনের ঘটনা সব সময় এভাবেই ঘটতে দেখেছি, এর বিরুদ্ধ কোনো দৃষ্টান্ত কখনো দেখিনি। সুতরাং ঘটনাটি সত্য।'

অবৈজ্ঞানিক আরোহের উদাহরণ : আমি এ পর্যন্ত যত বক দেখেছি, এর সব গুলোই সাদা রঙের দেখেছি, একটি বকও অন্য রঙের দেখিনি। আমার এই বিরোধহীন ও ব্যতিক্রমহীন অভিজ্ঞতা থেকেই অনুমান করলাম যে, 'সকল বক হয় সাদা'। অর্থাৎ কেবলমাত্র অবাধ বা বাধাহীন অভিজ্ঞতা ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আমি একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এক্ষেত্রে বক কেন সাদা হলো তা নির্ণয়ের বা কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়নি। তাই আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণের এ প্রক্রিয়াটি হলো অবৈজ্ঞানিক আরোহ।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Unscientific Induction)

অবৈজ্ঞানিক আরোহের উপরিউক্ত সংজ্ঞা ও উদাহরণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়-

১। **অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তটি একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য :** পরিমাণের দিক থেকে অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তটি একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য এবং ঐ সিদ্ধান্তের বিধেয় পদটি এর উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কে নতুন তথ্য প্রদান করে। যেমন- আমাদের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে যখন আমরা বলি 'সব বক হয় সাদা' তখন এর উদ্দেশ্য পদ 'বক'-এর সম্পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে বিধেয় পদ 'সাদা' গুণটি সন্দেহাতীতভাবে একটি নতুন তথ্য প্রদান করে। তাই অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তটি এক দিক থেকে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য এবং অন্যদিক থেকে এটি আবার সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য।

২। **অবৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান :** আরোহ অনুমানে আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা

সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়াকে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap) বলে। অবৈজ্ঞানিক আরোহে এই আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান। কারণ মাত্র কয়েকটি বককে সাদা রঙের দেখে আমরা এক বিশাল ব্যবধান অতিক্রম করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, 'সব বক হয় সাদা'। যুক্তিবিদ মিল (Mill) ও বেইন (Bain)- এর মতে, এই আরোহমূলক লম্ফই হলো প্রকৃত আরোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৩। **অনুকূল অভিজ্ঞতা অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল ভিত্তি :** আমরা যদি কোনো বিষয়ে সব সময় একই রকম অভিজ্ঞতা পেতে থাকি এবং কখনই বিরোধী কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন না হই, তাহলে এ অনুকূল ও বিরোধহীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঐ বিষয়ে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। যেমন- আমরা সব সময়ই সাদা রঙের বক দেখি। অন্য কোনো রঙের বক আমরা দেখি না। এমতাবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, 'সকল বক হয় সাদা'। এতে প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র অনুকূল অভিজ্ঞতাই অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল ভিত্তি।

৪। **অবৈজ্ঞানিক আরোহ বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল :** অবৈজ্ঞানিক আরোহে সাধারণত পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা বাস্তব জগতের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে একই রকম জ্ঞান লাভ করি। আর এ কয়েকটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে বাস্তব ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক একই রকম জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। যেমন- আমাদের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকে যখন আমরা বলি 'সব বক হয় সাদা' তখন আমরা মূলত আমাদের পর্যবেক্ষণের উপরই নির্ভর করি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত হিসেবে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

৫। **অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত :** বৈজ্ঞানিক আরোহ বিজ্ঞানের দু'টি মৌলিক নিয়মের উপর নির্ভরশীল হলেও অবৈজ্ঞানিক আরোহ কেবলমাত্র একটি মৌলিক নিয়ম তথা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির (Law of Uniformity of Nature) উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির অর্থ হলো- প্রকৃতি সব সময়ই একই অবস্থায় একই নিয়মে কাজ করে। প্রকৃতিতে এ নিয়মের কোনো ব্যাত্যয় ঘটে না। আমরা জানি অবৈজ্ঞানিক আরোহে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। আর যে নীতির ভিত্তিতে এ ধরনের সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় তাহলো প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি (Law of Uniformity of Nature)। কারণ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি অনুসারে প্রকৃতিতে অভিন্ন অবস্থায় অভিন্ন ঘটনা ঘটে। তাই যে অবস্থায় বিশেষ বিশেষ ঘটনা যেরূপে ঘটেছে অনুরূপ অবস্থায় অবশিষ্ট যাবতীয় ঘটনাও সেরূপে ঘটবে বলে বিবেচনা পূর্বক 'বিশেষের ভিত্তিতে সার্বিক' বা 'কতিপয়ের ভিত্তিতে সব' সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেমন- আমরা সব সময়ই সাদা রঙের বক দেখি। অন্য কোনো রঙের বক আমরা দেখি না। কারণ বক সব সময়ই প্রকৃতিতে সাদা রঙে উপস্থাপিত হয়। প্রকৃতিতে এ নিয়মের কোনো ব্যাত্যয় ঘটে না। তাই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, 'সকল বক হয় সাদা'। সুতরাং অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৬। **অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয় :** অবৈজ্ঞানিক আরোহের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কতিপয় অনুকূল বা সদর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এখানে কার্য-কারণ নিয়মের কোনো প্রয়োগ থাকে না। ফলে এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয়।

৭। **অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকল্প গঠনে সহায়তা করে :** অবৈজ্ঞানিক আরোহে কতিপয় অনুকূল বা সদর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। আর এ অনুকূল দৃষ্টান্তসমূহের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে হলেও কার্য-কারণ নিয়মের আভাস পাওয়া যায়। তাই এর সাহায্যে অনেক সময় বৈধ প্রকল্প গঠন করা সম্ভব হয়।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, কেবলমাত্র কার্য-কারণ নিয়ম ছাড়া বৈজ্ঞানিক আরোহের সকল বৈশিষ্ট্যই অবৈজ্ঞানিক আরোহে রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ : অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

যে আরোহ অনুমানে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও অবাধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো- এর সিদ্ধান্তটি একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য, এতে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান, অনুকূল অভিজ্ঞতা এর মূল ভিত্তি, এটি বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল, এটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এর সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয় এবং ইহা প্রকল্প গঠনে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। 'এ ধরনের ঘটনা সব সময় এভাবেই ঘটতে দেখেছি, এর বিরুদ্ধ কোনো দৃষ্টান্ত কখনো দেখিনি। সুতরাং ঘটনাটি সত্য।'-এ বক্তব্যটি নিচের কোন্‌টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
(ক) বৈজ্ঞানিক আরোহ (খ) অবৈজ্ঞানিক আরোহ
(গ) সাদৃশ্যানুমান (ঘ) ঘটনা সংযোজন

২। অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রতিষ্ঠিত -
(i) কার্য-কারণ নীতির উপর (ii) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর
(iii) অবাধ অভিজ্ঞতার উপর

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। "আরোহমূলক লম্ফই হলো প্রকৃত আরোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য" এ উক্তিটি করেছেন-
(i) যুক্তিবিদ মিল (ii) যুক্তিবিদ বেইন
(iii) যুক্তিবিদ যোসেফ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য (Value of Unscientific Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য সম্পর্কে বেকন এর মতামত জানতে পারবেন।

অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য (Value of Unscientific Induction)

অবৈজ্ঞানিক আরোহে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা না করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে এর সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়ে থাকে। এ কারণেই জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) মনে করেন যে, অবৈজ্ঞানিক আরোহের কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। অবৈজ্ঞানিক আরোহে সাধারণত কতিপয় অনুকূল দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে এর সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য পর্যবেক্ষণযোগ্য দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়াতে থাকলে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আর একটি মাত্র বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করতে পারলেই এর সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সার্বিক যুক্তিবাক্যটি অসত্য প্রমাণিত হয় বা বাতিল হয়ে যায়। তাই যুক্তিবিদ ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) বলেন, "এটি একটি শিশুসুলভ অনুমান এবং একটি মাত্র বিরোধী দৃষ্টান্তের সাহায্যেই একে উড়িয়ে দেয়া যায়।" যেমন- 'সব বক হয় সাদা'- অবৈজ্ঞানিক আরোহের এ সিদ্ধান্তটি একটি মাত্র বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত আবিষ্কারের দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে পারে। মূলত এজন্যই অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য সম্পর্কে অনেক যুক্তিবিদ নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে। এরপরও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্যকে আমরা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। নিম্নে এর মূল্য সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো-

প্রথমত, অবৈজ্ঞানিক আরোহ লৌকিক আরোহ বলে অতি প্রাচীন কাল থেকে মানুষ এ পদ্ধতির সহায়তায় বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আসছে। আজও সাধারণ মানুষ মূলত এই পদ্ধতির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে এবং ভবিষ্যতেও এর ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। তাই সাধারণ মানুষের নিকট এর মূল্য কোনো অংশেই কম নয়।

দ্বিতীয়ত, অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হলেও যেসব ক্ষেত্রে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, সেসব ক্ষেত্রে কেবল অনুকূল দৃষ্টান্তের ভিত্তিতেই অগ্রসর হতে হয়। এমনকি কোনো ক্ষেত্রে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত না পাওয়া পর্যন্ত অবৈজ্ঞানিক আরোহের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তই কার্যকরী থাকে।

তৃতীয়ত, আমরা জানি, অবৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান। আরোহ অনুমানে আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়াকে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap) বলে। যুক্তিবিদ মিল (Mill) ও বেইন (Bain)- এর মতে, এই আরোহমূলক লম্ফই হলো প্রকৃত আরোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রকৃত আরোহের এ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি ধারণ করায় অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্যকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

চতুর্থত, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের যে সব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না সে সব ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক আরোহ পদ্ধতি খুব সহজেই প্রয়োগ করতে পারি। তাই আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে এর মূল্য রয়েছে।

পঞ্চমত, অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্য-কারণ নীতি অনুসরণ করা না হলেও এটি কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়তা করে, যাকে বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাথমিক স্তর বলা যেতে পারে। আর কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারলেই এ ধরনের আরোহ বৈজ্ঞানিক আরোহের মর্যাদা পেতে পারে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও একে মূল্যহীন বলা যায় না।

ষষ্ঠত, অবৈজ্ঞানিক আরোহে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তটি নিশ্চিত না হলেও সম্ভাব্য হয়ে থাকে। তাই সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বা প্রকল্প গঠনের ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক আরোহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে। কারণ আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের অজ্ঞাতসারেই এ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত অনুমান করি।

শিক্ষার্থীর কাজ : আমাদের ব্যবহারিক জীবনে অবৈজ্ঞানিক আরোহের কয়েকটি গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হলেও এর মূল্যকে আমরা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। কারণ সাধারণ মানুষ মূলত এই পদ্ধতির মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও এটি কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়তা করে, প্রকল্প গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং যে সব ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমান প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না সে সব ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্ যুক্তিবিদ মনে করেন যে, অবৈজ্ঞানিক আরোহের কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই?
(ক) আলেকজান্ডার বেইন (খ) যুক্তিবিদ ফ্রান্সিস বেকন
(গ) যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (ঘ) জন স্টুয়ার্ট মিল

২। অবৈজ্ঞানিক আরোহে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তটি—
(ক) নিশ্চিত হয় (খ) সম্ভাব্য হয়
(গ) অসম্ভাব্য হয় (ঘ) অনিশ্চিত হয়

৩। অবৈজ্ঞানিক আরোহ—
(i) কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়তা করে
(ii) কার্য-কারণ নীতি অনুসরণ করে
(iii) প্রকল্প গঠনে ভূমিকা পালন করে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৬ বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক (Relation between Scientific Induction and Unscientific Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক (Relation between Scientific Induction and Unscientific Induction)

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয়ই প্রকৃত আরোহ। আরোহ অনুমানের যে প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। পক্ষান্তরে, যে আরোহ অনুমানে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও অবাধ বা বিরোধহীন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। আমরা জানি যে, দু'টি বিষয়ের সম্পর্ক বলতে উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে নির্দেশ করে। তাই বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এ পাঠে উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা নিয়ে আলোচনা করা হলো :

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্যসমূহ
(Similarities between Scientific Induction and Unscientific Induction)

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হলো—

১। বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয় আরোহই ঘটনার পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক। কেননা উভয় আরোহের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বাস্তব ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

২। উভয় আরোহের লক্ষ্য হলো সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা।

৩। বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক উভয় আরোহেই আরোহাত্মক উল্লম্ফন উপস্থিত থাকে। কারণ উভয় আরোহেই জানা থেকে অজানায়, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিতে এবং বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়া হয়। আর এ কারণেই উভয় আরোহই প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত।

৪। উভয় আরোহেই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক জানা থেকে অজানায়, নিরীক্ষিত থেকে অনিরীক্ষিতে এবং বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়া হয়। অর্থাৎ উভয় আরোহই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈসাদৃশ্যসমূহ
(Dissimilarities between Scientific Induction and Unscientific Induction)

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ—

১। বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। বৈজ্ঞানিক আরোহে যেকোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে এ পদ্ধতিতে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো অপনয়ন করা যায়। অন্যদিকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ কেবলমাত্র অবাধ অভিজ্ঞতা বা প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এতে কোনো কিছু অপনয়ন করার সুযোগ থাকে না।

৩। বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয়।

৪। বৈজ্ঞানিক আরোহে সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। পক্ষান্তরে, অবৈজ্ঞানিক আরোহে শুধুমাত্র সদর্থক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫। বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর সিদ্ধান্ত কোনো বিরোধী দৃষ্টান্ত দ্বারা বাতিল হয় না। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ শুধুমাত্র অবাধ বা বাধাহীন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর সিদ্ধান্ত যেকোনো বিরোধী দৃষ্টান্ত দ্বারা বাতিল হয়।

৬। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া। কারণ সকল বৈজ্ঞানিক সত্য এই আরোহের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোনো অপরিহার্য প্রক্রিয়া নয়। কারণ এ আরোহ প্রক্রিয়াটি কেবলমাত্র প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা করে থাকে।

৭। বৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন, অপনয়ন ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করতে হয়। পক্ষান্তরে, অবৈজ্ঞানিক আরোহে এসব স্তর অতিক্রম করতে হয় না।

৮। বৈজ্ঞানিক আরোহে দৃষ্টান্তের সংখ্যার চেয়ে দৃষ্টান্তের গুণগত মানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহে দৃষ্টান্তের গুণগত মানের চেয়ে দৃষ্টান্তের সংখ্যার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৯। বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে। অন্যদিকে, অবৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে এর তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই।

১০। বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় বলে বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি জটিল পদ্ধতি। পক্ষান্তরে, কেবল অবাধ অভিজ্ঞতা নির্ভর বলে অবৈজ্ঞানিক আরোহ একটি সহজ-সরল পদ্ধতি।

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা
(Mutual Dependence of Scientific Induction and Unscientific Induction)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে একদিকে যেমন সাদৃশ্য আছে, আবার অন্যদিকে বৈসাদৃশ্যও আছে। আর এই সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যই উভয়ের পারস্পারিক নির্ভরশীলতা নির্দেশ করে। তাছাড়া অবৈজ্ঞানিক আরোহ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তকে বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, অবৈজ্ঞানিক আরোহ হচ্ছে বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাথমিক স্তর। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক আরোহ হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক আরোহের পরিণত স্তর।

শিক্ষার্থীর কাজ : বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। ঘটনার পর্যবেক্ষণ, সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা, আরোহাত্মক উল্লম্ফনের উপস্থিতি এবং প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভরতার দিক থেকে উভয় আরোহের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আবার কার্য-কারণ নিয়ম, বৈজ্ঞানিক মূল্য ও সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তার দিক থেকে উভয় আরোহের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোন্ প্রকার আরোহে দৃষ্টান্তের সংখ্যার চেয়ে দৃষ্টান্তের গুণগত মানের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়?
(ক) অবৈজ্ঞানিক আরোহে (খ) বৈজ্ঞানিক আরোহে
(গ) সাদৃশ্যানুমানে (ঘ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে

২। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোন্‌টি অপরিহার্য প্রক্রিয়া?
(ক) বৈজ্ঞানিক আরোহ (খ) অবৈজ্ঞানিক আরোহ
(গ) সাদৃশ্যানুমান (ঘ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ

৩। বৈজ্ঞানিক আরোহ ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্যের ক্ষেত্রগুলো হলো—
(i) ঘটনার পর্যবেক্ষণ (ii) সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা
(iii) আরোহাত্মক উল্লম্ফনের উপস্থিতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৭ সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ (Definition, Characteristics and Classification of Analogical Argument)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- এর শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- এর বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা (Definition of Analogical Argument)

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) কর্তৃক বিভাজিত প্রকৃত আরোহের সর্বশেষ বা তৃতীয় রূপটি হলো সাদৃশ্যানুমান। বিভিন্ন যুক্তিবিদ বিভিন্নভাবে সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলো তাৎপর্যগত দিক থেকে অভিন্ন হলেও প্রাসঙ্গিক কিছু ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞায় জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন, " যদি দু'টি বস্তুর মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে মিল থাকে এবং কোনো বাক্য যদি তাদের একটি সম্পর্কে সত্য হয়ে থাকে, তাহলে সেই বাক্যটি অপরটি সম্পর্কেও সত্য হবে। "("Two things resemble each other in one or more respects, a certain proposition is true of the one; therefore, it is true of the other." *1889,* P-365)

যুক্তিবিদ আলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic- Induction* গ্রন্থে বলেন, " আরোহ অনুমানের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে সাদৃশ্যানুমানে মনে করা হয় যে, দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলে, তাদের মধ্যে অপর কোনো বিষয়েও সাদৃশ্য থাকতে পারে, যে অপর বিষয়টি সাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলোর সাথে কার্য-কারণ কিংবা সহ-অবস্থান জনিত সম্পর্কে আবদ্ধ বলে জানা নেই।"(*1870,* p-143)

আবার যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (Carveth Read) তাঁর *Inductive Logic* বইয়ে সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "সাদৃশ্যানুমান এক প্রকারের সম্ভাব্য প্রমাণ যা উপমানের মাল মশলা ও অনুমানের বিষয়বস্তুর মধ্যস্থিত অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভরশীল।"("Analogy is a kind of probable proof based on imperfect similarity between the idea of comparison and the subject of inference." *1898,* P-240)

বিভিন্ন যুক্তিবিদের প্রদত্ত উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞায় বলা যায়, দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যদি অনুমান করা হয় যে, তাদের একটি কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হলে অপরটিও ঐ গুণের অধিকারী হবে,তাহলে যে অনুমান করা হয় তাকে সাদৃশ্যানুমান বলে।

সাদৃশ্যানুমানের উদাহরণ ঃ

(a) বাস্তব উদাহরণ : পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহেও জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে।
পৃথিবীতে প্রাণী বসবাস করে।
অতএব, মঙ্গল গ্রহেও প্রাণীর বসবাস আছে।

এ অনুমান প্রক্রিয়াটি সাদৃশ্যানুমানের একটি বাস্তব উদাহরণ। কারণ এক্ষেত্রে প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য কতিপয় মৌলিক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে।

(b) সাংকেতিক উদাহরণ : P ও Q নামক দু'টি বস্তুর মধ্যে r, s, t নামক বিষয়ে মিল আছে।
পরবর্তীতে P নামক বস্তুটির মধ্যে u নামক গুণের সন্ধান পাওয়া গেল।
অতএব, u নামক গুণটি Q নামক বস্তুর মধ্যেও আছে।
এ অনুমান প্রক্রিয়াটিও সাদৃশ্যানুমানের একটি উদাহরণ। কারণ এক্ষেত্রে P ও Q নামক দু'টি বস্তুর মধ্যে r, s, t নামক বিষয়ে মিল সাদৃশ্য দেখে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে।

সাদৃশ্যানুমানের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Analogical Argument)

সাদৃশ্যানুমানের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ :

১। **সাদৃশ্যভিত্তিক অনুমান :** সাদৃশ্যানুমানে দু'টি বিষয়ে জানা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য অনুমান করা হয়। যেমন— প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জন্ম, খাদ্য গ্রহণ, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা হয় যে, প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। তাই বলা যায় যে, সাদৃশ্যানুমান হলো একটি সাদৃশ্যভিত্তিক অনুমান।

২। **এর সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য :** সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য। আমরা জানি যে, সংশ্লেষক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে নতুন তথ্য প্রদান করে এবং তার সত্যতা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যেই যাচাই করা যায়। যেমন- পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহেও প্রাণীর বসবাস আছে। এর অর্থ হলো মঙ্গল গ্রহ এমন যেখানে প্রাণীর বসবাস আছে। এ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ হলো 'মঙ্গল গ্রহ' এবং বিধেয় পদ হলো 'এমন যেখানে প্রাণীর বসবাস আছে'। 'প্রাণীর বসবাস' মঙ্গল গ্রহের জাত্যর্থ নয়, বরং জাত্যর্থের অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য। তাই এ যুক্তিবাক্যের সত্যতা কেবল উদ্দেশ্য পদের জাত্যর্থ বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করা যায় না, বরং এর সত্যতা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার সাহায্যেই যাচাই করতে হয়। আর এ কারণেই সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য।

৩। **সাদৃশ্যানুমানে আরোহমূলক লম্ফ বিদ্যমান :** সাদৃশ্যানুমানে দু'টি বিষয়ে জানা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোনো অজানা বিষয়ে সাদৃশ্য অনুমান করা হয়। এভাবে কিছু জানা সাদৃশ্যকে ভিত্তি করে অজানা সাদৃশ্যে পদার্পণের প্রক্রিয়াকে আরোহমূলক লম্ফ বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap) বলে। যেমন— প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জন্ম, খাদ্য গ্রহণ, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা হয় যে, প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এক্ষেত্রে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যকার জানা সাদৃশ্যগুলো হলো জন্ম, খাদ্য গ্রহণ, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি। এ জানা সাদৃশ্যগুলো দেখে অনুমান করা হলো যে, প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যকার জানা সাদৃশ্যগুলো পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে অজানা সাদৃশ্য অনুমান করার এ প্রক্রিয়াটিই হলো আরোহমূলক লম্ফ বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap)। সুতরাং সাদৃশ্যানুমানে আরোহমূলক লম্ফ বিদ্যমান।

৪। **সাদৃশ্যানুমান প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত :** প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির অর্থ হলো- প্রকৃতি সব সময়ই একই অবস্থায় একই নিয়মে কাজ করে। প্রকৃতিতে এ নিয়মের কোনো ব্যাত্যয় ঘটে না। আমরা জানি সাদৃশ্যানুমানে দু'টি বিষয়ে জানা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোনো অজানা বিষয়ে সাদৃশ্য অনুমান করা হয়। আর যে নীতির ভিত্তিতে এ ধরনের জানা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোনো অজানা বিষয়ে সাদৃশ্য অনুমান করা হয় তাহলো প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি (Law of Uniformity of Nature)। কারণ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি অনুসারে প্রকৃতিতে অভিন্ন অবস্থায় অভিন্ন ঘটনা ঘটে। তাই দু'টি বিষয় বা শ্রেণীর কতিপয় বৈশিষ্ট্য অভিন্ন হলে অবশিষ্ট বৈশিষ্ট্যও অভিন্ন হবে। অতএব প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির ভিত্তিতে সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত অনুমান করা সম্ভব।

৫। **সাদৃশ্যানুমানে বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় :** সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কতিপয় বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এদের একটির ভিত্তিতে অপরটির নতুন সাদৃশ্য বা নতুন বৈশিষ্ট্য অনুমান করা হয়। অর্থাৎ আমরা সাদৃশ্যানুমানের সাহায্যে একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা থেকে অপর একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনায় গমন করি।

৬। **সাদৃশ্যানুমান কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় :** সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়ের সাথে অনুমিত বিষয়ের কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে কিনা তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় না। এক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কতিপয় বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এদের মধ্যে নতুন সাদৃশ্য অনুমান করা হয়। সুতরাং সাদৃশ্যানুমান কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

৭। **সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয় :** সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত অনুমানের সময় কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি অনুসরণ না করে কেবলমাত্র কতিপয় সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করা হয়। এজন্য এর সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়।

৮। **সাদৃশ্যানুমান বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাথমিক স্তর :** বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য সাদৃশ্যানুমান থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তটিকে বৈজ্ঞানিক আরোহ প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। এ কারণে সাদৃশ্যানুমানকে বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাথমিক স্তর বা সোপান বলা হয়।

পরিশেষে সাদৃশ্যমূলক অনুমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) এটিকে প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত করলেও এতে আরোহ অনুমানের মূল বৈশিষ্ট্য বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়ার সুযোগ নেই। তাই এটিকে প্রকৃত আরোহের একটি দুর্বল রূপ বলা হয়ে থাকে।

সাদৃশ্যানুমানের শ্রেণিবিভাগ
(Classification of Analogical Argument)

আমরা জানি যে, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়ে থাকে। সম্ভাব্যতার মাত্রাভেদে সাদৃশ্যানুমান যথার্থ হতে পারে, আবার ভ্রান্তও হতে পারে। মুলত এ দৃষ্টিকোণ থেকেই যুক্তিবিদগণ সাদৃশ্যানুমানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা

(ক) সাধু সাদৃশ্যানুমান (Good Analogy) ও
(খ) অসাধু সাদৃশ্যানুমান (Bad Analogy)

(ক) সাধু সাদৃশ্যানুমান (Good Analogy) : যে সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক, অন্তর্নিহিত তাৎপর্যপূর্ণ ও অধিক সংখ্যক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় তাকে সাধু সাদৃশ্যানুমান (Good Analogy) বলে। সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা থাকে। এ জাতীয় অনুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা ও গুরুত্ব বেশি থাকে এবং বৈশাদৃশ্য ও অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা কম থাকে। যেমন-

মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশবিস্তার, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।
মানুষের প্রাণ আছে।
∴ উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে।

এ যুক্তিটিতে মানুষ ও উদ্ভিদের মধ্যে জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু, বংশবিস্তার, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। আর দেখানো এ সাদৃশ্যসমূহের সাথে প্রাণের অস্তিত্বের একটি কার্য-কারণ সম্পর্কও আছে। তাই এটি একটি যথার্থ সাধু সাদৃশ্যানুমান।

সাধু সাদৃশ্যানুমানের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১। দু'টি গাছের মধ্যে কান্ড, শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল, আকার-আকৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সুতরাং গাছ দু'টিতে একই রকম ফল ধরবে।

২। মানুষের ও অন্যান্য জীবজন্তুর দৈহিক গঠন, স্নায়ুতন্ত্র, ফুসফুস ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের অনুভূতি শক্তি রয়েছে। অতএব, অন্যান্য জীবজন্তুরও অনুভূতি শক্তি রয়েছে।

৩। মানুষের মতো মাছেরও মেরুদন্ড, মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড ও মাথা আছে। মানষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি আছে। অতএব, মাছেরও ইন্দ্রিয়ানুভূতি আছে।

(খ) অসাধু সাদৃশ্যানুমান (Bad Analogy) : যে সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে অমৌলিক, গুরুত্বহীন, অপ্রাসঙ্গিক, অন্তর্নিহিত তাৎপর্যহীন ও অল্প সংখ্যক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় তাকে অসাধু সাদৃশ্যানুমান (Bad Analogy) বলে। অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বলে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সাথে অনুমিত বিষয়ের কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা থাকে না। এ জাতীয় অনুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা ও গুরুত্ব কম থাকে এবং বৈশাদৃশ্য ও অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা বেশি থাকে। যেমন-

সামিয়া ও রাশেদা দুই বন্ধু। তারা দুজনেই ফর্সা, লম্বা, স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর পোশাক পরিধান করে।
সামিয়া বুদ্ধিমতী
∴ রাশেদাও বুদ্ধিমতী।

এ যুক্তিটিতে দেখানো হয়েছে যে, সামিয়া ও রাশেদা দুজনেই ফর্সা, লম্বা, স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর পোশাক পরিধান করে। অর্থাৎ তাদের দু'জনের মধ্যে কতিপয় বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। আর এ থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, তারা দু'জনেই বুদ্ধিমতী। কিন্তু আসলে এ সাদৃশ্যসমূহের সাথে বুদ্ধিমতী হওয়ার কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। তাছাড়া এ দৃষ্টান্তটিতে দেখানো সাদৃশ্যগুলো অমৌলিক, গুরুত্বহীন, অপ্রাসঙ্গিক ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যহীন। তাই এটি একটি অসাধু সাদৃশ্যানুমান। অসাধু সাদৃশ্যানুমানের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১। মামুন দেখতে অসীমের মতো। তারা দু'জনে একই গ্রামে থাকে এবং ভালো ক্রিকেটার। মামুন এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছে। অতএব অসীমও এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পাবে।

২। মানুষের ও অন্যান্য জীবজন্তুর দৈহিক গঠন, স্নায়ুতন্ত্র, ফুসফুস ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। মানুষের বিচারক্ষমতা রয়েছে। অতএব, অন্যান্য জীবজন্তুরও বিচারক্ষমতা রয়েছে।

৩। হাবিব ও অশ্রু দুই বন্ধু। তারা দুজনেই ফর্সা, লম্বা, স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর পোশাক পরিধান করে। হাবিব একজন নামকরা কবি। অতএব অশ্রুও একজন নামকরা কবি।

শিক্ষার্থীর কাজ : সাদৃশ্যানুমানের বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যদি অনুমান করা হয় যে, তাদের একটি কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হলে অপরটিও ঐ গুণের অধিকারী হবে, তাহলে যে অনুমান করা হয় তাকে সাদৃশ্যানুমান বলে। এ অনুমানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- এটি একটি সাদৃশ্যভিত্তিক অনুমান, এর সিদ্ধান্ত একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য, এতে আরোহমূলক লক্ষ বিদ্যমান, এটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত ,এতে বিশিষ্ট থেকে বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়, এর সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয় এবং এটি বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাথমিক স্তর হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। "দু'টি বস্তুর মধ্যে এক বা একাধিক বিষয়ে মিল আছে, কোনো বাক্য যদি তাদের একটি সম্পর্কে সত্য হয়, তাহলে সেই বাক্যটি অপরটি সম্পর্কেও সত্য হবে।"- সাদৃশ্যানুমানের এ সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন-

(ক) জে. এস. মিল (খ) বেইন

(গ) হিওয়েল (ঘ) কার্ভেথ রীড

২। 'পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহেও জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদির অস্তিত্ব আছে।

পৃথিবীতে প্রাণী বসবাস করে।

অতএব, মঙ্গল গ্রহেও প্রাণীর বসবাস আছে' এটি একটি-

(ক) সহানুমান (খ) প্রাকল্পিক অনুমান

(গ) সাধু সাদৃশ্যানুমান (ঘ) অসাধু সাদৃশ্যানুমান

৩। অমৌলিক, গুরুত্বহীন, অপ্রাসঙ্গিক ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্যহীন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলে তা -

(i) সাদৃশ্যানুমান (ii) সাধু সাদৃশ্যানুমান

(iii) অসাধু সাদৃশ্যানুমান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

পাঠ-৩.৮ সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Good and Bad Analogy)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- সাধু ও অসাধু অনুমানের মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য তা নির্ণয় করতে পারবেন।

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Good and Bad Analogy)

যে সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক, অন্তর্নিহিত তাৎপর্যপূর্ণ ও অধিক সংখ্যক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় তাকে সাধু সাদৃশ্যানুমান (Good Analogy) বলে। যেমন-দু'টি গাছের মধ্যে কান্ড, শাখা, পাতা, ফুল ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সুতরাং গাছ দু'টির ফলও একই রকম হবে। অন্যদিকে, যে সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে অমৌলিক, গুরুত্বহীন, অপ্রাসঙ্গিক, অন্তর্নিহিত তাৎপর্যহীন ও অল্প সংখ্যক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমিত হয় তাকে অসাধু সাদৃশ্যানুমান (Bad Analogy) বলে। যেমন- আয়েশা ও মায়েশা দুই বান্ধবী। তারা দুজনেই ফর্সা, তাদের চুল লম্বা ও কালো এবং তারা দেখতে খুবই সুন্দরী। আয়েশা একজন বিখ্যাত গায়িকা। অতএব মায়েশাও একজন বিখ্যাত গায়িকা। আলোচ্য দৃষ্টান্তে যেসকল সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে সেগুলো গায়িকা হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। তাই এটি একটি অসাধু সাদৃশ্যানুমান। সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের এ সংজ্ঞাগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা যায়-

১। সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। পক্ষান্তরে, অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিতান্তই অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক।

২। সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে এতে সাধারণত কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে। পক্ষান্তরে, অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে এতে সাধারণত কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না।

৩। সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সংখ্যায় বেশি বলে এর মূল্য ও গুরুত্বও বেশি। কিন্তু অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের তুলনায় বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলো সংখ্যায় বেশি বলে এর মূল্য ও গুরুত্ব কম।

৪। সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বলে এতে সাধারণত কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে। পক্ষান্তরে, অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বলে এতে সাধারণত কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না।

৫। সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাধারণত কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে বলে এর সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অন্যদিকে, অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাধারণত কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না বলে এর সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম।

৬। সাধু সাদৃশ্যানুমান প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এ অনুমান জ্ঞান চর্চার পক্ষে সহায়ক। কিন্তু অসাধু সাদৃশ্যানুমান প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর না করে ব্যক্তিগত বিশ্বাস, সামাজিক কুসংস্কার ও কাল্পনিক ধারণার উপর নির্ভর করে বলে এ অনুমান জ্ঞান চর্চার পক্ষে সহায়ক নয়।

৭। সাধু সাদৃশ্যানুমান বিজ্ঞানসম্মত বলে এটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ভূমিকা রাখে এবং বাস্তব সত্য আবিষ্কারে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে, অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয় বলে এতে বাস্তব সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

৮। সাধু সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্তে আরোপিত গুণের পরিমাণ আশ্রয়বাক্যের তুলনায় অধিক হয় না। পক্ষান্তরে, অসাধু সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্তে আরোপিত গুণের পরিমাণ আশ্রয়বাক্যের তুলনায় অধিক হয়।

৯। সাধু সাদৃশ্যানুমান একটি বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, অসাধু সাদৃশ্যানুমান একটি অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত প্রক্রিয়া।

সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে উপর্যুক্ত পার্থক্য থাকলেও উভয় অনুমানই সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই এদের সিদ্ধান্ত অনুমান করে থাকে। তাই এদের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য থাকলেও বাহ্যিক স্বরূপ একই প্রকৃতির।

শিক্ষার্থীর কাজ : সাধু ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের পার্থক্যগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সাধু সাদৃশ্যানুমান ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের মধ্যকার মূল পার্থক্যের বিষয়সমূহ হলো- সাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো প্রাসঙ্গিক, এতে কার্য-কারণ সম্পর্ক বিদ্যমান, এর মূল্য ও গুরুত্বও বেশি, এর সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ভূমিকা রাখে। পক্ষান্তরে, অসাধু সাদৃশ্যানুমানে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো অপ্রাসঙ্গিক, এতে সাধারণত কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না, এর মূল্য ও গুরুত্ব খুবই কম, এর সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, এটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না। সুতরাং উভয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোন্ প্রকারের অনুমানে সাধারণত কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে না?
(ক) সাধু সাদৃশ্যানুমানে (খ) অসাধু সাদৃশ্যানুমানে
(গ) প্রকৃত আরোহ অনুমানে (ঘ) বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানে

২। নিচের কোন্টি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে ভূমিকা রাখে ?
(ক) সাধু সাদৃশ্যানুমান (খ) অসাধু সাদৃশ্যানুমান
(গ) অপ্রকৃত আরোহ অনুমান (ঘ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ

৩। সাধু সাদৃশ্যানুমান ও অসাধু সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়গুলো হলো-
(i) উভয় অনুমানই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করে
(ii) উভয় অনুমানেই কার্য-কারণ সম্পর্ক বিদ্যমান
(iii) এদের মধ্যে তাৎপর্যগত পার্থক্য রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

পাঠ-৩.৯ সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ (Analogy and Scientific Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ (Analogy and Scientific Induction)

দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যদি অনুমান করা হয় যে, তাদের একটি কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হলে অপরটিও ঐ গুণের অধিকারী হবে,তাহলে যে অনুমান করা হয় তাকে সাদৃশ্যানুমান বলে। যেমন- প্রাণী ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জন্ম, খাদ্য গ্রহণ, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে অনুমান করা হয় যে, প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এক্ষেত্রে প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যকার জানা সাদৃশ্যগুলো হলো জন্ম, খাদ্য গ্রহণ, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি। এ জানা সাদৃশ্যগুলো দেখে অনুমান করা হলো যে, প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। সুতরাং এটি সাদৃশ্যানুমানের একটি দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে, আরোহ অনুমানের যে প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। যেমন-রাইসা হয় মরণশীল, হামিদা হয় মরণশীল, যায়েদ হয় মরণশীল, রাজিব হয় মরণশীল। অতএব সকল মানুষ হয় মরণশীল। আলোচ্য দৃষ্টান্তে রাইসা, হামিদা, যায়েদ, রাজিব প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে মানুষ ও মরণশীলতার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার পূর্বক প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভর করে সব মানুষের মরণশীলতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং এটি বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি যথার্থ দৃষ্টান্ত। সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের এ সংজ্ঞা ও উদাহরণ থেকে উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়-

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ (Similarities between Analogy and Scientific Induction)

১। সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানই প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত।

২। সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য আরোহাত্মক উল্লম্ফন রয়েছে।

৩। উভয় আরোহই বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক। কারণ বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে গিয়ে যেমন কতিপয় বাস্তব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত স্থাপনের সময়ও দু'টি বিষয়ের মধ্যকার সাদৃশ্য বাস্তবেই পর্যবেক্ষণ করা হয়।

৪। সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত সত্য নির্ণয় করা।

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যসমূহ (Differences between Analogy and Scientific Induction)

১। সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে কতিপয় বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এদের একটির ভিত্তিতে অপরটির নতুন সাদৃশ্য বা নতুন বৈশিষ্ট্য অনুমান করা হয়। অর্থাৎ আমরা সাদৃশ্যানুমানের সাহায্যে একটি বিশেষ

বস্তু বা ঘটনা থেকে অপর একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনায় গমন করি। কিন্তু, বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয়।

২। সাদৃশ্যানুমান কেবল প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহ দু'টি মৌলিক নিয়ম, যথা- প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি এবং কার্য-কারণ নিয়ম নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩। সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত অনুমানের সময় কার্য-কারণ নিয়ম অনুসরণ না করে কেবলমাত্র কতিপয় সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করা হয় বলে এর সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আরোহে অনির্দিষ্ট সংখ্যক বিষয় সম্বলিত একটি শ্রেণির অন্তর্গত কিছু অনুকূল ও প্রতিকূল দৃষ্টান্ত সম্পর্কে বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান বা বস্তুগত সত্য প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে এর সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয়।

৪। কেবল দু'টি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় বলে সাদৃশ্যমূলক অনুমান একটি সহজ-সরল পদ্ধতি। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে সিদ্ধান্ত অনুমান করতে হয় বলে এটি একটি জটিল পদ্ধতি।

৫। দু'টি বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় বলে সাদৃশ্যমূলক অনুমানে অসাধু সাদৃশ্যমূলক অনুপপত্তি ঘটে। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় এবং সাধারণত কোনো প্রকার অনুপপত্তি ঘটে না।

৬। সাদৃশ্যানুমান বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাথমিক স্তর। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক আরোহ সাদৃশ্যানুমানের পরিণত স্তর।

৭। সাদৃশ্যানুমানে আরোহের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নয়। তাই প্রকৃত আরোহ হিসেবে এর যথার্থতা প্রশ্নসাপেক্ষ। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহের সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। তাই এটি প্রকৃত আরোহ।

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থেকে সহজেই অনুমেয় যে, উভয় আরোহই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ : সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানই প্রকৃত আরোহের দু'টি রূপ। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। উভয় অনুমানে আরোহাত্মক উল্লম্ফন রয়েছে, বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক এবং উভয়ের মূল উদ্দেশ্য বস্তুগত সত্য নির্ণয় করা। আবার, সাদৃশ্যানুমানে বিশেষ থেকে বিশেষে গমন করা হয়, এটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এর সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়, এটি সহজ-সরল পদ্ধতি এবং এতে অনুপপত্তি ঘটে। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয়, এটি প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এর সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয়, এটি একটি জটিল পদ্ধতি এবং এতে অনুপপত্তি ঘটে না। তবে সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয় আরোহই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টিতে প্রকৃত অর্থে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয়?
(ক) সাদৃশ্যানুমানে (খ) বৈজ্ঞানিক আরোহে
(গ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে (ঘ) পূর্ণাঙ্গ আরোহে

২। নিচের কোন্‌টি সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে সত্য নয়?
(ক) সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য (খ) সহজ-সরল পদ্ধতি
(গ) অনুপপত্তি ঘটে (ঘ) কার্য-কারণ সম্পর্ক

৩। সাদৃশ্যানুমান ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানই প্রকৃত আরোহের দু'টি রূপ। উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। উভয় অনুমান–
(i) প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত (ii) বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক
(iii) মূল উদ্দেশ্য বস্তুগত সত্য নির্ণয় করা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১০ সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ (Analogy and Unscientific Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে সাদৃশ্যগুলো জানতে পারবেন।

সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ (Analogy and Unscientific Induction)

আমরা জানি, দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যদি অনুমান করা হয় যে, তাদের একটি কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হলে অপরটিও ঐ গুণের অধিকারী হবে, তাহলে যে অনুমান করা হয় তাকে সাদৃশ্যানুমান বলে। পক্ষান্তরে, যে আরোহ অনুমানে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও অবাধ বা বিরোধহীন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে অবৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। সুতরাং সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ একই প্রকৃতির নয়। তবে ভিন্ন প্রকৃতির হলেও উভয়ের মাঝে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদৃশ্যও রয়েছে।

সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ (Similarities between Analogy and Unscientific Induction)

১। সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানই প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত।
২। সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানে আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য আরোহাত্মক উল্লম্ফন রয়েছে।
৩। উভয় আরোহই বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক। কারণ অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করতে গিয়ে যেমন কতিপয় বাস্তব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়, সদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত স্থাপনের সময়ও দু'টি বিষয়ের মধ্যকার সাদৃশ্য বাস্তবেই পর্যবেক্ষণ করা হয়।
৪। সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত সত্য নির্ণয় করা।
৫। উভয় অনুমানেই কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অনুপস্থিত।
৬। সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানের সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয়ে থাকে।
৭। সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাহায্যে অনুমান করে বলে উভয়টিই লৌকিক আরোহ।
৮। উভয় অনুমানই বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা করে।
৯। উভয় অনুমানই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
১০। সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানেই অনুপপত্তি ঘটে থাকে।
১১। সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানেই আরোহের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নয়। তাই প্রকৃত আরোহ হিসেবে এদের উভয়ের যথার্থতা প্রশ্নসাপেক্ষ।

সাদৃশ্যানুমান অবৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যসমূহ (Differences between Analogy and Unscientific Induction)

১। সাদৃশ্যানুমানের সাহায্যে একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা থেকে অপর একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনায় গমন করা হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয়।

২। সাদৃশ্যানুমানে বিশেষ থেকে বিশেষে গমন করা হয় বলে এতে আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই। পক্ষান্তরে, কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় যাওয়া হয় বলে অবৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান।

৩। সাদৃশ্যানুমানে দু'টি বিষয়ে জানা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোনো বিষয়ে সাদৃশ্য অনুমান করা হয় বলে অসম্পূর্ণ সাদৃশ্যই সাদৃশ্যানুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল ভিত্তি। অন্যদিকে, অনুকূল ও অবাধ অভিজ্ঞতা অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল ভিত্তি।

৪। সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নির্ভর করে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহের মূল্য নির্ভর করে দৃষ্টান্তের সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর।

৫। সাদৃশ্যানুমানে সাধারণত দু'টি বস্তুর গুণের বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহে বিশ্লেষণের কোনো সুযোগ নেই।

৬। সাদৃশ্যানুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সাধারণত কোনো পরম নিয়ম বা পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করা হয় না। অপরপক্ষে, অবৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সাধারণত প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি নামক পরম নিয়ম বা পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করা হয়।

৭। সাদৃশ্যানুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অনেক সময় অসাধু সাদৃশ্যানুমান নামক অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আর অবৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অবৈধ সার্বিকীকরণ নামক অনুপপত্তি ঘটে থাকে।

৮। সাদৃশ্যানুমানের সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের জন্য একটি গাণিতিক সূত্র রয়েছে। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহে এ জাতীয় কোনো সূত্র নেই।

৯। সাদৃশ্যানুমানে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা না হলেও এতে এ সম্পর্কের ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহে কার্য-কারণ সম্পর্কের কোনো ইঙ্গিত থাকে না।

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায় যে, সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ একই প্রকৃতির না হলেও উভয় অনুমানই প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত, উভয় অনুমানের মূল উদ্দেশ্য হলো বস্তুগত সত্য নির্ণয় করা এবং উভয় অনুমানই বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা করে। তাই এদের পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ : সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্যসমূহের একটি তালিকা করুন।

সারসংক্ষেপ

সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ একই প্রকৃতির না হলেও উভয়ের মাঝে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। এদের মধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো হলো- উভয় অনুমানই প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত, বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক, বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা করে এবং উভয় অনুমানে আরোহাত্মক উল্লম্ফন রয়েছে। আবার সাদৃশ্যানুমানে বিশেষ থেকে বিশেষে গমন করা হয়, অসাধু সাদৃশ্যানুমান নামক অনুপপত্তি ঘটে এবং এর একটি গাণিতিক সূত্র রয়েছে। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক আরোহে বিশেষ থেকে সার্বিকে গমন করা হয়, অবৈধ সার্বিকীকরণ নামক অনুপপত্তি ঘটে থাকে এবং এর কোনো গাণিতিক সূত্র নেই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানেই প্রযোজ্য?
(ক) প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত (খ) কার্য-কারণ সম্পর্কের ইঙ্গিত
(গ) অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি (ঘ) গাণিতিক সূত্র

২। নিচের কোন্‌টি সাদৃশ্যানুমান ও অবৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় অনুমানেই প্রযোজ্য নয়?
(ক) প্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত (খ) বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক
(গ) অসাধু সাদৃশ্যানুমান অনুপপত্তি (ঘ) প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা

৩। সাদৃশ্যানুমানের মূল্য নির্ভর করে সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর -
(i) সংখ্যার উপর (ii) প্রকৃতির উপর
(iii) দৃষ্টান্তের উপর

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১১ সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব (Value and Importance of Analogy)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব নির্ধারণের উপায়সমূহ জানতে পারবেন।

সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব (Value and Importance of Analogy)

সাদৃশ্যানুমানে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের ও প্রমাণের চেষ্টা করা হয় না বলে এর সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়ে থাকে। আর এ কারণেই সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব এর সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রার উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদগণ সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে সব কৌশল অবলম্বনের কথা বলেছেন সেগুলো নিম্নরূপ :

১। সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের সংখ্যা যত বেশি হবে, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে : এ শর্তানুযায়ী দু'টি বিষয় বা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের সংখ্যা যত বেশি হবে, উক্ত দু'টি বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বেশি হবে। যেমন- বুধ গ্রহের সাথে পৃথিবীর যে কয়টি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তার সংখ্যার তুলনায় মঙ্গল গ্রহের সাথে পৃথিবীর যে কয়টি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তার সংখ্যা বেশি। তাই 'বুধ গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তের তুলনায় 'মঙ্গল গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তটি বেশি সম্ভাব্য।

২। সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের গুরুত্ব যত বেশি হবে, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে : সাদৃশ্যানুমানের সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের এ সূত্র অনুসারে দু'টি বিষয় বা বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের গুরুত্ব যত বেশি হবে, উক্ত দু'টি বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বেশি হবে। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ ওয়েল্টন (Welton) তাঁর *A Manual of Logic* গ্রন্থে বলেন, "সাদৃশ্যানুমানে একটি যুক্তির গুরুত্ব নির্ভর করে অভিন্নতার প্রকৃতির উপর, সাদৃশ্যের পরিমাণের উপর নয়"("The force of an argument from analogy depends on the character of identity and not on the amount of similarity.")। যেমন- শুক্র গ্রহের সাথে পৃথিবীর যে কয়টি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তার গুরুত্বের তুলনায় মঙ্গল গ্রহের সাথে পৃথিবীর যে কয়টি বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই 'শুক্র গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তের তুলনায় 'মঙ্গল গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তটি বেশি সম্ভাব্য হবে।

৩। সাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলো যত বেশি প্রাসঙ্গিক হবে, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও তত বেশি হবে : সাদৃশ্যানুমানের প্রকৃতি অনুসারে এটি স্বীকার্য যে, দু'টি বিষয় বা বস্তুর মধ্যকার সাদৃশ্যমূলক বিষয়সমূহ যত বেশি প্রাসঙ্গিক হবে, উক্ত দু'টি বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্তের সম্ভাব্যতার মাত্রাও তত বেশি হবে। যেমন- বৃহস্পতি গ্রহের সাথে পৃথিবীর যে সব বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তার তুলনায় মঙ্গল গ্রহের সাথে পৃথিবীর যে সব বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাই 'শুক্র গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তের তুলনায় 'মঙ্গল গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তটি বেশি সম্ভাব্য।

৪। বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়ের সংখ্যা যত বেশি হবে, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও তত কম হবে : আমরা জানি সাদৃশ্যানুমানে দু'টি বিষয়ে জানা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে নতুন কোনো অজানা বিষয়ে সাদৃশ্য অনুমান করা হয়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, দু'টি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের চেয়ে বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়ের সংখ্যা বেশি তাহলে উক্ত দু'টি বস্তু সম্পর্কে গৃহীত সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। যেমন- মঙ্গল গ্রহের সাথে পৃথিবীর

বৈসাদৃশ্যের সংখ্যার চেয়ে বুধ গ্রহের সাথে পৃথিবীর বৈসাদৃশ্য বেশি। তাই 'মঙ্গল গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তের তুলনায় 'বুধ গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তটি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম।

৫। জ্ঞাত বিষয়ের তুলনায় অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা যত বেশি হবে, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও তত কম হবে : সাদৃশ্যানুমানে যে দু'টি বিষয়ের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় সে বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যদি আলোচ্য বিষয় দু'টি সম্পর্কে খুব কম সংখ্যক বিষয় জ্ঞাত হয়ে এবং বেশির ভাগ বিষয়ে অজ্ঞাত থেকে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় তাহলে গৃহীত সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। যেমন— মঙ্গল গ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের জ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যার চেয়ে বুধ গ্রহ ও পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের জ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা কম এবং অজ্ঞাত বিষয় বেশি। তাই 'মঙ্গল গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তের তুলনায় 'বুধ গ্রহে জীবের বসবাস আছে' এ সিদ্ধান্তটি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাব্যতা নির্ণয়ের এ সূত্রটি আত্মবিরোধী। কারণ অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা নির্ণয় করা কখনো সম্ভব নয়। অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা কম না বেশি তা জানা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, অনেক যুক্তিবিদ সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্রটি অনুসরণ করেন :

সাদৃশ্য ÷ (বৈসাদৃশ্য + অজ্ঞাত বিষয়) = সম্ভাব্যতার মাত্রা

সুতরাং সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব নির্ণয়ের উপরিউক্ত আলোচনা শেষে একথা বলা যায় যে, এ প্রক্রিয়ায় যথার্থ সিদ্ধান্ত অনুমান করতে হলে এক্ষেত্রে অবশ্যই সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর সংখ্যার চেয়ে এদের প্রকৃতির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ সাদৃশ্যের বিষগুলোর সংখ্যা যদি বেশিও হয়, কিন্তু সেগুলো যদি গুরুত্বহীন হয়, তাহলে তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল্য কম হবে। পক্ষান্তরে, সাদৃশ্যের বিষগুলোর সংখ্যা যদি কমও হয় এবং সেগুলো যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মূল্য বেশি হবে। আর সাদৃশ্যানুমানের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি যথাযথ অনুসরণের উপরই নির্ভর করে এর সিদ্ধান্তের যথার্থতা। তবে সাদৃশ্যানুমানের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে এর মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ : সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব নির্ণয়ের সূত্রটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ্যায় আলোচিত সব বিষয়ই কোনো না কোনো প্রেক্ষিতে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রতিনিয়ত বাস্তব জীবনের প্রায় প্রতি পদক্ষেপে সাদৃশ্যানুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করে থাকি। তাই আমাদের দৈন্দিন জীবনে ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সাদৃশ্যানুমানের মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন ।

১। বৈসাদৃশ্যমূলক বিষয়ের সংখ্যা যত বেশি হবে, সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্ত সত্য হওয়ার সম্ভাবনা তত -
(ক) কম হবে (খ) বেশি হবে
(গ) সমান হবে (ঘ) কম বা বেশি হবে

২। সম্ভাব্যতার মাত্রা = ?
(ক) বৈসাদৃশ্য ÷ (সাদৃশ্য + অজ্ঞাত বিষয়) (খ) অজ্ঞাত বিষয় ÷ (বৈসাদৃশ্য + সাদৃশ্য)
(গ) (সাদৃশ্য ÷ বৈসাদৃশ্য)+ অজ্ঞাত বিষয় (ঘ) সাদৃশ্য ÷ (বৈসাদৃশ্য + অজ্ঞাত বিষয়)

৩। সাদৃশ্যানুমানের সিদ্ধান্তের মূল্য বেশি হবে, যদি-
(i) সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের সংখ্যা বেশি হয় (ii) অজ্ঞাত বিষয়ের সংখ্যা বেশি হয়
(iii) সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের গুরুত্ব বেশি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

পাঠ-৩.১২ পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও এর বৈশিষ্ট্য (Perfect Induction and Its Characteristics)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- পূর্ণাঙ্গ আরোহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- পূর্ণাঙ্গ আরোহের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারবেন।

পূর্ণাঙ্গ আরোহ (Perfect Induction)

কোনো তথাকথিত সার্বিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে সেই সার্বিক বাক্যটি স্থাপন করার পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ আরোহ বলে।

পূর্ণাঙ্গ আরোহে সাধারণত কোনো একটি সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি দৃষ্টান্তকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করা হয়। এরপর যদি দেখা যায় যে, কোনো একটি বিষয় এগুলোর প্রত্যেকের বেলায় সত্য, তাহলে অনুমান করা হয় যে উক্ত বিষয়টি সবগুলোর বেলায় সত্য। যেমন— ধরা যাক, একটি ঝুড়িতে ত্রিশটি লিচু আছে। ঝুড়ির মধ্যকার সব কয়টি লিচুর স্বাদ গ্রহণ করা হলো এবং দেখা গেল যে, ঝুড়ির সবগুলো লিচুই মিষ্টি। এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, ' ঝুড়ির সবগুলো লিচুই মিষ্টি'। আর এভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করার প্রক্রিয়াই হলো পূর্ণাঙ্গ আরোহ।

পূর্ণাঙ্গ আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের রীতি অনুসারে যুক্তিবিদগণ এর বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। যেমন— এ পদ্ধতির অনুমানে একটি সার্বিক বাক্যের অন্তর্গত সবগুলো দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে আধুনিক যুক্তিবিদগণ এর নাম দিয়েছেন পূর্ণ গণনামূলক আরোহ (Induction by Complete Enumeration)। সার্বিক বাক্যের অন্তর্গত সবগুলো দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে এ পদ্ধতির অনুমানের সিদ্ধান্তে কোনো প্রকার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তিবিদগণ এর নাম দিয়েছেন নিখুঁত আরোহ (Perfect Induction)।

পূর্ণাঙ্গ আরোহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Perfect Induction)

পূর্ণাঙ্গ আরোহের সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিলক্ষিত হয়-

১। পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্তটিতে নতুন কোনো তথ্য থাকে না বলে এটি একটি বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য।
২। পূর্ণাঙ্গ আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় না।
৩। এ প্রক্রিয়ায় একটি শ্রেণির অন্তর্গত সকল বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে আরোহের মূল ভিত্তি 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' নেই।
৪। পূর্ণাঙ্গ আরোহে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভরশীলতা নেই বললেই চলে।
৫। ব্যাপক ও অনির্দিষ্ট সংখ্যক দৃষ্টান্ত বিশিষ্ট কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আরোহের প্রয়োগ সম্ভব নয়।
৬। এ আরোহে অনুমিত সিদ্ধান্তটি বাহ্যিকভাবে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়।
৭। একটি শ্রেণির অন্তর্গত সকল বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত হয় বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়।
৮। এ শ্রেণির আরোহের সিদ্ধান্তে নতুন কোনো তথ্য থাকে না বলে এটিকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

পূর্ণাঙ্গ আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় কী-না : পূর্ণাঙ্গ আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় কী-না, এ নিয়ে যুক্তিবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যে সব কারণে যুক্তিবিদগণ পূর্ণাঙ্গ আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলা যুক্তিযুক্ত নয় বলে মনে করেন সেগুলো হলো—

১। **আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই :** পূর্ণাঙ্গ আরোহে প্রকৃত আরোহের প্রাণ বা আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই। আরোহ অনুমানে আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়াকে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap) বলে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহে একটি শ্রেণির অন্তর্গত সকল বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে আরোহের মূল ভিত্তি 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' নেই। যুক্তিবিদ মিল (Mill) ও বেইন (Bain)- এর মতে, আরোহমূলক লম্ফই হলো প্রকৃত আরোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁরা মনে করেন, এ বৈশিষ্ট্যটি না থাকলে কোনো অনুমান প্রক্রিয়াকেই প্রকৃত আরোহ বলা যায় না। আর এ কারণেই পূর্ণাঙ্গ আরোহকেও প্রকৃত আরোহ বলে অভিহিত করা যায় না।

২। **সিদ্ধান্ত সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য নয় :** পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য নয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা শুধুমাত্র একটি সার্বিক যুক্তিবাক্যই নয় সংশ্লেষকও বটে। আমরা জানি যে, সংশ্লেষক যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদ সম্বন্ধে নতুন তথ্য প্রদান করে। যেমন-'সকল মানুষ হয় মরণশীল'- এ বাক্যটি একটি সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য। কারণ এর বিধেয় পদ 'মরণশীল' কথাটি মানুষ পদের জাত্যর্থের একটি অতিরিক্ত গুণ। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহে একটি শ্রেণির অন্তর্গত সকল বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে আরোহের মূল ভিত্তি 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' নেই। আর এ কারণেই এতে নতুন কোনো তথ্যের সংযোজন নেই। ফলে এটি প্রকৃত আরোহ নয়।

৩। **সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাক্যটি সার্বিক যুক্তিবাক্য নয় :** পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাক্যটি দেখতে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। এটি মূলত কতিপয় বিশেষ যুক্তিবাক্যের সমষ্টিমাত্র। একটি যথার্থ সার্বিক যুক্তিবাক্যে ব্যাপক সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে কোনো কিছু প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা অল্প সংখ্যক বিশিষ্ট যুক্তিবাক্যের সমষ্টি মাত্র। কেননা একটি ঝুড়ির মধ্যকার ত্রিশটি লিচুর সব কয়টির স্বাদ গ্রহণ করে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, 'ঝুড়ির সবগুলো লিচুই মিষ্টি' তখন কেবলমাত্র ঝুড়িতে থাকা লিচুগুলোর সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত অনুমিত হয়, সব লিচু সম্পর্কে নয়। আর তাই এর সিদ্ধান্তে স্থাপিত যুক্তিবাক্যটি প্রকৃত অর্থে সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ আরোহ প্রকৃত আরোহ নয়।

৪। **ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র :** প্রকৃত আরোহ অনুমানে আরোহাত্মক উল্লম্ফনের কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় যাওয়া হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমরা জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে পদার্পণ করি। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আরোহে একটি শ্রেণির অন্তর্গত সকল বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে এখানে জ্ঞাত থেকে অজ্ঞাতে পদার্পণ করার সুযোগ নেই। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন, "পূর্ণাঙ্গ আরোহ নিছক জ্ঞাত তথ্যের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র।"("Perfect Induction is a mere shorthand registration of facts known." 1889, P-189)। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ আরোহে কোনো প্রকৃত অনুমান নেই বলে একে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

সুতরাং যুক্তিবিদ মিল (Mill) ও বেইন (Bain)- এর মতকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, প্রকৃত আরোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আরোহমূলক লম্ফ নেই বলে একে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

পূর্ণাঙ্গ আরোহের কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

১। সৌর জগতে অবস্থিত প্রতিটি গ্রহকে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে, প্রতিটি গ্রহই সূর্যের আলোয় আলোকিত। অতএব সকল গ্রহই সূর্যের আলোয় আলোকিত।

২। ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণি মানবিক শাখার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, তারা সবাই যুক্তিবিদ্যা নিয়েছে। সুতরাং এ শ্রেণির সকলেই যুক্তিবিদ্যা নিয়েছে।

৩। সেল্‌ফে রাখা প্রতিটি বই পড়ে দেখা গেল যে, এর মধ্যকার প্রত্যেকটি বই পদার্থবিদ্যা বিষয়ের। অতএব সেল্‌ফে রাখা সকল বই হয় পদর্থবিদ্যা বিষয়ের।

শিক্ষার্থীর কাজ : যে সব কারণে পূর্ণাঙ্গ আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না সেগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

একটি তথাকথিত সার্বিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে সেই সার্বিক বাক্যটি স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে পূর্ণাঙ্গ আরোহ বলে। পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-এর সিদ্ধান্তটি একটি বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য, এতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় না, এতে আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই, এবং এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। তবে পূর্ণাঙ্গ আরোহে কোনো প্রকৃত অনুমান নেই বলে একে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির মানবিক শাখার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে, তারা সবাই যুক্তিবিদ্যা নিয়েছে। সুতরাং এ শ্রেণির সকলেই যুক্তিবিদ্যা নিয়েছে।-এটি কোন্ প্রকারের আরোহের উদাহরণ?

(ক) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (খ) পূর্ণাঙ্গ আরোহ
(গ) বৈজ্ঞানিক আরোহ (ঘ) অবৈজ্ঞানিক আরোহ

২। নিচের যে বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ আরোহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়-

(ক) এর সিদ্ধান্তটি একটি বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য (খ) এতে আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই
(গ) এতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় (ঘ) এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়

৩। যে বিষয়গুলো পূর্ণাঙ্গ আরোহের ক্ষেত্রে সত্য-

(i) আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই (ii) প্রকৃত আরোহ নয়
(iii) সিদ্ধান্তটি বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১৩ পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক (Relation between Perfect Induction and Scientific Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সাদৃশ্যগুলো জানতে পারবেন।
- পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক (Relation between Perfect Induction and Scientific Induction)

কোনো তথাকথিত সার্বিক যুক্তিবাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষার পর সিদ্ধান্তে সেই সার্বিক বাক্যটি স্থাপন করার পদ্ধতিকে পূর্ণাঙ্গ আরোহ বলে। পক্ষান্তরে, আরোহ অনুমানের যে প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। নিম্নে পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এ পাঠে উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে আলোচনা করা হলো :

পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ : পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপে উপস্থাপন করা হলো-

১। পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় আরোহই ঘটনার পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক। কেননা উভয় আরোহের ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বাস্তব ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

২। উভয় আরোহের লক্ষ্য হলো সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা।

৩। পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় আরোহই আরোহ যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

৪। উভয় আরোহই প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৫। পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় আরোহেরই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়।

পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈসাদৃশ্যসমূহ : পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১। পূর্ণাঙ্গ আরোহ শুধুমাত্র প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। পূর্ণাঙ্গ আরোহ কেবলমাত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আরোহে যেকোনো বিষয় পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩। পূর্ণাঙ্গ আরোহে শুধুমাত্র সদর্থক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত হিসেবে সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৪। পূর্ণাঙ্গ আরোহে বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় না। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন, অপনয়ন ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

৫। পূর্ণাঙ্গ আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে এর তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এর বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে।

৬। কেবল অভিজ্ঞতা নির্ভর বলে পূর্ণাঙ্গ আরোহ একটি সহজ-সরল পদ্ধতি। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় বলে বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি জটিল পদ্ধতি।

৭। পূর্ণাঙ্গ আরোহের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাক্যটি দেখতে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। এটি মূলত কতিপয় বিশেষ যুক্তিবাক্যের সমষ্টিমাত্র। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবাক্যটি প্রকৃত অর্থেই একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য।

৮। পূর্ণাঙ্গ আরোহে দৃষ্টান্ত সংখ্যা খুবই সীমিত। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে দৃষ্টান্ত সংখ্যা পূর্ণাঙ্গ আরোহের তুলনায় অনেক বেশি।

৯। আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই বলে পূর্ণাঙ্গ আরোহ একটি অপ্রকৃত আরোহ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহাত্মক উল্লম্ফনসহ প্রকৃত আরোহের সকল বৈশিষ্ট্য আছে বলে এটি একটি প্রকৃত আরোহ।

শিক্ষার্থীর কাজ : পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈসাদৃশ্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্যগুলো হলো- উভয় আরোহই ঘটনার পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক, উভয়ের লক্ষ্য একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং উভয়েরই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। আবার এদের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো হলো- পূর্ণাঙ্গ আরোহ প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এর সিদ্ধান্ত সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় না, এতে দৃষ্টান্ত সংখ্যা খুবই সীমিত এবং এটি একটি অপ্রকৃত আরোহ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এর সিদ্ধান্ত সার্বিক যুক্তিবাক্য, বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়, এতে দৃষ্টান্ত সংখ্যা ব্যাপক এবং এটি একটি প্রকৃত আরোহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে মূল বৈসাদৃশ্য হলো—
(ক) আরোহের প্রকৃতিতে (খ) ঘটনার পর্যবেক্ষণে
(গ) সিদ্ধান্তে (ঘ) আশ্রয়বাক্যে

২। পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়-
(ক) পূর্ণাঙ্গ আরোহে (খ) অপূর্ণাঙ্গ আরোহে
(গ) বৈজ্ঞানিক আরোহে (ঘ) অবৈজ্ঞানিক আরোহে

৩। পূর্ণাঙ্গ আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যগুলো হলো—
(i) উভয় আরোহই ঘটনার পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক (ii) উভয়েরই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়
(iii) উভয়ের লক্ষ্য সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১৪ পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য (Value of Perfect Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পূর্ণাঙ্গ আরোহের গুরুত্ব সম্পর্কে উইলিয়াম লিলির মতামত জানতে পারবেন।

পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য (Value of Perfect Induction)

আমরা জানি যে, আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই বলে পূর্ণাঙ্গ আরোহ একটি অপ্রকৃত আরোহ। আবার, এটি কার্য-কারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে এর তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্যও নেই। পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য ও গুরুত্ব নিয়ে যুক্তিবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) এর মতে পূর্ণাঙ্গ আরোহের কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। কারণ এ অনুমানের সাহায্যে আমরা জানা থেকে অজানায়, জ্ঞাত তথ্য থেকে অজ্ঞাত তথ্যে যেতে পারি না। আর এ জন্যই তিনি পূর্ণাঙ্গ আরোহকে সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত কয়েকটি বিশেষ বাক্যের সমাহার বলেছেন। অন্যদিকে, যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স (William Stanley *Jevons)* পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে এর উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তাই এ আরোহের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বা এর কোনোই মূল্য নেই এমন কথা বলা যায় না। পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য সম্পর্কে নিম্নে কতিপয় ধারণা উপস্থাপন করা হলো—

প্রথমত, যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স (William Stanley Jevons) পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্যের উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনাকে একত্রে সংযুক্ত করে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এর ব্যবহার একেবারে কম নয়। কারণ পূর্ণাঙ্গ আরোহের সাহায্যে আমরা বেশ কিছু ঘটনাকে একত্রিত করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে পারি। সুতরাং ব্যাপক কোনো বিষয়কে অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আরোহের এ প্রক্রিয়াটি আমাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় রোধ করে এবং মানসিক শ্রম লাঘব করে। কারণ যদি একটি শ্রেণির পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের সম্পর্কে বলা হয় যে, জামান হয় মেধাবী, জেসমিন হয় মেধাবী, রাশেদ হয় মেধাবী, মুশফিকা হয় মেধাবী, রাসেল হয় মেধাবী, সুমন হয় মেধাবী, মায়েশা হয় মেধাবী ইত্যাদি তাহলে বিষয়টি খুবই শ্রমসাধ্য, সময় সাপেক্ষ এবং বিরক্তিকর হবে। কিন্তু এভাবে না বলে যদি বলা হয় যে, এ শ্রেণির সব শিক্ষার্থী হয় মেধাবী তাহলে খুব সংক্ষেপে উক্ত বিষয়টি প্রকাশ করা সম্ভব। আর এটি করা তখনই সম্ভব যখন এ বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশ করা হবে।

তৃতীয়ত, পূর্ণাঙ্গ আরোহ প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে সাধারণ জ্ঞানের মানুষ খুব সহজেই তাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। তাই এটি সাধারণ মানুষের জীবন যাপন ও জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

চতুর্থত, এ অনুমানের সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাও তাদের অনুসন্ধেয় ও আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করে থাকে। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য রয়েছে।

সুতরাং এক কথায় বলা যায় যে, বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

পূর্ণাঙ্গ আরোহ অপ্রকৃত আরোহ হলেও এর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বা এর কোনোই মূল্য নেই এমন কথা বলা যায় না। কারণ যুক্তিবিদ্যাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পূর্ণাঙ্গ আরোহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর সাহায্যে আমরা বেশ কিছু ঘটনাকে একত্রিত করে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করতে পারি। এটি আমাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় রোধ করে ও মানসিক শ্রম লাঘব করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোনো বিষয়কে অত্যন্ত সংক্ষেপে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন্ প্রকারের আরোহ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে?
(ক) বৈজ্ঞানিক আরোহ (খ) অবৈজ্ঞানিক আরোহ
(গ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (ঘ) পূর্ণাঙ্গ আরোহ

২। কোন্ যুক্তিবিদ পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্যের উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন?
(ক) আলেকজান্ডার বেইন (খ) উইলিয়াম স্ট্যান্লি জেভন্স
(গ) কার্ভেথ রীড (ঘ) আই. এম. কপি

৩। পূর্ণাঙ্গ আরোহের মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে, কারণ-
(i) মানসিক শ্রম লাঘব করে (ii) সময়ের অপচয় রোধ করে
(iii) কোনো বিষয়কে সংক্ষেপে প্রকাশ করে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১৫ যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (Induction by Parity of Reasoning)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (Induction by Parity of Reasoning)

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) কর্তৃক বিভাজিত অপ্রকৃত আরোহের দ্বিতীয়টি হলো যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ। তবে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ অপ্রকৃত আরোহ হলেও এর গাণিতিক ও জ্যামিতিক তাৎপর্য অনেক বেশি।

যে যুক্তি দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করা যায়, সেই একই যুক্তি দিয়ে সমজাতীয় অন্যান্য সকল দৃষ্টান্তকে প্রমাণ করা যায়- এ নীতির উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ বলে।

এ জাতীয় যুক্তির ক্ষেত্রে প্রথমে একটি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের সমতার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে এটিকে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ বলে। আবার যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলেন যে, গণিতে, বিশেষ করে জ্যামিতিতে এ আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করা হয় বলে আরোহের এই প্রক্রিয়াকে জ্যামিতিক যুক্তি প্রক্রিয়া বলে। যেমন-

কখগ ত্রিভূজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।
∴সকল ত্রিভূজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ।

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ প্রকৃত আরোহ কী-না : আরোহের শ্রেণীকরণ করতে গিয়ে, যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহকে অপ্রকৃত আরোহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাধারণত যে সকল কারণে এটিকে অপ্রকৃত আরোহ বলা যায় সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। **ঘটনার পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিত :** আমরা জানি যে, ঘটনার পর্যবেক্ষণ প্রকৃত আরোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কারণ প্রকৃত আরোহে সাধারণত পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের সাহায্যে আমরা বাস্তব জগতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। আর এ বিশেষ বিশেষ বাস্তব ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। অর্থাৎ প্রকৃত আরোহের সিদ্ধান্ত হিসেবে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে ঘটনার পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। কারণ এই প্রক্রিয়ায় যখন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় যে, 'সকল ত্রিভূজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ' তখন আসলে বিশেষ বিশেষ ত্রিভূজকে পর্যবেক্ষণ করা হয় না। বরং এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ত্রিভূজ অঙ্কন করা হয়, যা সব ত্রিভূজের প্রতিনিধিত্ব করে। এরপর অঙ্কিত ত্রিভূজটির ক্ষেত্রে যা সত্য, তা সব ত্রিভূজের ক্ষেত্রেই সত্য বলে ধরে নেয়া হয়। সব ত্রিভূজের প্রতিনিধিত্বকারী অঙ্কিত এই ত্রিভূজটি আমাদের কল্পনা মাত্র। কারণ বাস্তবে এমন কোনো ত্রিভূজ নেই, যা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। আর যেহেতু এতে ঘটনার পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিত সেহেতু এটিকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

২। **সিদ্ধান্তে সার্বিক বাক্য স্থাপনে পদ্ধতিগত ত্রুটি :** যুক্তিসাম্যমূলক আরোহের সিদ্ধান্তে সার্বিক বাক্য স্থাপনের পদ্ধতিগত দিক থেকেও এটিকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না। কারণ প্রকৃত আরোহে বিশেষ বিশেষ ঘটনার বাস্তব ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শেষ পর্যন্ত একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। যেমন- আনোয়ারা, আয়েশা প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি মানুষের মৃত্যুর ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে এ পদ্ধতির সাহায্যে সকল মানুষের মরণশীলতা অনুমান করা হয়। কিন্তু যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে একটি শ্রেণীর একটি বিশেষ দৃষ্টান্তে কোনো কিছু সত্য বা মিথ্যা হলে, তা ঐ শ্রেণীর সকল সম্পর্কে স্বীকার করে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয়। কাজেই যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় এটিকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

৩। **যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ একটি জ্যামিতিক যুক্তি প্রক্রিয়া :** যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ মূলত একটি জ্যামিতিক যুক্তি প্রক্রিয়া। আর জ্যামিতিক যুক্তিপদ্ধতি বস্তুত আরোহাত্মক নয়, বরং অবরোহাত্মক। জ্যামিতিক যুক্তিপদ্ধতি অবরোহাত্মক বলে এর সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ, স্বীকার্য সত্য ও সংজ্ঞা থেকে অনিবার্যভাবে বা নিশ্চিতভাবে অনুমিত হয়ে থাকে। যেমন- ত্রিভূজের সংজ্ঞা হচ্ছে, 'তিনটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রকে ত্রিভূজ বলে।' ত্রিভূজের এ সংজ্ঞা থেকেই ' ত্রিভূজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ' কথাটি অনিবার্যভাবে অবরোহাত্মক পদ্ধতিতে নিঃসৃত হয়। এ কারণেই যুক্তিসাম্যমূলক আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

৪। **আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই :** যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে প্রকৃত আরোহের প্রাণ বা আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই। আরোহ অনুমানে আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়াকে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap) বলে। কিন্তু যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে একটি বিশেষ দৃষ্টান্তকে যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করে উক্ত যুক্তিটির মাধ্যমে সমজাতীয় অন্যান্য দৃষ্টান্তকে প্রমাণিত বলে ধরে নেয়া হয়। তাই এতে আরোহের মূল ভিত্তি 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' নেই। আর এ বৈশিষ্ট্যটি না থাকলে কোনো অনুমান প্রক্রিয়াকেই প্রকৃত আরোহ বলা যায় না। এ জন্যই যুক্তিসাম্যমূলক আরোহকে প্রকৃত আরোহ বলে অভিহিত করা যায় না।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ প্রকৃত আরোহ নয়। বস্তুত এটি তো প্রকৃত আরোহ নয়ই, বরং এটি আরোহের পর্যায়েও পড়ে না। এটি মূলত জ্যামিতিক অবরোহাত্মক যুক্তিপদ্ধতি।

সারসংক্ষেপ

যে যুক্তি দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করা যায়, সেই একই যুক্তি দিয়ে সমজাতীয় অন্যান্য সকল দৃষ্টান্তকে প্রমাণ করা যায়- এ নীতির উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ বলে। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ অপ্রকৃত আরোহ হলেও এর গাণিতিক ও জ্যামিতিক তাৎপর্য অনেক বেশি। ঘটনার পর্যবেক্ষণ না থাকা, সিদ্ধান্তে সার্বিক বাক্য স্থাপনে পদ্ধতিগত ত্রুটি, আরোহাত্মক উল্লম্ফনের অনুপস্থিতি এবং জ্যামিতিক অবরোহাত্মক যুক্তিপদ্ধতি হওয়ায় এটিকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৩.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যে যুক্তি দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করা যায়, সেই একই যুক্তি দিয়ে সমজাতীয় অন্যান্য সকল দৃষ্টান্তকে প্রমাণ করা যায়- এ নীতির উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?

(ক) বৈজ্ঞানিক আরোহ (খ) অবৈজ্ঞানিক আরোহ
(গ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ (ঘ) পূর্ণাঙ্গ আরোহ

২। নিচের কোন্‌টি যুক্তিসাম্যমূলক আরোহের ক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়?

(ক) ঘটনার পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিত (খ) জ্যামিতিক যুক্তি প্রক্রিয়া
(গ) আরোহাত্মক উল্লম্ফন আছে (ঘ) প্রকৃত আরোহ নয়

৩। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ হলো-

(i) জ্যামিতিক যুক্তিপদ্ধতি (ii) অবরোহাত্মক যুক্তিপদ্ধতি
(iii) আরোহাত্মক যুক্তিপদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১৬ যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Induction by Parity of Reasoning and Scientific Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Induction by Parity of Reasoning and Scientific Induction)

যে যুক্তি দিয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রমাণ করা যায়, সেই একই যুক্তি দিয়ে সমজাতীয় অন্যান্য সকল দৃষ্টান্তকে প্রমাণ করা যায়- এ নীতির উপর নির্ভর করে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য স্থাপন করার প্রক্রিয়াকে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ বলে। পক্ষান্তরে, আরোহ অনুমানের যে প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। নিম্নে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এ পাঠে উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করা হলে—

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ : যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার সাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয়ই আরোহ যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত।

২। উভয় আরোহের লক্ষ্য হলো সিদ্ধান্তে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা।

৩। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহ উভয় আরোহেরই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়।

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈসাদৃশ্যসমূহ : যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যসমূহ নিম্নরূপ—

১। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত পরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে, বৈজ্ঞানিক আরোহ বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল।

৩। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে শুধুমাত্র একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত হিসেবে একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে সদর্থক ও নঞর্থক উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত হিসেবে সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৪। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে বিজ্ঞানের কোনো স্তর অতিক্রম করতে হয় না। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন, অপনয়ন ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

৫। কেবলমাত্র যুক্তির সমতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ একটি সহজ-সরল পদ্ধতি। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় বলে বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি জটিল পদ্ধতি।

৬। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে ঘটনা পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। কারণ এই প্রক্রিয়ায় যখন সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হয় যে, 'সকল ত্রিভূজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ' তখন আসলে বিশেষ বিশেষ ত্রিভূজকে পর্যবেক্ষণ করা হয় না। বরং এক্ষেত্রে একটি বিশেষ ত্রিভূজ অঙ্কন করা হয়, যা সব ত্রিভূজের প্রতিনিধিত্ব করে। এরপর অঙ্কিত ত্রিভূজটির ক্ষেত্রে যা সত্য, তা সব ত্রিভূজের ক্ষেত্রেই সত্য বলে ধরে নেয়া হয়। সব ত্রিভূজের প্রতিনিধিত্বকারী অঙ্কিত এই ত্রিভূজটি আমাদের কল্পনা মাত্র। কারণ বাস্তবে এমন কোনো ত্রিভূজ নেই, যা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু ঘটনার পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কারণ বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত হিসেবে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল।

৭। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে একটি বিশেষ দৃষ্টান্তকে যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করে উক্ত যুক্তিটির মাধ্যমে সমজাতীয় অন্যান্য দৃষ্টান্তকে প্রমাণিত বলে ধরে নেয়া হয়। তাই এতে আরোহের মূল ভিত্তি 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান।

৮। আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই বলে যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ একটি অপ্রকৃত আরোহ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহে আরোহাত্মক উল্লম্ফনসহ প্রকৃত আরোহের সকল বৈশিষ্ট্য আছে বলে এটি একটি প্রকৃত আরোহ।

শিক্ষার্থীর কাজ : যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈসাদৃশ্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ ও বৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে উভয়ের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের মধ্যকার সাদৃশ্যগুলো হলো- উভয়ই আরোহ যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত, উভয়ের লক্ষ্য একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং উভয়েরই সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। আবার এদের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো হলো- যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় না, এতে দৃষ্টান্ত সংখ্যা মাত্র একটি এবং এটি একটি অপ্রকৃত আরোহ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়, এতে দৃষ্টান্ত সংখ্যা ব্যাপক এবং এটি একটি প্রকৃত আরোহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি যুক্তিসাম্যমূলক আরোহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
(ক) দৃষ্টান্ত সংখ্যা ব্যাপক (খ) প্রকৃত আরোহ
(গ) কারণ নিয়মরে উপর প্রতিষ্ঠিত (ঘ) আরোহ যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত

২। কেবলমাত্র যুক্তির সমতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়-
(ক) বৈজ্ঞানিক আরোহে (খ) অবৈজ্ঞানিক আরোহে
(গ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহে (ঘ) পূর্ণাঙ্গ আরোহে

৩। যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ হলো-
(i) প্রকৃত আরোহ (ii) অপ্রকৃত আরোহ
(iii) জ্যামিতিক আরোহ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১৭ ঘটনা সংযোজন ও এর প্রকৃতি (Colligation of Facts and Its Nature)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ঘটনা সংযোজন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঘটনা সংযোজনের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।

ঘটনা সংযোজন (Colligation of Facts)

ঘটনা সংযোজন-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Colligation of Facts' কথাটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন যুক্তিবিদ হিওয়েল (Whewell)। 'Colligation' শব্দটির অর্থ হলো একত্রীকরণ বা সংযোজন, আর 'Facts' অর্থ তথ্য বা ঘটনা। সুতরাং 'Colligation of Facts' কথাটির অর্থ দাঁড়ায় তথ্যাবলি বা ঘটনাবলির একত্রীকরণ বা ঘটনা সংযোজন। তাই শব্দটির অর্থগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, কয়েকটি বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একটি সার্বিক ধারণা বা সংজ্ঞা দ্বারা একত্রিত করার মানসিক প্রক্রিয়াই হলো ঘটনা সংযোজন।

ঘটনা সংযোজন-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন, "ঘটনা সংযোজন হলো মনের সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা বাস্তবে পর্যবেক্ষিত ঘটনাবলিকে একটি বর্ণনার অধীনে আনয়ন করি অথবা যার সাহায্যে আমরা সংখ্যাবহুল বিষয়কে একটি একক যুক্তিবাক্যের আকারে সংক্ষেপিত করতে পারি।"("Colligation is that mental operation which enables us to bring a number of actually observed phenomena under a description or which enables us to sum up a number of details in a single proposition." P-196)

ঘটনা সংযোজন-এর উদাহরণ : এক দল নাবিক সমুদ্র যাত্রার কিছুদিন পর একটি ভূখন্ডের সন্ধান পেলেন। প্রথমে তারা বুঝতে পারলেন না যে, ভূখন্ডটি কোনো দ্বীপ না কোনো মহাদেশের অংশ। ফলে তারা ভূখন্ডটি প্রদক্ষিণ করা শুরু করলেন এবং কিছু দিন পরই তারা ঐ পূর্বের স্থানে ফিরে আসলেন। এরপর তারা সমুদ্র ভ্রমণের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে দ্বীপ সম্পর্কে তাদের পূর্ববর্তী ধারণা 'চারদিকে জল দ্বারা আবদ্ধ স্থলভাগকে দ্বীপ বলে'-এর সাথে সংযোজিত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, সে ভূখন্ডটি একটি দ্বীপ, মহাদেশ নয়। এক্ষেত্রে নাবিক দল যে পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাই হলো ঘটনা সংযোজন।

ঘটনা সংযোজন-এর প্রকৃতি (The Nature of Colligation of Facts) : ঘটনা সংযোজন-এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে এর প্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত ধারণা পাওয়া যায়-

১। ঘটনা সংযোজন-এ প্রকৃত আরোহের প্রাণ বা আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই। এ অনুমানে কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমন করা হয় না।

২। ঘটনা সংযোজনের সিদ্ধান্তটিতে নতুন কোনো তথ্য থাকে না বলে এটি একটি বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য। কারণ নাবিক দল যখন 'চারদিকে জল দ্বারা আবদ্ধ স্থলভাগকে দ্বীপ বলে'-এর সাথে সমুদ্র ভ্রমণের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে দ্বীপ সম্পর্কে তাদের পূর্ববর্তী ধারণার সাথে সংযুক্ত করেন তখন তারা মূলত তাদের পূর্ববর্তী ধারণারই পূনরাবৃত্তি ঘটান। অর্থাৎ এতে নতুনত্বের কোনো প্রতিফলন নেই।

৩। ঘটনা সংযোজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় না।

৪। ঘটনা সংযোজনে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর নির্ভরশীলতা নেই বললেই চলে।

৫। এ অনুমানে সব সময় বাস্তব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত হয় বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়।

৬। এ শ্রেণির আরোহের সিদ্ধান্তে নতুন কোনো তথ্য থাকে না বা আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই বলে এটিকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না।

৭। ঘটনা সংযোজন কতগুলো ঘটনা বা তথ্যের বিবরণ মাত্র। কারণ এতে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ না করে কেবল কতগুলো তথ্যের একত্রীকরণ করে একটি বিষয়ের সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। অর্থাৎ ঘটনা সংযোজনে যা করা হয় তা সার্বিকীকরণ নয়; বরং নিরীক্ষিত ঘটনাসমূহের সমষ্টিকরণ।

৮। ঘটনা সংযোজন অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ : ঘটনা সংযোজন সম্পর্কে যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল প্রদত্ত সংজ্ঞাটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কয়েকটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একটি সার্বিক ধারণা বা সংজ্ঞা দ্বারা একত্রিত করার মানসিক প্রক্রিয়াই হলো ঘটনা সংযোজন। ঘটনা সংযোজনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় না, এটি কতগুলো ঘটনা বা তথ্যের বিবরণ মাত্র, আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই বলে এটিকে প্রকৃত আরোহ বলা যায় না। তবে ঘটনা সংযোজন অনেক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি অন্যতম সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.১৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কয়েকটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একটি সার্বিক ধারণা বা সংজ্ঞা দ্বারা একত্রিত করার মানসিক প্রক্রিয়াই হলো-
(ক)বৈজ্ঞানিক আরোহ (খ) অবৈজ্ঞানিক আরোহ
(গ) ঘটনা সংযোজন (ঘ) যুক্তিসাম্যমূলক আরোহ

২। নিচের কোন্‌টি ঘটনা সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রজোয্য?
(ক) আরোহাত্মক উল্লম্ফন আছে (খ) অপ্রকৃত আরোহ
(গ) কার্য-কারণ নিয়মরে উপর প্রতিষ্ঠিত (ঘ) আরোহ যুক্তিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়

৩। ঘটনা সংযোজন হলো-
(i) অপ্রকৃত আরোহ (ii) তথ্যের বিবরণ মাত্র
(iii) বৈজ্ঞানিক আরোহের সহায়ক পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১৮ ঘটনা সংযোজন সম্পর্কে মিলের অভিমত (Mill's Idea about Colligation of Facts)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ঘটনা সংযোজন সম্পর্কে মিলের অভিমত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঘটনা সংযোজনের প্রকৃতি জানতে পারবেন।

ঘটনা সংযোজন সম্পর্কে মিলের অভিমত (Mill's Idea about Colligation of Facts)

যুক্তিবিদ হিওয়েল (Whewell) এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) ঘটনা সংযোজনকে অপ্রকৃত আরোহ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ঘটনা সংযোজনকে বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি গরুত্বপূর্ণ সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে একে প্রকৃত আরোহের মর্যাদা দেয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন, "আরোহ অনুমান ঘটনা সংযোজন, কিন্তু ঘটনা সংযোজন আবশ্যিকভাবে আরোহ অনুমান নয়।" অথবা "আরোহ অনুমান ঘটনা সংযোজন, কিন্তু ঘটনা সংযোজনকে আরোহ অনুমান হতেই হবে এমন নয়।" ("Induction is Colligation but Colligation is not necessarily an Induction."1989, p.198)। এছাড়াও তিনি আরও যে সব কারণে ঘটনা সংযোজনকে অপ্রকৃত আরোহ বলে মনে করেন সেগুলো নিম্নরূপ-

১। **ঘটনা সংযোজনে আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই :** ঘটনা সংযোজনে প্রকৃত আরোহের প্রাণ বা আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই। আরোহ অনুমানে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। এভাবে বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়াকে আরোহাত্মক উল্লম্ফন বা অনির্দেশ যাত্রা (Inductive Leap) বলে। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)- এর মতে, এই আরোহমূলক লম্ফই হলো প্রকৃত আরোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঘটনা সংযোজনে কয়েকটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একটি সার্বিক ধারণা বা সংজ্ঞা দ্বারা একত্রিত করে মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। তাই এতে আরোহের মূল ভিত্তি 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' নেই। আর এ কারণেই যুক্তিবিদ মিল (Mill) ঘটনা সংযোজনকে প্রকৃত আরোহ বলে মনে করেন না।

২। **ঘটনা সংযোজন কতগুলো ঘটনার বিবরণ মাত্র :** যুক্তিবিদ মিল (Mill)- এর মতে, ঘটনা সংযোজন হলো কতগুলো ঘটনা বা তথ্যের বিবরণ মাত্র এটি কোনো ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া নয়। কারণ এতে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ না করে কেবল কতগুলো তথ্যের একত্রীকরণ করে একটি বিষয়ের সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। অর্থাৎ ঘটনা সংযোজনে যা করা হয় তা সার্বিকীকরণ নয়; বরং নিরীক্ষিত ঘটনাসমূহের সমষ্টিকরণ। সুতরাং এ জাতীয় আরোহ অনুমান বাহ্যিকভাবে প্রকৃত আরোহ বলে মনে হলেও আসলে তা নয়।

৩। **ঘটনা সংযোজনের সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য, সার্বিক যুক্তিবাক্য নয় :** অর্থাৎ আমরা ঘটনা সংযোজনের সাহায্যে একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা থেকে সেই বিশেষ বস্তু বা ঘটনাতেই গমন করি। কারণ এ পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বেই আমাদের মনে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বা প্রত্যয় থাকে। পরবর্তীতে আমরা যখন কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তখন ঐ পূর্ব ধারণা বা প্রত্যয়ের সাহায্যে একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য স্থাপন করি। তাই

এর সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। কিন্তু প্রকৃত আরোহের সিদ্ধান্তে সব সময় একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয়। সুতরাং ঘটনা সংযোজন প্রকৃত আরোহ নয়।

৪। **ঘটনা সংযোজন অবরোহমূলক :** যুক্তিবিদ মিল (Mill)- এর মতে, ঘটনা সংযোজনকে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আরোহমূলক নয় বরং অবরোহমূলক বলা যায়। কারণ অবরোহ পদ্ধতিতে সার্বিক ধারণার উপর নির্ভর করে একটি বিশেষ ধারণায় উপনীত হই। ঘটনা সংযোজনের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি আমাদের মনে পূর্ব থেকে একটি 'সাধারণ ধারণা বা প্রত্যয়' কাজ করে, যার সাহায্যে একটি বিশিষ্ট ঘটনার কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ প্রত্যক্ষ করে সেগুলোকে সংযোজন করতে সমর্থ হই। সুতরাং ঘটনা সংযোজনের ক্ষেত্রেও আমরা একটি সাধারণ ধারণা থেকে বিশেষ ধারণায় উপনীত হই। তাই ঘটনা সংযোজন তো প্রকৃত আরোহ নয়ই; বরং এটি একটি অবরোহমূলক প্রক্রিয়া।

শিক্ষার্থীর কাজ : ঘটনা সংযোজনের প্রকৃতি সম্পর্কে মিলের অভিমতটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল ঘটনা সংযোজনকে অপ্রকৃত আরোহ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, ঘটনা সংযোজনকে বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি গরুত্বপূর্ণ সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে একে প্রকৃত আরোহের মর্যাদা দেয়া যায় না। কারণ এতে আরোহাত্মক উল্লম্ফন নেই, এটি কতগুলো ঘটনার বিবরণ মাত্র, এর সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য এবং এটি একটি অবরোহমূলক প্রক্রিয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.১৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন্ যুক্তিবিদ ঘটনা সংযোজনকে প্রকৃত আরোহ বলে অভিহিত করেছেন?
(ক) হিওয়েল (খ) জন স্টুয়ার্ট মিল
(গ) যোসেফ (ঘ) আই. এম. কপি

২। নিচের কোন্‌টি ঘটনা সংযোজন সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় ?
(ক) অবরোহমূলক পদ্ধতি (খ) অপ্রকৃত আরোহ
(গ) সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য (ঘ) সিদ্ধান্ত একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য

৩। ঘটনা সংযোজনের প্রকৃতি সম্পর্কে মিলের অভিমত হলো এটি একটি-
(i) অবরোহমূলক প্রক্রিয়া (ii) আরোহমূলক প্রক্রিয়া
(iii) অপ্রকৃত আরোহ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.১৯ ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের পার্থক্য (Difference between Colligation of Facts and Scientific Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের স্বরূপ জানতে পারবেন।

ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের পার্থক্য (Difference between Colligation of Facts and Scientific Induction)

ঘটনা সংযোজন হলো মনের সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা প্রকৃত নিরীক্ষিত ঘটনাবলিকে একটি বর্ণনার অধীনে আনয়ন করি অথবা যার সাহায্যে আমরা সংখ্যা বহুল বিষয়কে একটি একক যুক্তিবাক্যের আকারে সংক্ষেপিত করতে পারি। পক্ষান্তরে, আরোহ অনুমানের যে প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ নিয়মের উপর নির্ভর করে কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয় তাকে বৈজ্ঞানিক আরোহ বলে। ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের এ সংজ্ঞাগত পার্থক্যের ভিত্তিতে নিম্নে উভয় আরোহের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো—

১। ঘটনা সংযোজনে কয়েকটি অভিজ্ঞতালব্ধ বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একটি সার্বিক ধারণা বা সংজ্ঞা দ্বারা একত্রিত করে মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। তাই এতে আরোহের মূল ভিত্তি 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' নেই। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। সুতরাং বৈজ্ঞানিক আরোহে 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' আছে।

২। ঘটনা সংযোজন হলো কতগুলো ঘটনা বা তথ্যের বিবরণ মাত্র এটি কোনো ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া নয়। কারণ এতে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ না করে কেবল কতগুলো তথ্যের একত্রীকরণ করে একটি বিষয়ের সাথে তুলনা করে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। অর্থাৎ ঘটনা সংযোজনে যা করা হয় তা সার্বিকীকরণ নয়; বরং নিরীক্ষিত ঘটনাসমূহের সমষ্টিকরণ। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহ হলো একটি ব্যাখ্যামূলক প্রক্রিয়া। কারণ কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণই হলো বৈজ্ঞানিক আরোহের মূল বৈশিষ্ট্য।

৩। ঘটনা সংযোজনের সাহায্যে আমরা একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা থেকে সেই বিশেষ বস্তু বা ঘটনাতেই গমন করি। কারণ এ পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বেই আমাদের মনে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বা প্রত্যয় থাকে। পরবর্তীতে আমরা যখন কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তখন ঐ পূর্ব ধারণা বা প্রত্যয়ের সাহায্যে একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য স্থাপন করি। তাই এর সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য সার্বিক যুক্তিবাক্য নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে সব সময় একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য স্থাপন করা হয়। যেমন- 'সকল দার্শনিক হন যুক্তিবাদী' বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্ত হিসেবে প্রাপ্ত এ যুক্তিবাক্যটির বিধেয় পদ 'যুক্তিবাদী'-এর উদ্দেশ্য পদ 'দার্শনিক'-এর সমগ্র ব্যক্ত্যর্থ সম্পর্কে স্বীকৃত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক আরোহের সিদ্ধান্তে যে যুক্তিবাক্যটি স্থাপন করা হয় তা একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য কোনো বিশেষ বা বিশিষ্ট বাক্য নয়।

৪। অবরোহ পদ্ধতিতে সার্বিক ধারণার উপর নির্ভর করে একটি বিশেষ ধারণায় উপনীত হই। ঘটনা সংযোজনের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি আমাদের মনে পূর্ব থেকে একটি 'সাধারণ ধারণা বা প্রত্যয়' কাজ করে, যার সাহায্যে একটি বিশিষ্ট ঘটনার কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ প্রত্যক্ষ করে সেগুলোকে সংযোজন করতে সমর্থ হই। অর্থাৎ ঘটনা সংযোজনের ক্ষেত্রেও আমরা একটি সাধারণ ধারণা থেকে বিশেষ ধারণায় উপনীত হই। তাই ঘটনা সংযোজন একটি

অবরোহমূলক প্রক্রিয়া। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহে বিশেষ থেকে সার্বিকে যাওয়া হয় বলে এটি একটি যথার্থ আরোহমূলক প্রক্রিয়া।

৫। ঘটনা সংযোজন কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আরোহ কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৬। ঘটনা সংযোজনে বিজ্ঞানের কোনো স্তর অতিক্রম করতে হয় না। পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় নিরীক্ষণ, পরীক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন, অপনয়ন ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

৭। কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বলে ঘটনা সংযোজন একটি সহজ-সরল পদ্ধতি। পক্ষান্তরে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয় বলে বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি জটিল পদ্ধতি।

সুতরাং আরোহের সকল বৈশিষ্ট্য না থাকায় ঘটনা সংযোজন প্রকৃত আরোহ নয়। পক্ষান্তরে, আরোহের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকায় বৈজ্ঞানিক আরোহ একটি প্রকৃত আরোহ। তবে সকল প্রকার আরোহেই ঘটনা সংযোজন রয়েছে। এ কারণেই যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *'A System of Logic'* গ্রন্থে বলেন, " আরোহ অনুমানে ঘটনা সংযোজন হতে পারে, কিন্তু ঘটনা সংযোজন আরোহ অনুমান নয়।"("Induction is Colligation but Colligation is not Necessarily an Induction." 1889, P.198)।

শিক্ষার্থীর কাজ : ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার পার্থক্যগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের সংজ্ঞাগত পার্থক্যের ভিত্তিতে উভয় আরোহের মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়ের মধ্যকার মূল পার্থক্যগুলো হলো- ঘটনা সংযোজনে 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' নেই, এটি তথ্যের বিবরণ মাত্র, এর সিদ্ধান্ত একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য এবং এটি কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় । পক্ষান্তরে, বৈজ্ঞানিক আরোহে 'আরোহাত্মক উল্লম্ফন' আছে, এটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক, এর সিদ্ধান্ত একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য এবং এটি কার্য-কারণ নিয়ম ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহ একই প্রকৃতির নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৩.১৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ঘটনা সংযোজন ও বৈজ্ঞানিক আরোহের মধ্যকার মূল পার্থক্য কোন্‌টি?
(ক) আরোহের প্রকৃতিতে (খ) আরোহাত্মক উল্লম্ফনে
(গ) কার্য-কারণ নিয়মে (ঘ) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিতে

২। ঘটনা সংযোজনের ক্ষেত্রে যেটি সত্য—
(ক) আরোহাত্মক উল্লম্ফন আছে (খ) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত
(গ) সংশ্লেষণমূলক (ঘ) এটি তথ্যের বিবরণ মাত্র

৩। ঘটনা সংযোজন হলো—
(i) বিশেষ থেকে বিশেষে গমন (ii) তথ্যের বিবরণ
(iii) প্রকৃত আরোহ
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট– ৩

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। বৈজ্ঞানিক আরোহ কয়টি মৌলিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২। নিচের কোন্‌টি অবৈজ্ঞানিক আরোহের বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) সিদ্ধান্তটি একটি সার্বিক সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য
(খ) আরোহাত্মক উল্লম্ফন বিদ্যমান
(গ) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত
(ঘ) কার্য-কারণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

৩। বৈজ্ঞানিক আরোহ যে মৌলিক নিয়মগুলো উপর প্রতিষ্ঠিত তাহলো-
(i) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি
(ii) কার্য-কারণ নিয়ম
(iii) অবাধ অভিজ্ঞতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আরোহ অনুমানে আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়া অবস্থাকে নির্দেশ করে।

৪। উদ্দীপকটিতে নিচের কোন প্রক্রিয়াটির কথা বলা হয়েছে?
(ক) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির
(খ) কার্য-কারণ নিয়মের
(গ) অবাধ অভিজ্ঞতার
(ঘ) আরোহাত্মক উল্লম্ফনের

৫। উদ্দীপকের আলোকে নিচের কোন বিষয়গুলো সঠিক?
(i) বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি মূল বৈশিষ্ট্য
(ii) বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাণ
(iii) সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমানে সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। নোভা ও ইভা দুই বোন। তারা একই কলেজে লেখাপড়া করে। নোভার মত ইভাও দাবা খেলতে ভালোবাসে। নোভা এবার মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে। তা দেখে সবাই ধারণা করল, আগামী বছর ইভাও বড় বোন নোভার মত মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পাবে। এ জাতীয় ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় না।

ক. কাকে আরোহের প্রাণ বলে? ১

খ. পূর্ণাঙ্গ আরোহ প্রকৃত আরোহ নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সকলের ধারণা অনুমানের কোন্ দিকটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে সকলের ধারণাটি এক ধরণের অনুপপত্তি নির্দেশ করে'-উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় একাদশ শ্রেণির ক্লাস পরিদর্শনে গিয়ে দেখলেন যে ঐ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী শিকক্ষের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে। এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে বললেন যে, একাদশ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী মনোযোগী। এরপর ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষক জনাব শান্তনু অধ্যক্ষ মহোদয়কে বললেন যে, এ যাবত যে সব শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাস করেছে তারা সকলেই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পেরেছে।

ক. বৈজ্ঞানিক আরোহ কাকে বলে? ১

খ. যুক্তিসাম্যমূলক আরোহকে কেনো প্রকৃত আরোহ বলা যায় না? ২

গ. উদ্দীপকে শিক্ষক জনাব শান্তনুর বক্তব্যে কোন্ ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্যে যে অনুমানের আভাস পাওয়া যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩ ঃ ১-খ, ২-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪ ঃ ১-খ, ২- খ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫ ঃ ১- ঘ, ২- খ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১২ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৩ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৪ ঃ ১-ঘ, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৫ ঃ ১-গ, ২-গ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৬ ঃ ১-ঘ, ২-গ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৭ ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৮ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৯ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-ক

প্রকল্প
(Hypothesis)

ইউনিট ৪

ভুমিকা

আমরা জানি, যুক্তিবিদ্যার মূল লক্ষ্য হলো সঠিক যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা। কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্পৃক্ত ঘটনাবলি অত্যন্ত জটিল ও মিশ্র। এ জটিল ও মিশ্র ঘটনাবলির প্রকৃতি এবং যথার্থ কারণ নির্ণয় করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। এমতাবস্থায় ঘটনাবলির মধ্যকার কার্য-কারণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য কোনো বিশেষ অবস্থাকে সাময়িকভাবে কারণ বলে ধরে নেয়া হয়। আর এ প্রক্রিয়ায় ঘটনাবলি ব্যাখ্যার জন্য সাময়িকভাবে কোনো বিশেষ অবস্থাকে কারণ বলে ধরে নেয়াকে বলা হয় প্রকল্প। একজন সাধারণ মানুষ যেমন তার দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করে থাকেন, তেমনি একজন বিজ্ঞানীও প্রকল্পের উপর নির্ভর করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন। আবার প্রকল্পের উপর নির্ভর করেই যুক্তিবিদগণ আরোহ অনুমানে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণসহ বিভিন্ন যৌক্তিক প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাই দৈনন্দিন ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত অনুমানের ক্ষেত্রে প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান ইউনিটে আমরা প্রকল্পের সংজ্ঞা, প্রকৃতি, প্রাসঙ্গিকতা, উৎস, স্তর, প্রকারভেদ, প্রকল্প সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা, কারণ ও নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প, বৈধ বা সুসংগত প্রকল্পের শর্তাবলি ও প্রমাণ এবং এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময় : সর্বোচ্চ ০৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১: প্রকল্পের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা
পাঠ-৪.২: প্রকল্পের উৎস
পাঠ-৪.৩: প্রকল্পের স্তর
পাঠ-৪.৪: প্রকল্পের প্রকারভেদ
পাঠ-৪.৫: প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম ও ঘটনা
পাঠ-৪.৬: প্রকল্প সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা
পাঠ-৪.৭: কারণ ও নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প
পাঠ-৪.৮: ব্যাখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক প্রকল্প
পাঠ-৪.৯ : বৈধ বা সুসংগত প্রকল্পের শর্তাবলি
পাঠ-৪.১০: প্রকল্পের প্রমাণ
পাঠ-৪.১১: প্রকল্পের গুরুত্ব

পাঠ-৪.১ প্রকল্পের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও প্রাসঙ্গিকতা (Definition, Nature and Relevance of Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- প্রকল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- প্রকল্পর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকল্পর প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রকল্পের সংজ্ঞা (Definition of Hypothesis)

ইংরেজি 'Hypothesis' শব্দের বাংলা অর্থ হলো প্রকল্প। আর 'Hypothesis' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Hupothesis' থেকে। এর অর্থ হলো 'to suppose' যার বাংলা পরিভাষা করা যায় 'ধরে নেয়া' বা 'মনে করা'। তাই উৎপত্তিগত অর্থে প্রকল্প হলো, কোনো কিছুকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে অনুসন্ধেয় বিষয়ের যথার্থ বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা। অথবা প্রকল্প হলো, কোনো বিষয়কে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার লক্ষ্যে প্রণীত সাময়িক ধারণা। তবে বিভিন্ন যুক্তিবিদ বিভিন্নভাবে প্রকল্পের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্য থেকে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill), কোহেন মরিস (Cohen Morris) ও ই. নেগেল (E. Negel) এবং কফি (Coffey) প্রদত্ত সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে প্রকল্পের সংজ্ঞায় বলেন, "প্রকল্প হলো (প্রকৃত প্রমাণ ছাড়া অথবা অসম্পূর্ণ প্রমাণের ভিত্তিতে) একটি আনুমানিক ধারণা, যা থেকে জানা বাস্তব ঘটনার প্রেক্ষিতে অবরোহিত সিদ্ধান্ত টানা যায় এবং ঐ সিদ্ধান্তগুলো জানা বা জ্ঞাত সত্যের সাথে মিলিয়ে যদি দেখা যায় যে, ধারণাটি থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে জ্ঞাত সত্যের মিল রয়েছে, তবে এ ধারণাটি সত্য হবে অথবা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।"("An hypothesis is any supposition which we make (either without actual evidence, or an evidence avowedly insufficient) in order to endeavour to deduce from its conclusions in accordance with facts which are known to be real; under the idea that if the conclusions to which the hypothesis leads are known truth, the hypothesis itself either must be, or at least likely to be true. " 1889, p-345)

কোহেন মরিস (Cohen Morris) ও ই. নেগেল (E. Nagel) তাঁদের '*Introduction to Logic and Scientific Method*' বইয়ে প্রকল্পের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন, "কোনো বিষয় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা যখন সমস্যার সম্মুখীন হই, তখন আমাদের পূর্ব ধারণা ও উক্ত বিষয়ের মধ্য থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত সাময়িক ব্যাখ্যাই হলো প্রকল্প।"(1989, p-200-201)

প্রকল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যুক্তিবিদ কফি (Coffey) তাঁর *The Science of Logic* বইয়ে বলেন যে, প্রকল্প হলো ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা; কোনো ঘটনাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যে সাময়িক ধারণা করা হয় তাকে প্রকল্প বলে। (An hypothesis is an attempt at explanation; a provisional supposition made in order to explain scientifically some fact or phenomenon.)

বিভিন্ন যুক্তিবিদ প্রদত্ত উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর ভিত্তিতে বলা যায় যে, কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করে অসমর্থিত তথ্যের সাহায্যে বাস্তব সত্য আবিষ্কারের জন্য ঐ সমস্যা সম্পর্কে সাময়িক ধারণা গঠন করাকেই বলা হয় প্রকল্প।

উদাহরণস্বরূপ- বিজ্ঞানী নিউটন আপেল গাছের নিচে বিশ্রামরত অবস্থায় একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখলেন। এর কারণ তিনি জানতেন না। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে একটি আনুমানিক ধারণা করলেন যে, ভূপৃষ্ঠে হয়তো কোনো আকর্ষণ শক্তি রয়েছে যা কোনো ভারি বস্তুকে নিচের দিকে টানে। আপেলটির ভূপাতিত হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটনের এ

আনুমানিক ধারণাটিই হলো প্রকল্প। এরপর তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যখন 'মধ্যাকর্ষণ শক্তি' আবিষ্কার করলেন তখন তা একটি তত্ত্ব বা সূত্রের মর্যাদা লাভ করে।

প্রকল্পের প্রকৃতি
(Nature of Hypothesis)

প্রকল্পের উপর্যুক্ত সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

১। **সাময়িক ধারণা :** প্রকল্প হলো কোনো কিছুর ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের অভাবে সাময়িকভাবে গৃহীত একটি আনুমানিক ধারণা।

২। **কোনো বিষয়ের বা ঘটনার ব্যাখ্যা :** সাধারণত যে কোনো বিষয় বা ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় ঘটনা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সংক্রান্ত সকল কিছুর প্রাথমিক ব্যাখ্যর প্রয়াসই হলো প্রকল্প।

৩। **প্রকল্প সত্য বা মিথ্যা হতে পারে :** কোনো বিষয় বা ঘটনার যথার্থ কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় সেগুলো সত্য বা মিথ্যা যে কোনোটি হতে পারে।

৪। **প্রকল্প একাধিক হতে পারে :** যে কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কিত প্রকল্প একাধিক হতে পারে। কারণ কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথমে যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয় তা যদি ঘটনাটি ব্যাখ্যায় যথেষ্ট না হয় তাহলে উক্ত প্রকল্প বর্জন করে নতুন আরেকটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। আর প্রকৃত সত্য বা সঠিক সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। এ কারণেই প্রকল্প একাধিক হতে পারে।

৫। **প্রকল্প সম্ভাবনামূলক :** প্রকল্প যেহেতু অপ্রমাণিত তথ্যের ভিত্তিতে গৃহীত আনুমানিক ধারণা সেহেতু এটি সাধারণত সম্ভাবনামূলক হয়ে থাকে।

৬। **প্রকল্পের সত্যতা বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল :** কোনো প্রকল্প থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবের অনুরূপ হলে সেটি সত্য হয়, আর বাস্তবের অনুরূপ না হলে সেটি মিথ্যা হয় বলে এর সত্যতা বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল।

৭। **ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান থাকতে হয় :** সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে যে ঘটনা সম্পর্কে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে তার সম্পর্কে অবশ্যই পূর্ব জ্ঞান থাকতে হবে। কেননা কোনো ঘটনা সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকল্প গঠন করা হলে এর সাহায্যে খুব সহজেই কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়।

প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা
(Relevance of Hypothesis)

প্রকল্প ছাড়া একদিকে যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে তেমনি এর সহায়তা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিও সম্ভব নয়। তাই বাস্তব জীবনের জটিল ও রহস্যময় সমস্যাগুলোর সমাধান কল্পে এবং চূড়ান্ত সত্য বা অধিকতর নিশ্চয়তামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রকল্প সর্বদাই একটি অপরিহার্য ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। নিম্নে প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো-

১। **ব্যবহারিক জীবনে :** প্রকল্প হলো কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা। ব্যবহারিক জীবনে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন জটিল ও রহস্যময় ঘটনার সম্মুখীন হই, যেমন- চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, হত্যা, আকস্মিক কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু বেশির ভাগ ঘটনারই প্রকৃত কারণ খুব সহজে জানা যায় না। তাই ঘটে যাওয়া ঘটনাটির আসল

কারণ কোন্‌টি তা নির্ণয়ের পূর্বে আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে একটি কারণ অনুমান করে নিতে হয়। আর এসব ঘটনা ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে যে কারণটি অনুমান করি তাই হলো প্রকল্প।

২। **বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে :** কোনো বিজ্ঞানী যখন ঘটনাবলির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করতে চান, তখন তিনি প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমেই অগ্রসর হন। আবার কোনো ঘটনার ব্যাখ্যায় প্রাথমিকভাবে গৃহীত প্রকল্পটি যদি কার্যকরী না হয় তাহলে তিনি তা বাতিল করে অপর একটি প্রকল্প প্রণয়ন করেন। এভাবে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে কোনো ঘটনার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান অগ্রসর হতে থাকে। যেমন- বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিউটনের আবিষ্কৃত মধ্যাকর্ষণ নিয়মটি প্রথমে তাঁর নিকট প্রকল্প আকারেই উপস্থিত হয়েছিল। তিনি আপেল গাছের নিচে বিশ্রামরত অবস্থায় একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখলেন। এর কারণ তিনি জানতেন না। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে একটি আনুমানিক ধারণা করলেন যে, ভূপৃষ্ঠে হয়তো কোনো আকর্ষণ শক্তি রয়েছে যা কোনো ভারি বস্তুকে নিচের দিকে টানে। আপেলটির ভূপাতিত হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটনের এ আনুমানিক ধারণাটিই হলো প্রকল্প। এরপর তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যখন 'মধ্যাকর্ষণ শক্তি' আবিষ্কার করলেন তখন তা একটি তত্ত্ব বা সূত্রের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র আমাদের ব্যবহারিক জীবনেই নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার অপরিহার্য।

৩। **প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যায় :** প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো এতো জটিল, মিশ্র ও রহস্যময় যে, সহজে এগুলোর কারণ আবিস্কার করা সম্ভব হয় না। প্রকৃতির এই জটিল ঘটনাবলির কারণ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া প্রকৃতির জটিল বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাকে সরল ও প্রাঞ্জল করার জন্য প্রকল্পের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। কারণ প্রকল্প সব সময়ই নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে প্রকৃতিতে সংঘটিত বিষয়াবলির প্রকৃত স্বরূপ অনুসন্ধানের কাজকে সহজ করে দেয়। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যায় প্রকল্প একটি অতীব প্রাসঙ্গিক বিষয়।

৪। **পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণে :** জীবন জটিলতায় সৃষ্ট ঘটনাবলির ব্যাখ্যায় ও প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগপৎ ব্যবহার অত্যন্ত প্রয়োজন। আর এই পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ কার্যের প্রকৃতি ও পথকে সহজ ও প্রশস্ত করার ক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

৫। **সিদ্ধান্ত সার্বিকীকরণে :** বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ সচেতন বলে তিনি প্রকল্প প্রতিষ্ঠার সব স্তর অতিক্রম করে সিদ্ধান্ত অনুমান করেন। আবার সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ নিজের অজান্তেই প্রকল্পের নিয়ম অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। অন্যদিকে আরোহ অনুমানের লক্ষ্যও সার্বিক সত্য অর্জন করা। তাই এক্ষেত্রেও সিদ্ধান্ত অনুমানের প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রকল্প গঠন করা হয়। সুতরাং সিদ্ধান্ত সার্বিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের কোনো বিকল্প নেই।

৬। **সামাজিক জীবনে :** সামাজিক জীবন যাপন করতে গিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। কোনো কোনো সময় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়াবলি তার চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য সে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যায়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক মানুষকে সমস্যার প্রকৃতি, উৎস ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য আনুমানিক ধারণার ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হয়। আর এ ধরনের ধারণা বা পরিকল্পনাই হলো প্রকল্প। তাই মানুষের সামাজিক জীবনেও প্রকল্প একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতার পক্ষে যুক্তি দিন।

সারসংক্ষেপ

কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করে অসমর্থিত তথ্যের সাহায্যে বাস্তব সত্য আবিষ্কারের জন্য ঐ সমস্যা সম্পর্কে সাময়িক ধারণা গঠন করাকেই বলা হয় প্রকল্প। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য হলো-এটি একটি সাময়িক ধারণা, এটি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে, প্রকল্প একাধিক হতে পারে এবং প্রকল্প সাধারণত সম্ভাবনামূলক। আবার প্রকল্প ছাড়া একদিকে যেমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে তেমনি এর সহায়তা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিও সম্ভব নয়। তাই বাস্তব জীবনের জটিল ও রহস্যময় সমস্যাগুলোর সমাধান কল্পে এবং চূড়ান্ত সত্য বা অধিকতর নিশ্চয়তামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য প্রকল্প সর্বদাই একটি অপরিহার্য ও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি প্রকল্পের প্রকৃতি নয়?
(ক) সত্য বা মিথ্যা হতে পারে (খ) একাধিক হতে পারে
(গ) সম্ভাবনামূলক (ঘ) স্থায়ী ও পরিপূর্ণ ধারণা

২। প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে-
(i) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে (ii) সামাজিক জীবনে
(iii) পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.২ প্রকল্পের উৎস (Sources of Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- প্রকল্পের উৎসসমূহ জানতে পারবেন।

প্রকল্পের উৎস (Sources of Hypothesis)

প্রকল্পের সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো বিষয়কে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা দানের উদ্দেশ্যে অপর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত আনুমানিক ধারণাকেই বলা হয় প্রকল্প। প্রকল্পের উৎস বলতে সাধারণত যে উপায়ে বা যে প্রক্রিয়ায় প্রকল্প গঠিত হয় তাকে বুঝায়। প্রকল্প গঠনের অনেক উৎস রয়েছে। নিম্নে এর প্রধান কয়েকটি উৎস সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো–

১। **সরল গণনামূলক আরোহ (Simple Enumerative Induction) :** সরল গণনামূলক আরোহ হলো প্রকল্প গঠনের একটি অতি সাধারণ ও বহুল প্রচলিত উৎস। যখন আমরা দু'টি ঘটনাকে এভাবে ঘটতে দেখি যে, একটি ঘটনা ঘটলে অন্য একটি ঘটনা অনিবার্যভাবে ঘটে, তখন আমরা প্রকল্প গঠন করি যে, ঘটনা দু'টি কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। যেমন- দেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেল যে, যেসব এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেশি সেসব এলাকায় শিক্ষার হারও বেশি। এরূপ অবস্থায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার হার নিরীক্ষণ করে আমরা সিদ্ধান্ত অনুমান করি যে, কোনো এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই উক্ত এলাকার শিক্ষার হার কম বা বেশি হওয়ার কারণ। উল্লেখ্য যে, সরল গণনামূলক আরোহের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়।

২। **যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তন (Simple Conversions of Propiosition) :** যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তন প্রকল্প গঠনের আর একটি অন্যতম উৎস। কারণ যে কোনো যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তন করেও আমরা প্রকল্প গঠন করতে পারি। যেমন- 'সকল মানুষ হয় মরণশীল' যুক্তিবাক্যটিকে সরল আবর্তন করলে দাঁড়ায়, 'সকল মরণশীল প্রাণী হয় মানুষ'। এ যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রকল্পটির অর্থ হলো একমাত্র মানুষই মরণশীল। কিন্তু এ প্রকল্প সম্পর্কিত আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দেয়। কারণ আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখি যে, এ পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও অন্যান্য যত প্রাণী আছে সবই মরণশীল। তাই আমরা গৃহীত প্রকল্পটি বর্জন করে আরেকটি নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করি যে, 'সকল প্রাণী হয় মরণশীল'। সুতরাং এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তন প্রকল্প গঠনে সহায়তা করে।

৩। **সাদৃশ্যমূলক অনুমান (Analogy) :** অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্যমূলক অনুমানও প্রকল্পের উৎস হিসেবে কাজ করে। দু'টি বস্তুর মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে আমরা অনুমান করি যে, তাদের একটি কোনো বিশেষ গুণের অধিকারী হলে অপরটিও ঐ গুণের অধিকারী হবে। যেমন- পৃথিবীর মত মঙ্গল গ্রহেও জীবন ধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপাদান মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদির অস্তিত্ব দেখে বিজ্ঞানীগণ সাদৃশ্যানুমানের ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করেন যে, পৃথিবীতে যেহেতু প্রাণী বসবাস করে সেহেতু মঙ্গল গ্রহেও প্রাণীর বসবাস আছে। এ প্রকল্পটি সাদৃশ্যানুমানের ভিত্তিতে গঠন করা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য কতিপয় মৌলিক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৪। **বৈজ্ঞানিক কল্পনা (Scientific Imagination) :** বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে যে কয়টি স্তর রয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন অন্যতম। বৈজ্ঞানিকগণ সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং সুশৃংখলভাবে যখন কোনো ঘটনা বা বিষয়ের কারণ নির্দেশ করেন তখন তাঁরা প্রথম যে কাজটি করেন তাহলো প্রকল্প গঠন। কারণ প্রকল্প গঠন ব্যতীত বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না। যেমন- বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিউটনের আবিষ্কৃত মধ্যাকর্ষণ নিয়মটি প্রথমে তাঁর নিকট প্রকল্পের আকারেই উপস্থিত হয়েছিল। তিনি আপেল গাছের নিচে বিশ্রামরত অবস্থায় একটি আপেল

মাটিতে পড়তে দেখলেন। এর কারণ তিনি জানতেন না। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে একটি আনুমানিক ধারণা বা বৈজ্ঞানিক কল্পনা করলেন যে, ভূপৃষ্ঠে হয়তো কোনো আকর্ষণ শক্তি রয়েছে যা কোনো ভারি বস্তুকে নিচের দিকে টানে। আপেলটির ভূপাতিত হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটনের এ বৈজ্ঞানিক কল্পনা বা আনুমানিক ধারণাটিই হলো প্রকল্প। এরপর তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যখন 'মধ্যাকর্ষণ শক্তি' আবিষ্কার করলেন তখন তা একটি তত্ত্ব বা সূত্রের মর্যাদা লাভ করে। সতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৈজ্ঞানিক কল্পনাও প্রকল্পের একটি অন্যতম উৎস।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রকল্পের উৎসসমূহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের উৎস বলতে সাধারণত যে উপায়ে বা যে প্রক্রিয়ায় প্রকল্প গঠিত হয় তাকে বুঝায়। প্রকল্প গঠনের অনেক উৎস রয়েছে। এর প্রধান কয়েকটি উৎস হলো–সরল গণনামূলক আরোহ, যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তন, বৈজ্ঞানিক কল্পনা এবং সাদৃশ্যমূলক অনুমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। প্রকল্পের উৎস বলতে বুঝায়-
(ক) যে প্রক্রিয়ায় প্রকল্প গঠিত হয় (খ) প্রকল্প যাতে অবস্থান করে
(গ) প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উৎসগুলোকে (ঘ) প্রকল্পের জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে

২। বিজ্ঞানী নিউটনের আবিষ্কৃত মধ্যাকর্ষণ নিয়মটির উৎস নিচের কোন্‌টি ?
(ক) সরল গণনামূলক আরোহ (খ) যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তন
(গ) বৈজ্ঞানিক কল্পনা (ঘ) সাদৃশ্যমূলক অনুমান

৩। প্রকল্পের উৎস হলো-
(i) সরল গণনামূলক আরোহ (ii) যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তন
(iii) বৈজ্ঞানিক কল্পনা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ প্রকল্পের স্তর (Steps of Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- প্রকল্পের স্তরগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ উৎগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

প্রকল্পের স্তর (Steps of Hypothesis)

কোনো ঘটনা বা বিষয়কে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা দেয়ার উদ্দেশ্যে অসমর্থিত তথ্যের ভিত্তিতে একটি সাময়িক ও আনুমানিক ধারণা গঠন করাকে প্রকল্প বলে। এই আনুমানিক ধারণা গঠন করার জন্য প্রকল্পকে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয় সেগুলোকে প্রকল্পের স্তর বলে। অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যাবলি বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত এবং প্রকল্পকে একটি একটি করে ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সর্বশেষ স্তরে এসে প্রকল্প থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবের অনুরূপ হয়, তাহলে প্রকল্পটি সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং তা তত্ত্ব বা সূত্র হিসেবে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এই তত্ত্বই আবার অন্য কোনো ঘটনার ব্যাখ্যায় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রকল্পের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে এতে চারটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। যথা-

১। **ঘটনার নিরীক্ষণ :** প্রকৃতিতে সংঘটিত কোনো ঘটনা যখন সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় নিরীক্ষণ। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়া যখন প্রাকৃতিক পরিবেশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তখন তা হয় পরীক্ষণ। আমরা জানি যে, প্রকল্প হলো কোনো ঘটনার ব্যাখ্যায় প্রাথমিক ধারণা। আর এ প্রাথমিক ধারণা গঠন করতে হলে প্রথমেই যে প্রক্রিয়াটি প্রয়োজন হয়, তাহলো নিরীক্ষণ। কারণ কোনো একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য শুরুতেই আমরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলি নিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে একটি প্রকল্প গঠন করি। এরপর ঐ প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে সামনের দিকে অগ্রসর হই। সুতরাং নিরীক্ষণ থেকেই প্রকল্পের যাত্রা শুরু। যেমন- পড়ার ঘরে প্রবেশ করে আমি দেখতে পেলাম যে, টেবিলের উপর রেখে যাওয়া আমার বইটি নেই। ঘরের ভিতরের সব জায়গাই নিরীক্ষণ করলাম, কিন্তু কোথাও বইটি দেখতে পেলাম না। এর ফলে আমার মনে বইটি পড়ার ঘরে না থাকার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার উদয় হলো। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নিরীক্ষণ প্রকল্প গঠনের প্রাথমিক উপাদান সরবরাহ করে।

২। **আনুমানিক ধারণা :** নিরীক্ষণের সময় অনুসন্ধেয় ঘটনার সম্ভাব্য কারণ সম্বন্ধে আমরা সাধারণত বেশ কিছু ধারণা লাভ করি। এ ধারণাগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি ধারণাকে কারণ বলে অনুমান করি। যেমন- পড়ার ঘরের টেবিলে রেখে যাওয়া বইটি না পাওয়ায় আমার মনে যেসকল ধারণার উদয় হলো সেগুলো থেকে আমি একটি আনুমানিক ধারণা গঠন করি যে, আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে কেউ হয়তো পড়ার জন্য বইটি নিয়ে গেছে। অর্থাৎ নিরীক্ষিত অবস্থা থেকে প্রকল্পের দ্বিতীয় স্তরে এসে এভাবে একটি আনুমানিক ধারণা গঠন করতে হয়।

৩। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ :** প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে আনুমানিক ধারণার পরবর্তী স্তর বা তৃতীয় স্তর হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তর। এ স্তরে আমাদের গৃহীত আনুমানিক ধারণাটি সঠিক বা যথার্থ হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য ধারণাটি থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনুমান করতে হয়। এ অনুমান কোনো কোনো সময় সঠিক হয়, আবার কোনো কোনো সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এ কারণেই একে বাস্তব ঘটনাবলি দিয়ে যাচাই করে নিতে হয়। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গঠন ছাড়া প্রকল্প যাচাই বা প্রমাণ করা যায় না। যেমন-'আমার বন্ধুদের মধ্য থেকে কেউ হয়তো পড়ার জন্য বইটি নিয়ে গেছে' এমন

আনুমানিক ধারণা গঠনের পর আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমার বন্ধু রাশেদ বইটি নিয়েছে। অর্থাৎ আনুমানিক ধারণা থেকে এক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

৪। **সমর্থন :** প্রকল্পের চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তর হলো সমর্থন। সমর্থন বলতে বুঝায় বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকল্পটিকে যাচাই বা প্রমাণ করা। এই যাচাই বা সমর্থন প্রক্রিয়ায় যদি দেখা যায় যে, প্রকল্পটি বাস্তব ঘটনা বা বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাহলে তাকে নিয়ম বা সাধারণ সূত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে; আর যদি তা অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে এই প্রকল্পকে অযথার্থ বলে বর্জন করে আবার নতুন প্রকল্প গঠন করতে হবে। প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জনের এই প্রক্রিয়াটি হলো সমর্থন। যেমন- অনুমিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি যদি সত্যি সত্যিই আমার বন্ধুর নিকট গিয়ে দেখি যে, সে বইটি পড়ার জন্য নিয়েছে, তাহলে আমার গৃহীত প্রকল্পটি সত্য বলে সমর্থিত বা যাচাইকৃত হবে। আর যদি দেখা যায় যে, সে আসলে বইটি নেয়নি, তাহলে আমার গৃহীত প্রকল্পটি বর্জন করে এ সংক্রান্ত একটি নতুন প্রকল্প গঠন করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রকল্পের স্তরগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

আনুমানিক ধারণা গঠন করার জন্য প্রকল্পকে যে সকল পর্যায় অতিক্রম করতে হয় সেগুলোকে প্রকল্পের স্তর বলে। অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যাবলি বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত এবং প্রকল্পকে একটি একটি করে ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সর্বশেষ স্তরে এসে প্রকল্প থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবের অনুরূপ হয়, তাহলে প্রকল্পটি সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং তা তত্ত্ব বা সূত্র হিসেবে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এই তত্ত্বই আবার অন্য কোনো ঘটনার ব্যাখ্যায় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। প্রকল্পের প্রকৃতি পর্যালোচনা করলে এতে চারটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। যথা-ঘটনার নিরীক্ষণ, আনুমানিক ধারণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমর্থন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। প্রকল্পের স্তর কয়টি ?
(ক) তিনটি (খ) চারটি
(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

২। প্রকল্পের তৃতীয় স্তর কোন্‌টি ?
(ক) ঘটনার নিরীক্ষণ (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ
(গ) আনুমানিক ধারণা (ঘ) সমর্থন

৩। প্রকল্পের স্তরগুলো হলো-
(i) ঘটনার নিরীক্ষণ (ii) কার্য-কারণ
(iii) সিদ্ধান্ত গ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ প্রকল্পের প্রকারভেদ (Kinds of Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার প্রকল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রকল্পের প্রকারভেদ (Kinds of Hypothesis)

কোনো ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হয়। যুক্তিবিদগণ এই প্রকল্পকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন। তবে যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড (Carveth Read) তিন প্রকার প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা :

১। কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Agent);
২। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Law) এবং
৩। বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Collocation)।

উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন হলেও এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। কেননা এগুলোর প্রতিটিই প্রকল্প বা প্রাথমিক ধারণার বিভিন্ন রূপ মাত্র।

১। কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Agent) : সাধারণত কোনো ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোনো একটি ঘটনা কোন্ নিয়মে সংঘটিত হয়েছে তা স্পষ্ট হলেও কোন্ বিষয় দ্বারা ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বা কে ঘটনাটি ঘটিয়েছে তা অস্পষ্ট থাকে। এমতাবস্থায় ঘটনা সংঘটনকারী বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করতে হয়। আর সংঘটনকারী বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় তাই কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প নামে পরিচিত। অর্থাৎ যখন কোনো প্রকল্পকে ব্যাখ্যা করার জন্য এর কর্তা বা কারক হিসেবে কোনো বিষয় বা ব্যক্তিকে কল্পনা করা হয়, তাকে কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Agent) বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, নেপচুন গ্রহ কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্পের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এ গ্রহটি আবিষ্কারের পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করেন যে, ইউরেনাস গ্রহের গতিপথ পূর্বের চেয়ে কিছুটা বেঁকে গেছে। গ্রহটি এর গতিপথ থেকে সরে যাওয়ার কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ প্রকল্প গঠন করলেন যে, সম্ভবত অন্য কোনো গ্রহের আকর্ষণে এর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। এরপর এ প্রকল্প অনুসারে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, সত্যি সত্যিই আরেকটি গ্রহের আকর্ষণের ফলে ইউরেনাস গ্রহের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকগণ এ নতুন আবিষ্কৃত গ্রহটির নাম দেন নেপচুন গ্রহ। সুতরাং নেপচুন গ্রহটি আবিষ্কার সম্পর্কিত প্রকল্পটি ছিল একটি কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প।

২। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Law) : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য অনেক সময় আমাদেরকে সেই ঘটনাটি কোন্ নিয়মে বা কোন্ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রকল্প গঠন করতে হয়। সাধারণত এ জাতীয় ঘটনার কর্তা বা কারক সম্পর্কে সব কিছু আমাদের জানা থাকে। কিন্তু কোন্ নিয়মে বা কোন্ পদ্ধতিতে কর্তা ক্রিয়াশীল হয় তা আমাদের জানা থাকে না। তাই ঘটনাটি কীভাবে বা কোন্ নিয়মে সংঘটিত হলো তা জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় যে প্রকল্প গঠন করা হয় তাই নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প। অতএব, যে প্রকল্পে

কোনো নিয়ম কল্পনা করা হয় বা কোনো নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় তাকে নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Law) বলে ।

উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানী নিউটন কর্তৃক মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের জন্য প্রণীত প্রকল্পটি হলো নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প । কারণ তিনি দেখলেন যে, একটি আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ল । এক্ষেত্রে আপেল হলো কর্তা । আর যে কারণে আপেলটি অন্যদিকে না গিয়ে মাটিতে পড়ল তাহলো এর নিয়ম । এই নিয়মটি বিজ্ঞানী নিউটনের জানা ছিল না । তাই তিনি এ নিয়ম আবিষ্কারের জন্য প্রকল্প গঠন করলেন যে, মাটিতে সম্ভবত এমন কোনো আকর্ষণ আছে যে কারণে আপেলটি অন্যদিকে না গিয়ে মাটিতে পড়েছে । এরপর এ নিয়ম সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটন গবেষণা করে তার মধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করেন । অতএব, এই মধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কারের পূর্বে নিউটন কর্তৃক যে প্রকল্প গঠন করা হয়েছিল তা নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প ।

৩। **বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Collocation) :** বিষয় বা বস্তুসমূহের যে পারস্পরিক সহ-অবস্থানের কারণে ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে গঠিত প্রকল্পই হলো বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প । কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, সংঘটিত ঘটনাটির কর্তা ও নিয়ম সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও যথার্থভাবে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না । এক্ষেত্রে কোন্ ধরনের পরিস্থিতির কারণে বা বিষয়সমূহের কোন্ ধরনের বিন্যাস ও পারস্পরিক অবস্থানের কারণে ঘটনাটি সংঘটিত হয় তা নির্ণয় করতে হয় । আর বিষয়সমূহের বিন্যাস ও পারস্পরিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য এ সম্পর্কে যে প্রকল্প গঠন করা হয় তাকে বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Collocation) বলে ।

উদাহরণস্বরূপ, একটি পরিবারের সকল সদস্য বাড়িতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আলমারিতে রাখা দামি স্বর্ণের হারটি চুরি হয়ে গেল । এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেল যে, বাড়িতে আসা নতুন কাজের মেয়েটি চাবি নিয়ে আলমারি খুলে স্বর্ণের হারটি চুরি করেছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মেয়েটি সব মানুষের উপস্থিতিতেই এ কাজটি করতে সক্ষম হয়েছে । এমতাবস্থায় সেই বিশেষ অবস্থাটি খুঁজে বের করার জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় । এ জাতীয় প্রকল্পই হলো বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প ।

উল্লেখ্য কোনো ঘটনা সম্পর্কে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হলে আমরা উপর্যুক্ত তিন শ্রেণির প্রকল্পের মধ্য থেকে প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো একটি বা দু'টি বা তিনটিকে একসাথে নিয়ে প্রকল্প গঠন করতে পারি । এটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকৃতির উপর । যেমন, কোনো একটি ঘটনা ঘটলে আমাদের যদি এর কর্তা সম্পর্কে জানা থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে নিয়ম সংক্রান্ত ও বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প দু'টি একসাথে গ্রহণ করতে হয় । আবার যদি কর্তা ও নিয়ম এ দু'টি বিষয় জানা থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করতে হয় । কিন্তু যদি কোনো ঘটনার কর্তা, নিয়ম ও বিন্যাস-এ তিনটির কোনোটিই জানা না থাকে, তাহলে ঐ ঘটনা সম্পর্কে তিন শ্রেণির প্রকল্পই একসাথে গঠন করতে হয় ।

শিক্ষার্থীর কাজ : যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড প্রদত্ত প্রকল্পের শ্রেণিবিভাগটি লিখুন ।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড তিন প্রকার প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন । যথা- কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প, নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প এবং বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প । এ প্রকল্পসমূহ একটি থেকে অন্যটি ভিন্ন হলেও এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । কোনো ঘটনা সম্পর্কে প্রকল্প প্রণয়ন করতে হলে এ তিন শ্রেণির প্রকল্পের মধ্য থেকে প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো একটি বা দু'টি বা তিনটিকে একসাথে নিয়ে প্রকল্প গঠন করা যায় । এটি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকৃতির উপর ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড কয় প্রকার প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন ?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। বিষয় বা বস্তুসমূহের যে পারস্পরিক সহ-অবস্থানের কারণে ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কে গঠিত প্রকল্পই হলো-
(ক) কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (খ) কারক সংক্রান্ত প্রকল্প
(গ) বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (ঘ) নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প

৩। যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড প্রদত্ত প্রকল্পগুলো হলো—
(i) কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (ii) নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প
(iii) যুক্তি সংক্রান্ত প্রকল্প

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম ও ঘটনা (Hypothesis, Theory, Law and Fact)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম, ঘটনা ইত্যাদির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম ও ঘটনার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম ও ঘটনা (Hypothesis, Theory, Law and Fact)

প্রাকৃতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি অসমর্থিত বা অপ্রমাণিত আনুমানিক ধারণা দিয়ে শুরু করে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সর্বজনস্বীকৃত প্রাকৃতিক নিয়মে পৌঁছাই। প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম ও ঘটনা এ শব্দগুলি মূলত ঐ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরকে নির্দেশ করে। এগুলো প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্যই প্রকল্পের সাহায্যে কোনো ঘটনার কার্য-কারণ নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা রাখা প্রয়োজন। নিম্নে প্রকল্প সম্পর্কিত এ বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

প্রকল্প (Hypothesis) : কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি বিশেষ সমস্যা চিহ্নিত করে অসমর্থিত তথ্যের সাহায্যে বাস্তব সত্য আবিষ্কারের জন্য ঐ সমস্যা সম্পর্কে সাময়িক ধারণা গঠন করাকেই বলা হয় প্রকল্প। অর্থাৎ প্রকল্প হলো কোনো কিছুর ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণের অভাবে সাময়িকভাবে গৃহীত একটি আনুমানিক ধারণা। যেমন- বিজ্ঞানী নিউটন আপেল গাছের নিচে বিশ্রামরত অবস্থায় একটি আপেল মাটিতে পড়তে দেখলেন। এর কারণ তিনি জানতেন না। এমতাবস্থায় তিনি প্রথমে একটি আনুমানিক ধারণা করলেন যে, ভূপৃষ্ঠে হয়তো কোনো আকর্ষণ শক্তি রয়েছে যা কোনো ভারি বস্তুকে নিচের দিকে টানে। আপেলটির ভূপাতিত হওয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটনের এ আনুমানিক ধারণাটিই হলো প্রকল্প।

মতবাদ (Theory) : কোনো প্রকল্প যখন যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, তখন তা তত্ত্ব বা মতবাদে পরিণত হয়। যেমন- বিজ্ঞানী নিউটন কর্তৃক গৃহীত মধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কিত প্রকল্পটি প্রথমে শুধুমাত্র একটি প্রকল্প ছিল। কিন্তু যাচাইয়ের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি যখন প্রমাণিত হয় তখন তা মতবাদে রূপান্তরিত হয়। আর প্রকল্প যখন প্রমাণিত হয়ে মতবাদের মর্যাদা পায় তখন এর গুরুত্বও বৃদ্ধি পায়।

নিয়ম (Law) : কোনো প্রকল্প যখন মতবাদ বা তত্ত্বের পর্যায়ে উপনীত হবার পর সংশ্লিষ্ট ঘটনা ব্যাখ্যা করা ছাড়াও অন্যান্য ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় তখন সেই মতবাদ বা তত্ত্বটি নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ প্রকল্পে যখন আরোহ সমন্বয় ঘটে তখন তা নিয়মে পরিণত হয়। যেমন- যখন দেখা গেল যে মধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত মতবাদ দিয়ে কোনো বস্তুর ভূ-পৃষ্ঠে পতন ব্যাখ্যা করা ছাড়াও গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, এদের গতি-বিধি, জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় তখন মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বা মতবাদটি মধ্যাকর্ষণ নিয়মে পরিণত হয়।

ঘটনা (Fact) : যখন কোনো তত্ত্ব বা মতবাদ আরোহ সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়মে পরিণত হয় তখন তা সর্বজনস্বীকৃত নিয়মে পরিণত হয়। আর এই সর্বজনস্বীকৃত নিয়মটিই হলো ঘটনা। সুতরাং ঘটনা হলো প্রকল্পের সর্বশেষ স্তর। যেমন- বিজ্ঞানী নিউটন কর্তৃক গৃহীত মধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কিত প্রকল্পটি যাচাইয়ের মাধ্যমে মতবাদে রূপান্তরিত হয়। আবার এই মতবাদ দিয়ে যখন কোনো বস্তুর ভূ-পৃষ্ঠে পতন ব্যাখ্যা করা ছাড়াও অন্যান্য ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলো তখন মধ্যাকর্ষণ মতবাদটি নিয়মে পরিণত হলো। আর এই নিয়মটি যখন সর্বজনস্বীকৃতি পেলো তখন তা হলো ঘটনা।

প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম ও ঘটনা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে লক্ষণীয় যে, এগুলোর কোনোটিকেই একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করে দেখানো সম্ভব নয়। কারণ একটি প্রকল্প ঠিক কোন অবস্থায় মতবাদের স্তরে উন্নীত হয়, একটি

মতবাদ কখন একটি নিয়মে রূপান্তর হয় এবং একটি নিয়ম কখন ঘটনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কারণ একজন চিন্তাবিদ যে বিষয়টিকে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করেন অন্যজন সেই বিষয়টিকেই আবার মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেন। একজন চিন্তাবিদ যে বিষয়টিকে মতবাদ হিসেবে গ্রহণ করেন অন্যজন সেই বিষয়টিকেই নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে এটি সত্য যে, প্রকল্প পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থিত হলে মতবাদে পরিণত হয়। আবার একটি মতবাদ বিভিন্ন ঘটনা ব্যাখ্যার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হলে একটি নিয়মের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সবশেষে একটি নিয়ম যখন মানব সমাজে সত্য বলে স্বীকৃতি লাভ করে তখন তা ঘটনায় রূপ নেয়।

তাই বলা যায় যে, প্রকল্প নিয়মে, নিয়ম মতবাদে এবং মতবাদ ঘটনায় প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে সর্বদাই একটি ধারাবহিকতা লক্ষ্য করা যায় এবং এদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কটি হলো পর্যায়ক্রমিকের ও পরিণতিপ্রাপ্তির সম্পর্ক।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রকল্প ও ঘটনার মধ্যকার পার্থক্যটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি অসমর্থিত আনুমানিক ধারণা দিয়ে শুরু করে আমরা শেষ পর্যন্ত একটি সর্বজনস্বীকৃত প্রাকৃতিক নিয়মে পৌঁছাই। প্রকল্প, মতবাদ, নিয়ম ও ঘটনা এ শব্দগুলি মূলত ঐ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরকে নির্দেশ করে। প্রকল্প নিয়মে, নিয়ম মতবাদে এবং মতবাদ ঘটনায় প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে সর্বদাই একটি ধারাবহিকতা লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি সাময়িক ধারণা গঠন করাকেই বলা হয়-
(ক) ঘটনা (খ)মতবাদ
(গ) নিয়ম (ঘ) প্রকল্প

২। নিয়ম যখন সর্বজনস্বীকৃতি পায় তখন তা হয়—
(ক) ঘটনা (খ) মতবাদ
(গ) নিয়ম (ঘ) প্রকল্প

৩। ঘটনা হলো-
(i) নিয়মের পূর্ববর্তী স্তর (ii) প্রকল্পের সর্বশেষ স্তর
(iii) মতবাদের পরিণত স্তর

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৬ প্রকল্প সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা (Some Concepts Relating to Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- প্রকল্প সংক্রান্ত ধারণাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাস্তব কারণের স্বরূপ জানতে পারবেন।
- আরোহের সমন্বয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

প্রকল্প সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা (Some Concepts Relating to Hypothesis)

প্রকল্প হলো আনুমানিক ধারণা যা কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য বা কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য প্রণয়ন করা হয়। আর এই প্রকল্পের সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িত যেগুলো ছাড়া প্রকল্প এর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। এই বিষয়গুলোই যুক্তিবিদ্যায় প্রকল্প সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা (Some Concepts Relating to Hypothesis) হিসেবে পরিচিত। এ ধারণাগুলো নিম্নরূপ—

পরীক্ষামূলক সমর্থন (Verification) : কোনো প্রকল্প সত্য না মিথ্যা তা পরীক্ষা করার সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হলো পরীক্ষামূলক সমর্থন। যুক্তিবিদ্যায় 'সমর্থন' কথাটি দ্বারা কোনো প্রকল্পকে বাস্তবের সাথে যাচাই করা বা মিলিয়ে দেখাকে বুঝায়। এজন্যই পরীক্ষামূলক সমর্থন পদ্ধতিকে যাচাইকরণ পদ্ধতিও বলা হয়। পরীক্ষামূলক সমর্থন দুই প্রকার। যথা-

১। **প্রত্যক্ষ সমর্থন (Direct Verification) :** প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যখন কোনো প্রকল্প যাচাই বা সমর্থন করা হয় তখন তাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন বলে। প্রত্যক্ষ সমর্থন আবার দুই প্রকার। যথা- ক. নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং খ. পরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন। যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকল্পকে যাচাই বা সমর্থন করা হয় তখন তাকে নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বলে। যেমন- কক্ষপথ থেকে বুধ গ্রহের বিচ্যুতির কারণ হিসেবে বৈজ্ঞানিকগণ বুধ গ্রহের আশেপাশে অপর একটি অজানা গ্রহের কল্পনা করেন। এরপর একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যখন বৃহস্পতি গ্রহটি নিরীক্ষণ করেন, তখন এ প্রকল্পটি নিরীক্ষণের সাহায্যে সমর্থিত হয়। তাই এ সমর্থনকে বলা হয় নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন। আর যখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকল্পকে যাচাই বা সমর্থন করা হয় তখন তাকে পরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বলে। যেমন- বায়ুমন্ডল থেকে সংগৃহীত অক্সিজেনর ওজন অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত অক্সিজেনের ওজনের চেয়ে ভারী হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ প্রকল্প গঠন করলেন যে, বায়ুমন্ডলের অক্সিজেনের সাথে অন্য কোনো গ্যাস মিশ্রিত আছে। এ প্রকল্পটি পরীক্ষণের সাহায্যে সমর্থিত হয়েছে বলে এটি হলো পরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন।

২। **পরোক্ষ সমর্থন (Indirect Verification) :** কোনো কোনো প্রকল্প প্রমাণের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়া যায় না। তখন প্রকল্পকে অবরোহ পদ্ধতিতে যৌক্তিকভাবে যাচাই করতে হয়। প্রকল্পকে এভাবে যাচাই করার প্রক্রিয়াকে প্রকল্প প্রমাণের পরোক্ষ সমর্থন বলে। পরোক্ষ সমর্থন আবার দুই প্রকার। যথা- ক. অবরোহমূলক পরোক্ষ সমর্থন এবং খ. ঘটনা সংকলনের সাহায্যে পরোক্ষ সমর্থন। যুক্তির অবরোহমূলক প্রক্রিয়ায় যখন কোনো প্রকল্পকে যাচাই করা হয় তখন তাকে প্রকল্পের অবরোহমূলক পরোক্ষ সমর্থন বলে। যেমন-'বায়ুমন্ডলের চাপই চাপমান যন্ত্রের পারদ উত্থান-পতনের কারণ' টরিসিলীর এ প্রকল্পটি প্যাসকেল অবরোহ অনুমান দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থন করে সিদ্ধান্ত অনুমান করেন যে, যেখানে বায়ুমন্ডলের চাপ কম সেখানে পারদের উত্থানও কম। এরপর তিনি একটি চাপমান যন্ত্র পর্বত চূড়ায় নিয়ে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তটি যাচাই ও প্রমাণ করেন। এ প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে টরিসিলীর প্রকল্পটি বিজ্ঞানী প্যাসকেল কর্তৃক অবরোহ পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থিত হয়। আর

যখন কোনো প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ঘটনাকে সংকলন করে পরোক্ষভাবে প্রকল্পকে প্রমাণ করা হয় তখন তাকে ঘটনা সংকলনের সাহায্যে পরোক্ষ সমর্থন বলে। যেমন- ইথারের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা যায় না। কিন্তু এ সম্পর্কিত প্রকল্প রেডিও ও টেলিভিশনের উপযোগিতা দ্বারা সমর্থিত হয়। কারণ ইথারের সাহায্যে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা ছবি দেখতে পাই ও কথা শুনতে পাই। তাই এ প্রকল্পটি ঘটনা সংকলনের সাহায্যে পরোক্ষভাবে সমর্থিত।

২। **বাস্তব কারণ (Real Cause or Vera Causa) :** একটি বৈধ প্রকল্পের মূল শর্ত হচ্ছে বাস্তব কারণ। যে কারণের অস্তিত্বকে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করা যায়, যার অস্তিত্বে বিশ্বাস আত্মবিরোধী নয় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার উপযোগিতা প্রমাণ করা যায় তাকে বাস্তব কারণ বলে। বাস্তব কারণের অর্থ প্রকৃত কারণ বা অস্তিত্বশীল কারণ। তাই যেকোনো প্রকল্পকে বৈধ হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই বাস্তব কারণভিত্তিক হতে হবে। অনস্তিত্বশীল কোনো বিষয়কে কখনও প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। অর্থাৎ এমন কোনো বিষয়কে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই এবং যাকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই করা যায় না। যেমন- একটি শিশু হারিয়ে গেলে তার কারণ হিসেবে যদি প্রকল্প গঠন করা হয় যে, তাকে ভূতে নিয়ে গিয়েছে, তাহলে গৃহীত প্রকল্পটি বাস্তব কারণভিত্তিক হবে না। কেননা 'ভূত' নামে বাস্তবে অস্তিত্বশীল কোনো কিছু অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। কিন্তু শিশুটি হারিয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে যদি এমন প্রকল্প গঠন করা হতো যে তাকে কোনো ছেলে ধরা নিয়ে গিয়েছে, তাহলে গৃহীত প্রকল্পটি বাস্তব কারণভিত্তিক হতো। কেননা বাস্তবেই ছেলে ধরার অস্তিত্ব রয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় এমন কারণটিই কেবল বাস্তব কারণ হবে, এমন ধারণা সঠিক নয়। আসলে বাস্তব কারণ কথাটি দ্বারা এমন কিছু নির্দেশ করা হয় যাতে কোনো আত্মবিরোধ নেই এবং যার অস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তাই যে কারণের অস্তিত্বকে যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করা যায় না, যার অস্তিত্বে বিশ্বাস আত্মবিরোধী এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যার উপযোগিতা প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায় না তাকে বাস্তব কারণ বলে গ্রহণ করা যাবে না।

৩। **প্রতিবেদক অনুকল্প (Representative Fictions) :** যে সব বিষয় প্রকৃতিতে অবস্থান করছে এবং উপযোগিতাও রয়েছে অথচ আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি না সে সব বিষয়কে প্রতিবেদক অনুকল্প (Representative Fictions) বলে। অর্থাৎ প্রতিবেদক অনুকল্প এমন এক ধরনের বাস্তব কারণ বা প্রকৃত কারণ যার অস্তিত্ব কখনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic-Induction* গ্রন্থে বলেন, "কিছু কিছু প্রকল্প বস্তুর সূক্ষ্মতম গঠন ও কার্যপ্রণালী অথবা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রণীত হয়। কিন্তু এদের প্রকৃতি থেকে আনুমানিক ধারণাগুলোকে কোনোক্রমেই প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করা যায় না। এগুলোর একমাত্র গুণ হচ্ছে, ঘটনাটি প্রকাশ করার জন্য নিজেদের উপযোগিতা। এগুলোই প্রতিবেদক অনুকল্প।"("Some hypothesis consist of assumptions as to the minute structure and operations of bodies. From the nature of the case these assumptions can never be proved by direct means. Their only merit is their suitability to express the phenomena. These are Representative Fictions. P1870, 132")

অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে বিষয়ে প্রকল্প গঠন করা হয় তার প্রকৃতি এমন হয় যে, প্রত্যক্ষভাবে বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না। এমতাবস্থায়, ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার জন্য এর উপযোগিতাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য বা গুণ হিসেবে কাজ করে। তবে উল্লেখ্য যে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় এমন কারণই শুধু 'বাস্তব কারণ' হবে এমন ধারণা করা যথার্থ নয়। কেননা বাস্তব কারণ বলতে এমন কারণের কথা নির্দেশ করা হয় যার মধ্যে আত্মবিরোধ নেই এবং যার অস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব। যেমন- শব্দ ও আলোর গতি ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা যদি ইথারের অস্তিত্বকে প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করি তাহলে এ প্রকল্পটি হবে একটি প্রতিবেদক অনুকল্প। কারণ ইথারকে আমরা সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। কিন্তু এর ব্যবহারিক উপযোগিতা লক্ষ্য করে আমরা পরোক্ষভাবে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি। ইথারের অস্তিত্ব আছে বলেই আমরা বেতার ও টেলিভিশনের সাহায্যে দূরের কথা শুনতে পাই এবং ছবি দেখতে পাই। সুতরাং প্রতিবেদক অনুকল্প কোনো অবস্থাতেই কাল্পনিক কারণ নয়, বরং এটি একটি বাস্তব কারণ।

৪। **সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত (Crucial Instance) :** কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করা যায় তাহলে সেই প্রকল্পগুলোকে প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্প বলে। এই প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বা যথার্থ প্রকল্প তা নির্ধারণ করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোনো ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য এই প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রকল্পকে বাছাই করে নিতে হয়। কারণ আমরা জানি, কোনো একটি বিশেষ ঘটনার একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে। এমতাবস্থায় কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পগুলোর মধ্যকার সংঘাত নিরসনে সাহায্য করে। এ জাতীয় দৃষ্টান্তকে বলা হয় সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত। সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রকল্পের সত্যতাকে প্রমাণ করতে এবং অন্যান্য প্রকল্পের সত্যতাকে অপ্রমাণ করতে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স (William Stanley Jevons) তাঁর *Elementary Lessons in Logic* গ্রন্থে বলেন, "চরম দৃষ্টান্ত যে শুধু একটিমাত্র প্রকল্পকে নিশ্চিত করে তাই নয়, অপরাপর প্রকল্পকে নাকচও করে" ("A crucial instance not only confirms one hypothesis but negates the others.")

চরম দৃষ্টান্ত বা সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত কথাটিকে রাস্তার মোড়ে স্থাপিত অঙ্গুলি সংকেত স্তম্ভের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কয়েকটি রাস্তার মিলনস্থলে স্থাপিত একটি অঙ্গলি সংকেত স্তম্ভ যেমন আমাদেরকে বলে দেয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে হলে কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হতে হবে, ঠিক তেমনি সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত আমাদেরকে বলে দেয় প্রতিযোগী প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে কোন্‌টি আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং কোন্‌টি বর্জন করতে হবে। যেমন- ফুলদানিতে একগুচ্ছ কৃত্রিম ফুলের সাথে যদি একটি সতেজ সুগন্ধী ফুল রাখা হয় তাহলে বোঝা যায় না যে কোন্‌টি আসল ফুল। কিন্তু এমন সময় একটি মৌমাছি উড়ে এসে যদি ফুলদানিতে রাখা একটি ফুলের উপর বসে , তাহলে এর ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি যে, ঐ ফুলটিই হবে আসল ফুল। আর আসল ফুল সম্পর্কে প্রকল্প গঠন করতে সাহায্যকারী উক্ত মৌমাছি হলো চরম দৃষ্টান্ত বা সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত।

৫। **সংকট উত্তরক পরীক্ষণ (Crucial Experiment) :** কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, এক্ষেত্রে একাধিক প্রকল্প প্রণয়ন করা যায় তাহলে সেই প্রকল্পগুলোকে প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্প বলে। এই প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক বা যথার্থ প্রকল্প তা নির্ধারণ করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কোনো ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের জন্য এই প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রকল্পকে বাছাই করে নিতে হয়। কারণ আমরা জানি, কোনো একটি বিশেষ ঘটনার একটি মাত্র কারণ থাকতে পারে। এমতাবস্থায় কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পগুলোর মধ্যকার সংঘাত নিরসনে সাহায্য করে। এ জাতীয় দৃষ্টান্তকে বলা হয় সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত। সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয়ের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। আর পরীক্ষণের মাধ্যমে যখন সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তখন তাকে সংকট উত্তরক পরীক্ষণ (Crucial Experiment) বলে। সংকট উত্তরক পরীক্ষণ প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রকল্পের সত্যতাকে প্রমাণ করতে এবং অন্যান্য প্রকল্পের সত্যতাকে অপ্রমাণ করতে সাহায্য করে। যেমন- কয়েকটি কাঁচের পাত্রের সবগুলোতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস আছে।

৬। **কাজ চালানো প্রকল্প (Working Hypothesis or Tentative Hypothesis) :** কোনো কোনো সময় আমাদেরকে এমন কতগুলো অভিজ্ঞতাপূর্ব ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় যে ঘটনাগুলো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অত্যন্ত জটিল। ফলে এ ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমরা কোনো যথার্থ প্রকল্প গঠন করতে পারি না। কিন্তু এদের ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদেরকে কোনো না কোনো প্রকল্প প্রণয়ন করতে হয়। তাই প্রকল্পের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও আমরা সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য একটি প্রকল্প গঠন করি। এ ধরনের প্রকল্পকেই বলা হয় কাজ চালানো প্রকল্প (Working Hypothesis or Tentative Hypothesis)। বস্তুত অজ্ঞাত ও জটিল ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো প্রকল্প গঠন করা সম্ভব হয় না বলেই কাজ চালানো প্রকল্প দিয়ে ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। তবে পরবর্তীতে যদি কোনো উন্নত প্রকল্প গঠন করা যায় তাহলে কাজ চালানো প্রকল্পটিকে বাতিল করে দেয়া হয়। কিন্তু যথার্থ প্রকল্প প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত সাময়িকভাবে এই কাজ চালানো প্রকল্পই আমাদের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যকে সফল করার দিকে নিয়ে যায়।

সুতরাং সম্ভাব্য বা নিশ্চিত ধারণার অভাবে যে আনুমানিক ধারণাকে অযথার্থ জেনেও সাময়িকভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাকে কাজ চালানো প্রকল্প বলে। যেমন- বিদ্যুতের বস্তুগত প্রকৃতি কী তা আমাদের জানা না থাকার কারণে এক্ষেত্রে যদি প্রকল্প গঠন করা হয় যে, 'বিদ্যুৎ হলো এক জাতীয় তরল পদার্থ' তাহলে বিদ্যুতের বস্তুগত প্রকৃতি নির্ণয় সংক্রান্ত এ প্রকল্পটি হবে একটি কাজ চালানো প্রকল্প। কারণ এ প্রকল্পটি সত্য হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম এবং প্রকৃত অর্থেই এ বিষয়টি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও নতুন। এ জাতীয় প্রকল্প সত্য হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম থাকে বলে এর তেমন কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। তবে যথার্থ প্রকল্প প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত সাময়িকভাবে এই কাজ চালানো প্রকল্পই অনুসন্ধানের কাজটিকে সামনের দিকে নিয়ে যায় বলে বৈধ প্রকল্পের অনুপস্থিতিতে এর গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না।

৭। **আরোহ সমন্বয় (Consilience of Induction) :** প্রকল্প প্রণয়নের একটি অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে আরোহ সমন্বয়। যুক্তবিদ হিউওয়েল সর্বপ্রথম প্রকল্প প্রমাণের মানদন্ড হিসেবে 'আরোহ সমন্বয়' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, যে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়, সেই ঘটনা ব্যাখ্যা করা ছাড়াও প্রকল্পটির মধ্যে যদি আরো কিছু ঘটনা ব্যাখ্যা করার শক্তি থাকে তাহলে তাকে 'আরোহ সমন্বয়' (Consilience of Induction) বলে। অর্থাৎ প্রথমে একটি বিশেষ ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্পটিকে প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, গৃহীত প্রকল্পটি সেই বিশেষ ঘটনাটি ছাড়াও আরো কিছু ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। কোনো প্রকল্পের এরূপ সমর্থনই হলো আরোহ সমন্বয়।

সুতরাং আরোহ সমন্বয়ের সংজ্ঞায় বলা যায়, যে বিশেষ ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্প গঠন করা হয়, প্রকল্পটি যদি সেই বিশেষ ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি অন্য কোনো ঘটনাকেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়, তাহলে গৃহীত প্রকল্পটির অন্যান্য ঘটনা ব্যাখ্যা করার সেই অতিরিক্ত শক্তিকেই বলা হয় আরোহ সমন্বয় (Consilience of Induction)। যেমন- বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিউটন প্রথমে মধ্যাকর্ষণ সূত্রটি প্রণয়ন করেছিলেন জড়বস্তু ভূমিতে পতনের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে, এ প্রকল্পটি জড়বস্তুর ভূমিতে পতনের কারণ ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি জোয়ার-ভাটা, গ্রহসমূহের গতি-প্রকৃতি, এগুলোর পারস্পরিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকার কারণেই মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সংক্রান্ত বিজ্ঞানী নিউটনের এ প্রকল্পটির মর্যাদা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে তা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বা সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্বে পরিণত হয়।

সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের সাথে এমন অনেক বিষয় জড়িত যেগুলো ছাড়া প্রকল্প এর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। এই বিষয়গুলোই যুক্তিবিদ্যায় প্রকল্প সংক্রান্ত কয়েকটি ধারণা হিসেবে পরিচিত। প্রকল্প সংক্রান্ত এ ধারণাগুলো হলো-পরীক্ষামূলক সমর্থন, বাস্তব কারণ, প্রতিবেদক অনুকল্প, সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত, সংকট উত্তরক পরীক্ষণ, কাজ চালানো প্রকল্প ও আরোহ সমন্বয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পরীক্ষামূলক সমর্থন কয় প্রকার?
(ক) দুই প্রকার (খ) তিন প্রকার
(গ) চার প্রকার (ঘ) পাঁচ প্রকার

২। কোনো বিশেষ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার জন্য গৃহীত প্রকল্পটির অন্যান্য ঘটনা ব্যাখ্যা করার অতিরিক্ত শক্তিকে বলা হয়–
(ক) প্রতিবেদক অনুকল্প (খ) পরীক্ষামূলক সমর্থন
(গ) বাস্তব কারণ (ঘ) আরোহ সমন্বয়

৩। একটি শিশু হারিয়ে গেলে তার কারণ হিসেবে যদি প্রকল্প গঠন করা হয় যে, তাকে ভূতে নিয়ে গিয়েছে, তাহলে গৃহীত প্রকল্পটি হবে–
(i) বাস্তব (ii) অবাস্তব
(iii) অযৌক্তিক

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৭ কারণ ও নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Cause and Law)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- কারণ ও নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কারণ ও নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

কারণ ও নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Cause and Law)

সাধারণত কোনো ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যুক্তিবিদগণ এই প্রকল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : ১। কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Agent); ২। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Law) এবং ৩। বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Collocation)। তবে কোনো কোনো যুক্তিবিদ বিশেষ করে যুক্তিবিদ ওয়েল্টন (Welton) প্রকল্পকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Law) এবং ২। কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Cause)। নিম্নে যুক্তিবিদ ওয়েল্টন (Welton) কে অনুসরণ করে এ দুই প্রকারের প্রকল্প ব্যাখ্যা করা হলো—

১। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Law) : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য অনেক সময় আমাদেরকে সেই ঘটনাটি কোন্ নিয়মে বা কোন্ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রকল্প গঠন করতে হয়। সাধারণত এ জাতীয় ঘটনার কর্তা বা কারক সম্পর্কে সব কিছু আমাদের জানা থাকে। কিন্তু কোন্ নিয়মে বা কোন্ পদ্ধতিতে কর্তা ক্রিয়াশীল হয় তা আমাদের জানা থাকে না। তাই ঘটনাটি কীভাবে বা কোন্ নিয়মে সংঘটিত হলো তা জানা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় যে প্রকল্প গঠন করা হয় তাই নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প। অতএব, যে প্রকল্পে কোনো নিয়ম কল্পনা করা হয় বা কোনো নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় তাকে নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Law) বলে।

উদাহরণস্বরূপ, বিজ্ঞানী নিউটন কর্তৃক মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের জন্য প্রণীত প্রকল্পটি হলো নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প। কারণ তিনি দেখলেন যে, একটি আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ল। এক্ষেত্রে আপেল হলো কর্তা। আর যে কারণে আপেলটি অন্যদিকে না গিয়ে মাটিতে পড়ল তাহলো এর নিয়ম। এই নিয়মটি বিজ্ঞানী নিউটনের জানা ছিল না। তাই তিনি এ নিয়ম আবিষ্কারের জন্য প্রকল্প গঠন করলেন যে, মাটিতে সম্ভবত এমন কোনো আকর্ষণ আছে যে কারণে আপেলটি অন্যদিকে না গিয়ে মাটিতে পড়েছে। এরপর এ নিয়ম সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটন গবেষণা করে তার মধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করেন। অতএব, এই মধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কারের পূর্বে নিউটন কর্তৃক যে প্রকল্প গঠন করা হয়েছিল তা নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প।

২। কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Cause) : অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, কোনো একটি ঘটনা কোন্ নিয়মে সংঘটিত হয়েছে তা স্পষ্ট হলেও কোন্ বিষয় দ্বারা ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে বা কে ঘটনাটি ঘটিয়েছে তা অস্পষ্ট থাকে। এমতাবস্থায় ঘটনা সংঘটনকারী বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। আর ঘটনা সংঘটনকারী বিষয় বা ব্যক্তি সম্পর্কে যে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় যুক্তিবিদগণ এর নাম দিয়েছেন কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প। অর্থাৎ যখন কোনো প্রকল্পকে ব্যাখ্যা করার জন্য এর কর্তা বা কারক হিসেবে কোনো বিষয় বা ব্যক্তিকে কল্পনা করা হয়, তাকে কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Agent) বলা হয়। অন্যদিকে বিষয় বা বস্তুসমূহের যে পারস্পরিক সহ-অবস্থানের কারণে ঘটনা ঘটে যুক্তিবিদগণ সে সম্পর্কে গঠিত প্রকল্পের নাম দিয়েছেন বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Collocation)। কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে, সংঘটিত ঘটনাটির কর্তা ও নিয়ম সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও যথার্থভাবে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কোন্ ধরনের পরিস্থিতির কারণে বা বিষয়সমূহের

কোন্ ধরনের বিন্যাস ও পারস্পরিক অবস্থানের কারণে ঘটনাটি সংঘটিত হয় তা নির্ণয় করতে হয়। কিন্তু কোনো কোনো যুক্তিবিদ কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প ও বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্পকে একই কারণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, কর্তা ও বিন্যাসের যোগফলই হলো কারণ। কেননা কারণের নির্দেশ এক সাথে কর্তা ও বস্তুর নির্দেশ করে। তাই বস্তু বিন্যাসকে তাঁরা প্রকল্পের পৃথক একটি শ্রেণি বলে মনে করেন না। কারণ সংক্রান্ত প্রকল্পের উল্লেখ করলেই বস্তু বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প উল্লিখিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, নেপচুন গ্রহ কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্পের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে এটিকে কারণ সংক্রান্ত প্রকল্পের একটি যথার্থ দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কেননা এ গ্রহটি আবিষ্কারের পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করেন যে, ইউরোনাস গ্রহের গতিপথ পূর্বের চেয়ে কিছুটা বেঁকে গেছে। গ্রহটি এর গতিপথ থেকে সরে যাওয়ার কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ প্রকল্প গঠন করলেন যে, সম্ভবত অন্য কোনো গ্রহের আকর্ষণে এর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছে। এরপর এ প্রকল্প অনুসারে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে দেখা গেল যে, সত্যি সত্যিই আরেকটি গ্রহের আকর্ষণের ফলে ইউরোনাস গ্রহের গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ এর নাম দেন নেপচুন গ্রহ। এক্ষেত্রে প্রকল্পটি একই সাথে কর্তা হিসেবে 'নেপচুন গ্রহ' ও বস্তু বিন্যাস হিসেবে ' ইউরোনাস গ্রহের গতিপথ পূর্বের চেয়ে কিছুটা বেঁকে যাওয়া' উল্লেখ করছে। সুতরাং নেপচুন গ্রহটি আবিষ্কার সম্পর্কিত প্রকল্পটি ছিল একটি কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প, কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প নয়।

কিন্তু প্রকল্পকে এভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা কর্তা ও বস্তু বিন্যাসকে যুক্তভাবে সমর্থন করা যায় না। কর্তা ও বস্তু বিন্যাসকে যদি যুক্তভাবে কারণ বলে সমর্থন করা হয় তাহলে কর্তা যে নিয়মের মাধ্যমে কার্যকর হয় তাকেও কারণ হিসেবে স্বীকার করতে হয়। কেননা কর্তা যে নিয়মে কার্যকর হয়, কোনো এক সময় সে নিয়মটিই কারণ বলে গণ্য হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ : যুক্তিবিদ ওয়েল্টন কর্তৃক প্রকল্পের শ্রেণিকরণটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সাধারণত কোনো ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যুক্তিবিদগণ এই প্রকল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প; নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প এবং বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প। তবে যুক্তিবিদ ওয়েল্টন (Welton) প্রকল্পকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা- নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প এবং কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প । তাঁর মতে, কর্তা ও বিন্যাসের যোগফলই হলো কারণ। কেননা কারণের নির্দেশ এক সাথে কর্তা ও বস্তুর নির্দেশ করে। তাই বস্তু বিন্যাসকে তিনি প্রকল্পের পৃথক একটি শ্রেণি বলে মনে করেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদ ওয়েল্টন প্রকল্পকে কয় শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন?
(ক) দুই শ্রেণিতে (খ) তিন শ্রেণিতে
(গ) চার শ্রেণিতে (ঘ) পাঁচ শ্রেণিতে

২। যে প্রকল্পে কোনো নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় তাকে বলে—
(ক) বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (খ) কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প
(গ) নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (ঘ) কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প

৩। যুক্তিবিদ ওয়েল্টন কর্তৃক প্রকল্পের শ্রেণিকরণটির অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো-
(i) নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (ii) বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প
(iii) কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৮ ব্যাখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক প্রকল্প (Explanatory and Descriptive Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্যাখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক প্রকল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ব্যাখ্যামূলক ও বর্ণনামূলক প্রকল্পের বৈসাদৃস্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প ও বর্ণনামূলক প্রকল্প (Descriptive and Explanatory Hypothesis)

সাধারণত কোনো ঘটনা বা বিষয়ের মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যুক্তিবিদগণ এই প্রকল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা: ১। কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Agent); ২। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Law) এবং ৩। বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Collocation)। তবে কোনো কোনো যুক্তিবিদ প্রকল্পকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা- নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প এবং কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প। প্রকল্পের এ শ্রেণিকরণটিকেই অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প (Explanatory Hypothesis) ও বর্ণনামূলক প্রকল্প (Descriptive Hypothesis) এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কারণ সংক্রান্ত প্রকল্পকে বলা হয় ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প এবং নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পকে বলা হয় বর্ণনামূলক প্রকল্প। নিম্নে এ দুই প্রকারের প্রকল্প সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো-

১। ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প (Explanatory Hypothesis) : আমরা জানি যে, যখন কোনো প্রকল্পকে ব্যাখ্যা করার জন্য এর কর্তা বা কারক হিসেবে কোনো বিষয় বা ব্যক্তিকে কল্পনা করা হয় তখন তাকে কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Agent) বলা হয়। অন্যদিকে বিষয় বা বস্তুসমূহের যে পারস্পরিক সহ-অবস্থানের কারণে ঘটনা ঘটে যুক্তিবিদগণ সে সম্পর্কে গঠিত প্রকল্পের নাম দিয়েছেন বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প (Hypothesis Concerning Collocation)। কিন্তু কোনো কোনো যুক্তিবিদ কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প ও বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্পকে একই কারণের অন্তর্ভুক্ত করে এর নাম দিয়েছেন কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প। আর যুক্তিবিদগণ এই কারণ সংক্রান্ত প্রকল্পেরই আরেকটি ভিন্ন নাম দিয়েছেন ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প। অর্থাৎ তাঁদের মতে, কর্তা ও বিন্যাসের যোগফলই হলো কারণ যার সাহায্যে কোনো বিশেষ ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। তাই কারণ ও ব্যাখ্যর মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। কেননা কারণ নির্দেশ করতে হলে ঘটনার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় বা কেবলমাত্র ঘটনার যথার্থ ব্যাখ্যর সাহায্যেই কারণ নির্ণয় করা যায়। সুতরাং কারণ সম্পর্কিত প্রকল্পের পিছনে আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, তাহলো ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা। আর এ জন্যই কারণ সংক্রান্ত প্রকল্পের আর এক নাম হলো ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প।

সুতরাং কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে এর কারণ আবিষ্কার করার জন্য আমরা যে প্রকল্প প্রণয়ন করি তাই ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প। অর্থাৎ কোনো ঘটনার কারণ আবিষ্কার করাই হলো ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা। যেমন, চন্দ্রগ্রহণের কারণ আবিষ্কারের জন্য যদি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় যে, চন্দ্রের উপর সূর্যের আলোক থেকে উৎপন্ন পৃথিবীর ছায়া পতনই চন্দ্রগ্রহণের কারণ, তাহলে এ সংক্রান্ত গৃহীত প্রকল্পটিই হবে একটি ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প। কেননা এ প্রকল্পটি চন্দ্রগ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম।

২। বর্ণনামূলক প্রকল্প (Descriptive Hypothesis) : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য অনেক সময় আমাদেরকে সেই ঘটনাটি কোন্ নিয়মে বা কোন্ প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রকল্প গঠন করতে হয়। সাধারণত এ জাতীয় ঘটনার কর্তা বা কারক সম্পর্কে সব কিছু আমাদের জানা থাকে। কিন্তু কোন্ নিয়মে বা কোন্ পদ্ধতিতে কর্তা ক্রিয়াশীল হয় তা আমাদের জানা থাকে না। তাই ঘটনাটি কীভাবে বা কোন্ নিয়মে সংঘটিত হলো তা জানা

অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় যে প্রকল্প গঠন করা হয় তাই নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প। আর যুক্তিবিদগণ এই নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পেরই আরেকটি ভিন্ন নাম দিয়েছেন বর্ণনামূলক প্রকল্প (Descriptive Hypothesis)। অতএব, যে প্রকল্পে কোনো নিয়ম কল্পনা করা হয় বা কোনো নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয় তাকে নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প বা বর্ণনামূলক প্রকল্প বলে। কেননা নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য থাকে, কারণটি যে নিয়মে কাজ করে সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেয়া। আর এ জন্যই নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পের আর এক নাম হলো বর্ণনামূলক প্রকল্প।

সুতরাং কোনো কারণ নির্ণয় করা বর্ণনামূলক প্রকল্পের কাজ নয়। এ জাতীয় প্রকল্পের মূল কাজ হলো একটি কারণ কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া। যেমন, কোনো পণ্যের বাজার খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হলে উৎপাদনকারী কোন কৌশল অবলম্বন করে তা করেছে প্রথমেই তা আমরা জানতে পারি না। এক্ষেত্রে আমরা পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারি। যদি ধারণা করা হয় যে, উৎপাদনকারী হয়তো গণমাধ্যমে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানের বিবরণ সম্বলিত বিজ্ঞাপণ সম্প্রচার করেছেন। আর পণ্যটি ভালোভাবে বাজারজাতকরণের জন্য তিনি হয়তো দক্ষ জনবল নিয়োগ করেছেন। ফলে তাঁর উৎপাদিত পণ্যের বাজার খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। তাহলে এ প্রকল্পটি হবে একটি বর্ণনামূলক প্রকল্প। কারণ এটি পণ্যটির বাজারজাতকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি বর্ণনা দিতে সক্ষম।

শিক্ষার্থীর কাজ : ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প ও বর্ণনামূলক প্রকল্প সম্পর্কে ২০টি বাক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদগণ প্রকল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প; নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প এবং বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প। তবে কোনো কোনো যুক্তিবিদ প্রকল্পকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা- নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্প এবং কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প। প্রকল্পের এ শ্রেণিকরণটিকেই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কারণ সংক্রান্ত প্রকল্পকে বলা হয় ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প এবং নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পকে বলা হয় বর্ণনামূলক প্রকল্প। কেননা কারণ সম্পর্কিত প্রকল্পের পিছনে আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাহলো ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা। আর নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য থাকে কারণটি যে নিয়মে কাজ করে সে সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিয়ম সংক্রান্ত প্রকল্পের আর এক নাম হলো—
(ক) বর্ণনামূলক প্রকল্প (খ) ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প
(গ) কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প (ঘ) বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প

২। যুক্তিবিদগণ কর্তা সংক্রান্ত প্রকল্প ও বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্পকে একই কারণের অন্তর্ভুক্ত করে এর নাম দিয়েছেন -
(ক) বর্ণনামূলক প্রকল্প (খ) ব্যাখ্যামূলক প্রকল্প
(গ) কারণ সংক্রান্ত প্রকল্প (ঘ) বিন্যাস সংক্রান্ত প্রকল্প

৩। কারণ সম্পর্কিত প্রকল্পের পিছনে যে মূল উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাহলো—
(i) ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা (ii) ঘটনাটির সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেয়া
(iii) ঘটনাটির সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৯ বৈধ বা সুসংগত প্রকল্পের শর্তাবলি (Conditions of Valid or Legitimate Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বৈধ প্রকল্পের স্বরূপ জানতে পারবেন।
- বৈধ বা সুসংগত প্রকল্পের শর্তাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বৈধ বা সুসংগত প্রকল্পের শর্তাবলি (Conditions of Valid or Legitimate Hypothesis)

আমরা জানি যে, প্রকল্প হলো একটি প্রাথমিক আনুমানিক ধারণা। কিন্তু যেকোনো আনুমানিক ধারণাকেই যথার্থ প্রকল্প বলা যায় না। বৈধ বা সুসংগত হতে হলে প্রকল্পকে বেশ কিছু শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। সাধারণত একটি প্রকল্পকে বৈধ হতে হলে যে সব শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হয় সেগুলো নিম্নরূপ:

১। **সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রকাশক হতে হবে :** বৈধ প্রকল্পকে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রকাশক হতে হবে। প্রকল্পের এ শর্তানুসারে যে বিষয় সম্পর্কে প্রকল্প প্রণয়ন করা হবে, সে বিষয় সম্পর্কিত প্রকল্পকে সুনির্দিষ্ট ধারণার ভিত্তিতে প্রকাশ করতে হবে। কেননা, প্রকল্প যদি অনির্দিষ্ট ও অস্পষ্ট হয় তাহলে এর সাহায্যে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঘটনা ব্যাখ্যা করা কিংবা এর কারণ বা কার্য নির্ণয় করা যায় না। এ জন্যই অনির্দিষ্ট বক্তব্য বা ধারণা প্রকাশক প্রকল্পকে বৈধ বলে বিবেচনা করা হয় না। যেমন- ভূমিকম্পের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে যদি কেউ প্রকল্প গঠন করেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কোনো গোলযোগের ফলে ভূমিকম্প হয়, তাহলে তার এ প্রকল্পটি অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হবে। বাস্তবে এ জাতীয় প্রকল্পের কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। তাই ভূমিকম্পের কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত প্রকল্প গঠনের সময় স্পষ্ট করে বলতে হবে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গোলযোগের প্রকৃত স্বরূপ কী এবং তা কীভাবে ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঘটায়।

২। **যুক্তিসঙ্গত ধারণার প্রকাশক হতে হবে :** প্রকল্প যদি যুক্তিসঙ্গত না হয় তাহলে এর দ্বারা কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা করা বা উক্ত ঘটনাবলির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। তাই প্রকল্পকে বৈধ হতে হলে তাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে যৌক্তিক ধারণা প্রকাশক হতে হবে। যেমন- ভূমিকম্পের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে যদি কেউ প্রকল্প গঠন করেন যে, ভূ-অভ্যন্তরে এমন একজন দেবতা আছেন যিনি অসন্তুষ্ট হলে ভূমিকম্পনের সৃষ্টি করে ভূপৃষ্ঠকে এলোমেলো করে দেন, তাহলে এটি হবে একটি অযৌক্তিক প্রকল্প। তাই এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। **প্রাসঙ্গিক হতে হবে :** এ শর্তানুসারে যে ঘটনা বা বিষয়ের কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় সেই বিষয়ের সাথে প্রকল্পটিকে প্রাসঙ্গিক হতে হবে। প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক না হলে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হবে না। যেমন- ঢাকা শহরের কোনো রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হওয়ার কারণ হিসেবে যদি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয় যে, দূরবর্তী কোনো গ্রামে বসবাসকারী লোকজন কর্তৃক ব্যবহৃত যানবাহনই এর জন্য দায়ী, তাহলে যানজট সংক্রান্ত এ ব্যাখ্যাটি গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ ঢাকা শহরের কোনো রাস্তায় যানজট সৃষ্টি হওয়ার সাথে দূরবর্তী কোনো গ্রামে বসবাসকারী লোকজন কর্তৃক ব্যবহৃত যানবাহনের বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু যদি এ কথা বলা হতো যে, ঢাকায় বসবাসকারী লোকজন কর্তৃক অতিমাত্রায় ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবহার করাই এর জন্য দায়ী, তাহলে এ প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক হতো।

৪। **সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণার প্রকাশক হতে হবে :** বৈধ প্রকল্পকে অবশ্যই একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণার প্রকাশক হতে হবে। অর্থাৎ প্রকল্পটিকে এমন হতে হবে যেন আলোচ্য ঘটনার সাথে প্রকল্পটির বাস্তব সামঞ্জস্য থাকে। কারণ সামঞ্জস্যহীন কোনো ধারণার সাহায্যে কোনো জ্ঞাত কার্যের কারণ বা কোনো জ্ঞাত কারণের কার্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন- একজন অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার ফলে অধিকতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে

চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে ওষুধ সেবন বন্ধ করে দেন। কিন্তু কিছু দিন পর দেখা গেল যে, তিনি পূর্বের তুলনায় সুস্থ রয়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি যদি প্রকল্প গ্রহণ করেন যে, চিকিৎসা থেকে বিরত থাকার ফলেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন, তাহলে তার গৃহীত প্রকল্পটি হবে সামঞ্জস্যহীন ধারণার প্রকাশক। আর এ কারণেই এটিকে বৈধ প্রকল্প বলা যাবে না।

৫। **প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে :** আমরা জানি যে, প্রতিষ্ঠিত সত্যের বা তত্ত্বের মর্যাদা সব সময়ই প্রকল্পের তুলনায় বেশি। তাই কোনো প্রকল্প যদি প্রমাণিত বা স্বীকৃত সত্যের বিরোধী হয়, তাহলে তাকে বৈধ বলে বিবেচনা করা যাবে না। তাই কোনো প্রকল্পকে বৈধ হতে হলে যেসব সত্য বা নিয়ম ইতোপূর্বে বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত এবং গৃহীত হয়েছে, সেসব নিয়ম বা সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। কেননা গৃহীত প্রকল্পটি যদি পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত কোনো সত্য বা নিয়মের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তবে প্রকল্পটি অসত্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

তবে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের এ শর্তটি একটি সতর্কতামূলক পদক্ষেপ মাত্র। কারণ প্রতিষ্ঠিত নিয়মও অনেক সময় ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। যেমন, জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমী এক সময় প্রমাণ করে দেখান যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। তখন এটি ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম। কিন্তু পরবর্তীতে কোপার্নিকাস প্রকল্প গঠন করেন যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। কোপার্নিকাসের এই নতুন প্রকল্পটি শেষ পর্যন্ত একটি সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্বের মর্যাদা লাভ করে। তাই এ শর্তটির তাৎপর্য হলো প্রকল্প প্রণয়নের সময় অত্যন্ত তৎপর থাকতে হবে এবং নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলে প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অগ্রাহ্য করে প্রকল্প গঠন করা যাবে না।

৬। **যাচাইযোগ্য হতে হবে :** কোনো প্রকল্প বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক বা না হোক তাকে অবশ্যই যাচাইযোগ্য হতে হবে। তাই কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য এমনভাব প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে যাতে এটিকে বাস্তবের সাথে মিলিয়ে দেখার সুযোগ থাকে। কোনো প্রকল্প যাচাই করার জন্য হয় আমরা একে নিরীক্ষণ বা পরীক্ষণের সাহায্যে সরাসরি বাস্তবের সাথে মিলিয়ে নিতে পারি অথবা এর ফলাফল সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্ত অনুমান করে একে বাস্তবের সাথে মিলিয়ে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে পারি। যে প্রকল্পকে এভাবে যাচাই করা যায় না তার কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য থাকে না বলে তাকে বৈধ প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। যেমন- যদি প্রকল্প গঠন করা হয় যে, দেশের যে অঞ্চলে প্রেতাত্মা ভর করে সে অঞ্চলেই কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত এ ধরনের প্রকল্প যাচাইযোগ্য হবে না বলে তা অবৈধ হবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, যাচাইযোগ্য বলতে কেবল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাইযোগ্য হওয়াকে বুঝায় না। বরং যৌক্তিকভাবে যাচাইযোগ্য হওয়াকেও বুঝায়। কেননা প্রকৃতিতে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে যাচাইযোগ্য না হলেও পরোক্ষভাবে বা যৌক্তিকভাবে যাচাইযোগ্য হতে পারে। যুক্তিবিদ আলেকজান্ডার বেইন (Alexander Bain) এর মতে, কিছু প্রকল্প বস্তুর সূক্ষতম গঠন, কার্যপ্রণালী বা এর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এদের প্রকৃতি এমনই যে, তা থেকে প্রকল্পগুলোকে কোনোভাবেই প্রত্যক্ষরূপে প্রমাণ করা যায় না। বরং এদের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো ঘটনা প্রকাশের জন্য নিজেদের উপযোগিতা। এরূপ সূক্ষ্ম প্রকৃতি সম্পন্ন বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কিত প্রকল্প হলো প্রতিবেদক অনুকল্প।

৭। **সংশ্লিষ্ট ঘটনা ব্যাখ্যায় পর্যাপ্ত হতে হবে :** বৈধ প্রকল্পের একটি অন্যতম শর্ত হলো সংশ্লিষ্ট ঘটনা ব্যাখ্যায় একে পর্যাপ্ত হতে হবে। এর অর্থ হলো যে বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হবে, প্রকল্পটি সে বিষয়কে যেন সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। তাই কোনো ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে যদি প্রকল্পটি সেই ঘটনাকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন- হঠাৎ করে বাজারে চালের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় আমরা যদি এই প্রকল্প গঠন করি যে, উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এমনটি ঘটেছে, তাহলে প্রকল্পটিকে ঘটনা ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত বলা যায় না। কেননা শুধু উৎপাদন হ্রাস নয়, সেই সঙ্গে অসৎ ব্যবসায়ী কর্তৃক কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা, পাচার করে দেয়া ইত্যাদি কারণেও চালের মূল্য বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু গৃহীত প্রকল্পটির মধ্যে এ দিকগুলো নির্দেশ করা হয়নি বলে তা ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই চালের মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত এ প্রকল্পটি বৈধ নয়।

৮। **বাস্তব কারণ সম্মত হতে হবে :** যেকোনো প্রকল্প বৈধ হওয়ার একটি অন্যতম শর্ত হলো এর যাচাইযোগ্যতা। কিন্তু কোনো প্রকল্পের বিষয় যদি অতিপ্রাকৃতিক কোনো কিছু হয়, তাহলে তা কোনোভাবেই যাচাইযোগ্য হবে না। তাই যাচাইযোগ্য হওয়ার প্রয়োজনেই প্রকল্পকে অবশ্যই বাস্তব কারণসম্মত হতে হবে। আর বাস্তব কারণ কথাটির অর্থ হলো যথার্থ কারণ বা অস্তিত্বশীল কারণ। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোনো প্রকল্পকে যাচাইযোগ্য বলে বিবেচনা করার অর্থ এই নয় যে, তা কেবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাইযোগ্য। বরং কোনো প্রকল্পকে যাচাইযোগ্য বলার অর্থ হলো, হয় তা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে যাচাইযোগ্য, না হয় উপযোগিতার ভিত্তিতে পরোক্ষভাবে যাচাইযোগ্য। যেমন- একটি শিশু হারিয়ে গেলে কেউ যদি ধারণা করে যে, শিশুটিকে ভূতে নিয়ে গেছে, তাহলে তার কল্পিত কারণটি একটি বাস্তব কারণ নয়। কেননা, অদ্যাবধি ভূত বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক যদি শব্দ চলাচলের কারণ হিসেবে ইথারের অস্তিত্ব কল্পনা করেন, তবে তার কল্পিত কারণটি হবে একটি বাস্তব কারণ। কেননা, ইথারের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে প্রমাণ করা যায়।

৯। **আত্মসঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে :** বৈধ প্রকল্পকে অবশ্যই আত্মসঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, প্রকল্পে কোনো আত্মবিরোধ থাকা চলবে না। সাধারণত কোনো প্রকল্প আত্মবিরোধী হওয়া বলতে বোঝায় ঘটনার জন্য গৃহীত প্রকল্প এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা পরস্পর বিরোধী হওয়াকে। যেমন- কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় ভালো ফলাফল লাভের কারণ হিসেবে যদি প্রকল্প করা হয় যে, সে পড়ালেখায় খুবই অমনোযোগী ছিল বলেই পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে এ প্রকল্পটি আত্মবিরোধী হবে। কারণ এখানে আলোচ্য ঘটনা ও গৃহীত প্রকল্প পরস্পর বিরোধী। এ জাতীয় প্রকল্পের কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই। তাই কোনো প্রকল্পকে বৈধ হতে হলে তার সাথে আলোচ্য ঘটনার কোনো বিরোধ থাকা যাবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ : যে শর্তগুলো পূরণের ফলে প্রকল্প বৈধ হয় সেগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বৈধ হতে হলে প্রকল্পকে বেশ কিছু শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। সাধারণত একটি প্রকল্পকে বৈধ হতে হলে যে সব শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হয় সেগুলো হলো- বৈধ প্রকল্পকে সুনির্দিষ্ট ধারণার প্রকাশক হতে হবে, যুক্তিসঙ্গত ধারণার প্রকাশক হতে হবে, প্রাসঙ্গিক হতে হবে, সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণার প্রকাশক হতে হবে, প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, যাচাইযোগ্য হতে হবে, সংশ্লিষ্ট ঘটনা ব্যাখ্যায় পর্যাপ্ত হতে হবে, বাস্তব কারণ সম্মত হতে হবে এবং আত্মসঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। যেকোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বা যেকোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে প্রকল্প গঠনের সময় এসব শর্ত সতর্কতার সাথে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনো শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় ভালো ফলাফল লাভের কারণ হিসেবে যদি প্রকল্প করা হয় যে, সে পড়ালেখায় খুবই অমনোযোগী ছিল বলেই পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, তাহলে এ প্রকল্পটি হবে-
(ক) প্রাসঙ্গিক (খ) আত্মসঙ্গতিপূর্ণ
(গ) আত্মবিরোধী (ঘ) সামঞ্জস্যপূর্ণ

২। ভূমিকম্পের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে যদি কেউ প্রকল্প গঠন করেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ কোনো গোলযোগের ফলে ভূমিকম্প হয়, তাহলে তার এ প্রকল্পটি হবে-
(ক) সঙ্গতিপূর্ণ (খ) অনির্দিষ্ট
(গ) প্রাসঙ্গিক (ঘ) আত্মবিরোধী

৩। কোনো বৈজ্ঞানিক যদি শব্দ চলাচলের কারণ হিসেবে ইথারের অস্তিত্ব কল্পনা করেন, তবে তা হবে-
(i) বাস্তব কারণ (ii) যাচাইযোগ্য
(iii) সঙ্গতিপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.১০ প্রকল্পের প্রমাণ (Proofs of Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রকল্প প্রমাণের উপায়সমূহ জানতে পারবেন।
- প্রকল্পের প্রমাণগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রকল্পের প্রমাণ (Proofs of Hypothesis)

পূর্বোক্ত পাঠ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, কতিপয় শর্ত পালন করলেই একটি প্রকল্প যথার্থ বা সঙ্গত প্রকল্পরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু যথার্থ বলে বিবেচিত হওয়ার পরও প্রকল্পকে আবার বেশ কয়েকটি পরীক্ষা বা প্রমাণের সম্মুখীন হতে হয়। আর এই পরীক্ষাসমূহ যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হতে পারলেই একটি সুসঙ্গত প্রকল্প একটি নিয়ম বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বে পরিণত হয়। প্রকল্পকে প্রমাণ করার উপায়সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো-

১। **সমর্থন বা যাচাইকরণ :** কোনো প্রকল্প প্রকৃত অর্থেই বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কী-না বা প্রকল্পটি যথার্থ কী-না তা প্রমাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ড হলো সমর্থন বা যাচাইকরণ (Verification)। সাধারণত যে মানদন্ডের ভিত্তিতে কোনো প্রকল্প বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কী-না তা নির্ধারণ করা হয়, তাকে সমর্থন বা যাচাইকরণ বলে। তবে কোনো প্রকল্প বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক বা না হোক তাকে অবশ্যই যাচাইযোগ্য হতে হবে। সমর্থন বা যাচাইকরণ প্রক্রিয়া দু'ভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে। যথা :

ক. প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ (Direct Verification) ও

খ. পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ (Indirect Verification)।

ক. **প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ (Direct Verification) :** যখন কোনো প্রকল্পকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাচাই করা হয় তখন তাকে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ (Direct Verification) বলে। প্রত্যক্ষ সমর্থন আবার দুই প্রকার। যথা- i. নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ এবং ii. পরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ ।

i. **নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ :** যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকল্পকে যাচাই বা সমর্থন করা হয় তখন তাকে নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ বলে। যেমন- কক্ষপথ থেকে বুধ গ্রহের বিচ্যুতির কারণ হিসেবে বৈজ্ঞানিকগণ বুধ গ্রহের আশেপাশে অপর একটি অজানা গ্রহের কল্পনা করেন। এরপর একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যখন বৃহস্পতি গ্রহটি নিরীক্ষণ করেন, তখন এ প্রকল্পটি নিরীক্ষণের সাহায্যে সমর্থিত হয়। তাই এ সমর্থনকে বলা হয় নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ ।

ii. **পরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ :** যখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রকল্পকে যাচাই বা সমর্থন করা হয় তখন তাকে পরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ বলে। যেমন- বায়ুমন্ডল থেকে সংগৃহীত অক্সিজেনর ওজন অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত অক্সিজেনের ওজনের চেয়ে ভারী হওয়ায় বৈজ্ঞানিকগণ প্রকল্প গঠন করলেন যে, বায়ুমন্ডলের অক্সিজেনের সাথে অন্য কোনো গ্যাস মিশ্রিত আছে। এ প্রকল্পটি পরীক্ষণের সাহায্যে সমর্থিত হয়েছে বলে এটি হলো পরীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ ।

খ। **পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ (Indirect Verification) :** কোনো কোনো প্রকল্প প্রমাণের ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়া যায় না। তখন প্রকল্পকে অবরোহ পদ্ধতিতে যৌক্তিকভাবে যাচাই করতে হয়। প্রকল্পকে এভাবে

যাচাই করার প্রক্রিয়াকে প্রকল্প প্রমাণের পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ বলে। পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ আবার দুই প্রকার। যথা- i. অবরোহমূলক পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ এবং ii. ঘটনা সংকলনের সাহায্যে পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ।

i. **অবরোহমূলক পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ :** যুক্তির অবরোহমূলক প্রক্রিয়ায় যখন কোনো প্রকল্পকে যাচাই করা হয় তখন তাকে প্রকল্পের অবরোহমূলক পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ বলে। যেমন-'বায়ুমন্ডলের চাপই চাপমান যন্ত্রের পারদ উত্থান-পতনের কারণ' টরিসিলীর এ প্রকল্পটি প্যাসকেল অবরোহ অনুমান দ্বারা পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থন করে সিদ্ধান্ত অনুমান করেন যে, যেখানে বায়ুমন্ডলের চাপ কম সেখানে পারদের উত্থানও কম। এরপর তিনি একটি চাপমান যন্ত্র পর্বত চূড়ায় নিয়ে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তটি যাচাই ও প্রমাণ করেন। এ প্রক্রিয়ায় পরোক্ষভাবে টরিসিলীর প্রকল্পটি বিজ্ঞানী প্যাসকেল কর্তৃক অবরোহ পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে সমর্থিত হয়।

ii. **ঘটনা সংকলনের সাহায্যে পরোক্ষ সমর্থন বা যাচাইকরণ :** যখন কোনো প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ঘটনাকে সংকলন করে পরোক্ষভাবে প্রকল্পকে প্রমাণ করা হয় তখন তাকে ঘটনা সংকলনের সাহায্যে পরোক্ষ সমর্থন বলে। যেমন- ইথারের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করা যায় না। কিন্তু এ সম্পর্কিত প্রকল্প রেডিও ও টেলিভিশনের উপযোগিতা দ্বারা সমর্থিত হয়। কারণ ইথারের সাহায্যে রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা ছবি দেখতে পাই ও কথা শুনতে পাই। তাই এ প্রকল্পটি ঘটনা সংকলনের সাহায্যে পরোক্ষভাবে সমর্থিত।

২। **একমাত্র প্রকল্প :** যুক্তিবিদগণের মতে, কোনো বিশেষ ঘটনা প্রমাণ করার জন্য যে প্রকল্প গঠন করা হয় সেই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটিকে 'একমাত্র প্রকল্প' হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গেলে একাধিক প্রকল্প পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় কোন্ প্রকল্পটি যথার্থভাবে ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারবে আর কোন্টি তা পারবে না তা নির্ধারণ করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে যে প্রকল্পটি উক্ত ঘটনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অন্যান্য সকল সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পকে অপ্রমাণ করে নিজেকে অনন্য বা একমাত্র ব্যাখ্যাকারী হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয় তাকে 'একমাত্র প্রকল্প' বলে। আর যে দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পসমূহ পরিহার করে অনন্য বা একমাত্র প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তাকে সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত বলে। সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত আবার দু'প্রকারের হতে পারে। যথা : ক. চরম দৃষ্টান্ত ও খ. চরম পরীক্ষণ

ক. **চরম দৃষ্টান্ত :** সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত যখন প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরীক্ষণের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয় তাকে চরম দৃষ্টান্ত বলে। যেমন- ফুলদানিতে একগুচ্ছ কৃত্রিম ফুলের সাথে যদি একটি সতেজ সুগন্ধী ফুল রাখা হয় তাহলে বোঝা যায় না যে কোন্টি আসল ফুল। কিন্তু এমন সময় একটি মৌমাছি উড়ে এসে যদি ফুলদানিতে রাখা একটি ফুলের উপর বসে, তাহলে এর ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করতে পারি যে, ঐ ফুলটিই হবে আসল ফুল। আর আসল ফুল সম্পর্কে প্রকল্প গঠন করতে সাহায্যকারী উক্ত মৌমাছি হলো চরম দৃষ্টান্ত।

খ. **চরম পরীক্ষণ :** সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ উভয়ের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। পরীক্ষণের মাধ্যমে যখন সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তখন তাকে চরম পরীক্ষণ বলে। সংকট উত্তরক পরীক্ষণ প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে একটি প্রকল্পের সত্যতাকে প্রমাণ করতে এবং অন্যান্য প্রকল্পের সত্যতাকে অপ্রমাণ করতে সাহায্য করে। যেমন- কয়েকটি কাঁচের পাত্রের সবগুলোতে অক্সিজেন ও শুধু একটিতে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে। কিন্তু কোন্ পাত্রে হাইড্রোজেন আছে তা জানা নেই। তবে আমরা এটি জানি যে, অক্সিজেন নিজে দাহ্য না হলেও হাইড্রোজেন নিজে দাহ্য। তাই একটি জ্বলন্ত কাঠি পাত্রগুলোর মুখে ধরলে যেটিতে আগুন ধরে যাবে সেটিই হবে হাইড্রোজেন। এক্ষেত্রে জ্বলন্ত কাঠি দিয়ে অগ্নি সংযোগের নির্ধারক দৃষ্টান্তটিই হলো 'চরম পরীক্ষণ'।

৩। **আরোহ সমন্বয় (Consilience of Induction) :** প্রকল্প প্রণয়নের একটি অন্যতম প্রমাণ হচ্ছে আরোহ সমন্বয়। যুক্তিবিদ হিউওয়েল সর্বপ্রথম প্রকল্প প্রমাণের মানদন্ড হিসেবে 'আরোহ সমন্বয়' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, যে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়, সেই ঘটনা ব্যাখ্যা করা ছাড়াও প্রকল্পটির মধ্যে যদি আরো কিছু ঘটনা ব্যাখ্যা করার শক্তি থাকে তাহলে তাকে 'আরোহ সমন্বয়' (Consilience of Induction) বলে। অর্থাৎ প্রথমে একটি বিশেষ ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্পটিকে প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, গৃহীত

প্রকল্পটি সেই বিশেষ ঘটনাটি ছাড়াও আরো কিছু ঘটনা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। কোনো প্রকল্পের এরূপ সমর্থনই হলো আরোহ সমন্বয়।

সুতরাং আরোহ সমন্বয়ের সংজ্ঞায় বলা যায়, যে বিশেষ ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্প গঠন করা হয়, প্রকল্পটি যদি সেই বিশেষ ঘটনাটি ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি অন্য কোনো ঘটনাকেও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়, তাহলে গৃহীত প্রকল্পটির অন্যান্য ঘটনা ব্যাখ্যা করার সেই অতিরিক্ত শক্তিকেই বলা হয় আরোহ সমন্বয়। যেমন- বিশিষ্ট বিজ্ঞানী নিউটন প্রথমে মধ্যাকর্ষণ সূত্রটি প্রণয়ন করেছিলেন জড়বস্তু ভূমিতে পতনের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে, এ প্রকল্পটি জড়বস্তুর ভূমিতে পতনের কারণ ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি জোয়ার-ভাটা, গ্রহসমূহের গতি-প্রকৃতি, এগুলোর পারস্পরিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এরূপ অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকার কারণেই মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সংক্রান্ত বিজ্ঞানী নিউটনের এ প্রকল্পটির মর্যাদা আরো বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তীতে তা প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বা সর্বজনস্বীকৃত তত্ত্বে পরিণত হয়।

৪। **ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা :** বিশিষ্ট যুক্তিবিদ উইলিয়াম হিওয়েল (William Whewell) এর মতে, কোনো প্রকল্প যদি ভবিষ্যৎ কোনো ঘটনার সঠিক পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হয়, তবে সেই প্রকল্পকে প্রমাণিত বলে গণ্য করতে হবে। যেমন- টমাস হ্যালি ১৯১০ সালে একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করে সেটি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, ৭৫ বছর পর আবার ধূমকেতুটি দেখা যাবে। পরবর্তীতে ১৯৮৫ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধূমকেতুটি দেখা যায় বলে এটি প্রমাণিত প্রকল্প বলে গৃহীত হয়। কিন্তু যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) মনে করেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী করার শক্তি প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়। কারণ অনেক সময় দেখা গেছে যে, কোনো প্রকল্পের মাধ্যমে সফলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হলেও পরবর্তী সময়ে তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন- ভূ-কেন্দ্রিক প্রকল্পের সাহায্যে সফলভাবে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হতো। কিন্তু সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে ভূ-কেন্দ্রিক তত্ত্ব ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।

৫। **স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃতি বা ঘটনা ব্যাখ্যায় পর্যাপ্ততা :** প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রমাণ হলো সংশ্লিষ্ট ঘটনা ব্যাখ্যায় এর স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃতি বা ঘটনা ব্যাখ্যায় পর্যাপ্ততা। এর অর্থ হলো যে বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হবে, প্রকল্পটি সে বিষয়কে যেন সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। তাই কোনো ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে যদি প্রকল্পটি সেই ঘটনাকে আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি আসার কারণ হিসেবে 'কণিকাতত্ত্ব' প্রকল্পটি আলোকের সকল প্রকৃতি পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম না হওয়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে এ সম্পর্কে প্রণীত 'তরঙ্গতত্ত্ব' প্রকল্পটি আলোকের সকল প্রকৃতি পর্যাপ্তভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়ায় তা গ্রহণ করা হয়।

৬। **সরল প্রকৃতি :** কোনো ঘটনা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যদি কোনো একটি প্রকল্প তুলনামূলকভাবে সম্ভাব্য অন্যান্য প্রকল্প থেকে সরল প্রকৃতির হয় তবে ঐ সরল প্রকৃতির প্রকল্পটিকে প্রমাণিত বলে গ্রহণ করতে হবে। যেমন- কোপার্নিকাসের 'সূর্যকেন্দ্রিক প্রকল্প' টলেমির 'ভূকেন্দ্রিক প্রকল্প' অপেক্ষা সহজ ও সরল প্রকৃতির বলে টলেমির প্রকল্প বর্জন করে কোপার্নিকাসের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, কোনো প্রকল্প বৈধ রূপ পেলেও সেটিকে আবার প্রমাণিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ প্রমাণিত হওয়ার পরই প্রকল্পটি মতবাদ বা নিয়মের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রকল্পকে প্রমাণ করার উপায়সমূহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

একটি প্রকল্প যথার্থ বা সঙ্গত প্রকল্পরূপে বিবেচিত হওয়ার পরও একে আবার বেশ কয়েকটি পরীক্ষা বা প্রমাণের সম্মুখীন হতে হয়। আর এই পরীক্ষাসমূহ যথাযথভাবে উত্তীর্ণ হতে পারলেই একটি সুসঙ্গত প্রকল্প নিয়ম বা প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বে পরিণত হয়। প্রকল্পকে প্রমাণ করার উপায়সমূহ হলো-সমর্থন বা যাচাইকরণ, একমাত্র প্রকল্প, আরোহ সমন্বয়, ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃতি বা ঘটনা ব্যাখ্যায় পর্যাপ্ততা এবং সরল প্রকৃতি। কোনো প্রকল্প বৈধ রূপ পেলেও সেটিকে আবার প্রমাণিত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ প্রমাণিত হওয়ার পরই প্রকল্পটি মতবাদ বা নিয়মের পর্যায়ে উন্নীত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি প্রকল্পের প্রমাণ নয়?
(ক) যাচাইকরণ (খ) প্রাসঙ্গিকতা
(গ) আরোহ সমন্বয় (ঘ) একমাত্র প্রকল্প

২। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি আসার কারণ হিসেবে প্রণীত 'তরঙ্গতত্ত্ব' প্রকল্পকে প্রমাণ করার কোন্ উপায়কে নির্দেশ করে?
(ক) যাচাইকরণ (খ) আরোহ সমন্বয়
(গ) সরল প্রকৃতি (ঘ) স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃতি

৩। একটি প্রকল্প মতবাদ বা নিয়মের পর্যায়ে উন্নীত হয় -
(i) শর্ত পূরণ করলে (ii) প্রমাণিত হলে
(iii) অপর্যাপ্ত হলে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.১১ প্রকল্পের গুরুত্ব (Importance of Hypothesis)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাস্তবজীবনে প্রকল্পের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে যুক্তিবিদগণের মতামত জানতে পারবেন।

প্রকল্পের গুরুত্ব (Importance of Hypothesis)

আমরা জানি যে, কোনো বিষয় বা ঘটনার প্রাথমিক ও আনুমানিক ধারণা গঠন করাকে প্রকল্প বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রকল্পের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এটি ছাড়া কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্ভব নয়। বর্তমানে আমরা যেসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কার দেখতে পাই তা এক সময় প্রকল্প হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং প্রকল্পের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। নিম্নে এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো :

১। **ঘটনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে :** প্রকৃতিতে জটিলরূপে সংঘটিত ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব না হলে সেগুলো প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করা যায় না। আবার এ ঘটনাগুলো আদৌ প্রয়োজনীয় কী-না তাও নির্ধারণ করা যায় না। তাই কোনো বিষয় বা ঘটনার প্রকৃতি কিংবা কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে সে সম্পর্কে আনুমানিক ধারণার ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হয়। আর এ ধরনের আনুমানিক ধারণাই হলো প্রকল্প। সুতরাং যেকোনো বিষয় বা ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

২। **নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের ক্ষেত্রে :** প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত যে সব ঘটনা ঘটে সেগুলো সব সময় সুবিন্যস্ত থাকে না। এসব ঘটনার প্রকৃতি নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা কখনো নিরীক্ষণ আবার কখনো পরীক্ষণের আশ্রয় নিয়ে থাকি। কিন্তু এই নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে যথার্থ প্রকল্প গঠনের উপর।

৩। **জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করে :** আমাদের চারপাশে সংঘটিত প্রাকৃতিক ঘটনাবলি হচ্ছে অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলোকে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। তাই প্রকল্পের সাহায্যে এগুলো সম্পর্কে ধারণা গঠন করে সেই ধারণার মাধ্যমে আমাদেরকে প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে হয়। সুতরাং অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল জ্ঞান পেতে হলে আমাদেরকে প্রকল্পের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

৪। **দৈনন্দিন জীবনে :** প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সার্বিকভাবে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে প্রকল্প অনেক গুরুত্ব বহন করে। কেননা মানুষ তার যেকোনো লক্ষ্য অর্জনের শুরুতেই প্রাথমিকভাবে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং পরবর্তীতে ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে পর্যায়ক্রমে লক্ষ্য অর্জনের দিকে ধাবিত হয়। অর্থাৎ প্রকল্প ছাড়া আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোনো সমস্যারই সঠিক সমাধান করতে পারি না।

৫। **সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে :** বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন- চুরি-ডাকাতি, খুন-গুম, নারী নির্যাতন, কিশোর অপরাধ ইত্যাদি ঘটনার যৌক্তিক সমাধান একমাত্র প্রকল্প প্রণয়নের সাহায্যেই সম্ভব। তাছাড়া প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে থাকে। যেমন- বার্ষিক আয়-ব্যয়ের সম্ভাব্য পরিকল্পনা হিসেবে বাজেট প্রণয়ন, বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রকল্প গঠন করা হয়ে থাকে। আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক লক্ষ্য

অর্জনের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমেই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬। **ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে :** ইতিহাস রচনার জন্য ইতিহাসবিদ সাধারণত প্রথমে বিভিন্ন উৎস থেকে ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে একটি প্রাথমিক ধারণা বা প্রকল্প গঠন করতে হয়। এরপর ঐ প্রকল্প বা প্রাথমিক ধারণাকে যাচাই করে সঙ্গতিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব হলে একে ইতিহাসের মর্যাদা প্রদান করা হয়। তাই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭। **অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে :** কোনো কোনো সময় ঘটনাসমূহের মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের একমাত্র উপায় হলো কোনো ব্যাপকতর নিয়ম সম্পর্কে প্রকল্প গ্রহণ করে, পরে ঐ প্রকল্পের ভিত্তিতে অবরোহমূলক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাই অবরোহমূলক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৮। **বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে :** যেকোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রথমে প্রকল্প হিসেবে গৃহীত হয় এবং পরবর্তীতে তা প্রমাণিত হলে ও কোনো বিরোধী দৃষ্টান্ত দ্বারা ভ্রান্ত প্রমাণিত না হলে নিয়ম বা মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রকল্প একটি অপরিহার্য বিষয়।

৯। **আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে :** আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্থান ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে যুক্তিবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। বৃটিশ যুক্তিবিদ ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) এর মতে, প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কারের জন্য প্রকল্পের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং এক্ষেত্রে নিরীক্ষণ ও অপনয়ন সূত্রই যথেষ্ট। অন্যদিকে বিজ্ঞানী নিউটন বলেন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমি প্রকল্প প্রণয়ন করি না। অর্থাৎ যুক্তিবিদ ফ্রান্সিস বেকন ও বিজ্ঞানী নিউটন আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্থান ও গুরুত্ব স্বীকার করেন না। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর মতে, আরোহে প্রকল্পের গুরুত্ব খুবই সামান্য। কারণ তিনি মনে করেন যে, আরোহ কোনো আবিষ্কারের পদ্ধতি নয়, এটি হচ্ছে প্রমাণের পদ্ধতি। তবে যুক্তিবিদ উইলিয়াম হিওয়েল (William Whewell) প্রকল্পের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করে বলেন, একটি বৈধ প্রকল্প এবং একটি আরোহ অনুমান প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তাঁর মতে, আরোহ অনুমানেও প্রকল্পের গুরুত্ব রয়েছে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, প্রকল্প হলো এমন একটি বিষয় যাকে আবিষ্কার, প্রমাণ, কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেই হয়। অর্থাৎ জগৎ ও জীবনের সাথে জড়িত সকল ক্ষেত্রে প্রকল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

সারসংক্ষেপ

প্রকল্পের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এটি ছাড়া কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সম্ভব নয়। বর্তমানে আমরা যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কার দেখতে পাই তা এক সময় প্রকল্প হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। সুতরাং প্রকল্পের গুরুত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কারণ ঘটনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের ক্ষেত্রে, জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করার ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে, ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে, অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ও আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বর্তমানে আমরা যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও আবিষ্কার দেখতে পাই তা এক সময়-
(ক) সত্য ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল (খ) বাস্তব কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল
(গ) প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল (ঘ) নিয়তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল

২। নিম্নের কোন্ যুক্তিবিদ আরোহে প্রকল্পের গুরুত্বকে অস্বীকার করেছেন?
(ক) জন স্টুয়ার্ট মিল (খ) ফ্রান্সিস বেকন
(গ) উইলিয়াম হিওয়েল (ঘ) যোসেফ

৩। প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি-
(i) জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখল করে (ii) নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণে সহায়তা করে
(iii) ইতিহাস রচনায় সহায়তা করে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট- ৪

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। প্রকল্পের সর্বশেষ স্তর হলো-
(ক) সমর্থন (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ (গ) আনুমানিক ধারণা (ঘ) ঘটনার নিরীক্ষণ

২। যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড (Carveth Read) কয় প্রকার প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

৩। প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রগুলো হলো-
(i) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান (ii) বাস্তব জীবনের জটিল ও রহস্যময় সমস্যা
(iii) অধিকতর নিশ্চয়তামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রিনা ও মিনা এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার কার্যাবলি বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত এবং একে একটি একটি করে ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সর্বশেষ ধাপে এসে তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবের অনুরূপ হয়, তাহলে সেটি সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং তা তত্ত্ব বা সূত্র হিসেবে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এই তত্ত্বই আবার অন্য কোনো ঘটনার ব্যাখ্যায় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

৪। উদ্দীপকটিতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তাহলো-

(ক) প্রকল্প (খ) ব্যাখ্যা (গ) আরোহ (ঘ) শ্রেণিকরণ

৫। উদ্দীপকটিতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে নিচের কোনগুলি প্রযোজ্য?

(i) এতে চারটি স্তর পরিলক্ষিত হয় (ii) সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো এর তৃতীয় স্তর

(iii) এতে আনুমানিক ধারণা বিদ্যমান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। রাসেল ও শাকের হোস্টেলে একই কক্ষে থাকে। শীতকালীন ছুটি শেষে দু'জনেই হোস্টেলের কক্ষে ফিরে এসে দেখল, তাদের দু'জনেরই শার্ট-প্যান্ট চুরি হয়ে গিয়েছে। এতে রাসেলের সন্দেহ হোস্টেলের দাড়োয়ানকে, আর শাকেরের সন্দেহ হোস্টেলের পাশের বাসায় বসবাসকারী এলাকার এক দাগি চোর মজিদকে। কিন্তু হোস্টেলের দাড়োয়ান এসে বলল, "আপনাদের শার্ট-প্যান্ট ভূতে নিয়ে গিয়েছে।"

ক. বাস্তব কারণ কাকে বলে? ১

খ. প্রকল্প কেন প্রয়োগ করা হয় ? ২

গ. দাড়োয়ানের বক্তব্যের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাসেল ও শাকেরের অপুর সন্দেহের মধ্যে কারটা প্রকল্পভিত্তিক আলোচনা করুন। ৪

২। দৃশ্যকল্প - ১ : নূর আত্তার জাহান একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ না থাকায় তিনি পরীক্ষাগারে বিদ্যুৎকে এক জাতীয় তরল পদার্থ হিসেবে গণ্য করেন।

দৃশ্যকল্প - ২ : মিজান সাহেব শরীরে জ্বর জ্বর অনুভব করছেন। এমতাবস্থায় তাঁর স্ত্রী শিমু একটি আইসক্রীম দিয়ে বললেন এটি খেয়ে নিন, তাহলে জ্বর সেরে যাবে।

ক. কাজ চালানো প্রকল্প কাকে বলে? ১

খ. সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত বলতে কী বুঝায়? ২

গ. দৃশ্যকল্প - ২ এ প্রকল্পের কোন্ শর্তটি অনুসরণ করা হয়নি? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ। দৃশ্যকল্প - ১ এ নূর আক্তার জাহান এর কাজটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১ ঃ ১-ঘ, ২-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩ ঃ ১-খ, ২-খ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫ ঃ ১-ঘ, ২-ক, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮ ঃ ১-ক, ২-গ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯ ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০ঃ ১-গ, ২-ঘ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১১ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-ঘ

কার্যকারণ সম্পর্ক প্রমাণ পদ্ধতি
(Methods of the Proof of the Law of Causation)

ইউনিট ৫

ভূমিকা

কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও এর প্রমাণ ছাড়া কখনও সার্বিক যুক্তিবাক্য বা সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই আরোহানুমানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো যে কোনো বিষয় বা ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের মাধ্যমে সার্বিক যুক্তিবাক্য বা সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করা। যুক্তিবিদ্যার ইতিহাসে বেকনই প্রথম কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য তিনটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে এ বিষয়ে ব্রিটিশ যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) পাঁচটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির কথা বলেন। এ পদ্ধতিগুলো হলো- অন্বয়ী পদ্ধতি (The Method of Agreement), ব্যতিরেকী পদ্ধতি (The Method of Difference), যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি (The Joint Method of Agreement and Difference), সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি (The Method of Concomitant Variation) এবং পরিশেষ পদ্ধতি (The Method of Residues)। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল কর্তৃক প্রবর্তিত এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয় বলে এ পদ্ধতিগুলোকে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে 'পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি' বলা হয়। অন্যদিকে, এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের সময় অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করা হয় বলে এ পদ্ধতিগুলোকে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে 'অপনয়ন পদ্ধতি' বলা হয়। এ ইউনিটে আমরা এ পদ্ধতিগুলোর সূত্র, অপনয়ন সূত্র, প্রকৃতি, সুবিধা-অসুবিধা এবং এগুলোর অযথার্থ প্রয়োগে সৃষ্ট অনুপপত্তিসমূহ আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময় : সর্বোচ্চ ০৬ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১: কার্যকারণ নীতি
পাঠ-৫.২: পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও এর প্রকৃতি
পাঠ-৫.৩: পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও অপনয়ন সূত্র
পাঠ-৫.৪: অন্বয়ী পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র
পাঠ-৫.৫: অন্বয়ী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৫.৬: অন্বয়ী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি
পাঠ-৫.৭: ব্যতিরেকী পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র
পাঠ-৫.৮ : ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৫.৯ : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি
পাঠ-৫.১০: যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি
পাঠ-৫.১১: যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৫.১২: যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি
পাঠ-৫.১৩: সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র
পাঠ-৫.১৪: সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৫.১৫: সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত অনুপপত্তিসমূহ
পাঠ-৫.১৬: পরিশেষ পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র
পাঠ-৫.১৭: পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ-৫.১৮: ব্যবহারিক জীবনে পরীক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব

পাঠ-৫.১ কার্যকারণ নীতি (Law of Causation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- কার্যকারণ নীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- কার্যকারণ নীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।

কার্যকারণ নীতি (Law of Causation)

কার্যকারণ নীতি একটি মৌলিক, স্বতঃসিদ্ধ ও পরম নিয়ম বলে এর সংজ্ঞা দেয়া যায় না। তবে বিভিন্ন যুক্তিবিদ বিভিন্নভাবে এ নিয়মটির বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ নীতি সম্পর্কে যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন, "যে ঘটনার শুরু আছে তার অবশ্যই শেষ আছে।"("Every phenomenon which has a beginning must have a cause."1889, p.212) আবার যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic part-11* গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেন, "প্রত্যেক ঘটনা তার পূর্ববর্তী কোনো ঘটনা বা ঘটনাসমূহের সাথে এমন সুনিশ্চিত ও সুসংগতভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, যা ঘটলে এ ঘটনাটি ঘটে এবং যা না ঘটলে এ ঘটনাটি ঘটে না।"("Every event that happens is definitely and uniformly connected with some prior event or events which happening it happens and which failing it fails." 1870, P.16)

অন্যদিকে এ নীতির নঞর্থক বর্ণনায় বলা যায় যে, 'বিনা কারণে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না' বা 'নিছক শূন্য থেকে কোনো কিছুর সূত্রপাত হয় না'। এ প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic part-11* গ্রন্থে বলেন, "শূন্য থেকে শুধূ শূন্যই জন্মায়।"("Ex niholo nihil fit.") তাই তিনি সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, "কার্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থাবলির সমষ্টিকে কারণ বলে গণ্য করতে হবে।" ("The cause must be regarded as the entire aggregate of conditions or circumstances requisite to the effect."1870, p.19)

কারণের স্বরূপ সম্পর্কে যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন, "কোনো ঘটনার কারণ হলো সেই পূর্বগামী ঘটনা বা ঘটনাসমূহের সংমিশ্রণ যাকে ঘটনাটি অপরিবর্তনীয়ভাবে এবং শর্তহীনভাবে অনুসরণ করে।"("The cause of a phenomenon to be the antecedent or the concurrence of antecedents on which it is invariable and unconditional consequent."1889, p.222)

আবার কারণের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড (Carveth Read) তাঁর *Inductive Logic* বইয়ে বলেন, "গুণগত দিক থেকে কারণ হলো কার্যের অব্যবহিত, শর্তহীন, অপরিবর্তনীয় পূর্ববর্তী ঘটনা এবং পরিমাণের দিক থেকে কারণ ও কার্য সমান।"("The cause of any event is qualitatively the immediate, unconditional, invariable antecedent of the effect, and qualitatively is equal to the effect."1898, p.153)

সুতরাং কার্য-কারণের স্বরূপ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সংক্ষেপে বলা যায় যে, যে নীতি অনুসারে কোনো কারণ সৃষ্টি হলে অবশ্যই তাকে অনুসরণ করে কোনো কার্য বা ঘটনা ঘটবে বা কোনো কার্য সংঘটিত হলে তা অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ অনুসৃত হবে, তাকেই কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে। অর্থাৎ কার্য ও কারণের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

কার্য-কারণ নীতির প্রকৃতি (Nature of the Law of Causation)

কার্য-কারণ নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন যুক্তিবিদ প্রদত্ত উপর্যক্ত মতামত বিচার-বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায়-

১। কারণ ও কার্য দু'টি সাপেক্ষ পদ : কারণ ও কার্যের একটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য অপরটি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অর্থাৎ কোনোভাবেই একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায় না। তাই বলা যায় যে, কারণ ও কার্য দু'টি সাপেক্ষ পদ।

২। কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান : কারণ ও কার্যের মধ্যকার সম্পর্কের স্বরূপ এমনই যে, একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। কেননা কারণের মধ্যে এমনই এক শক্তি থাকে যা কার্য সংঘটিত করবেই। তাই যখনই কোনো কার্য সংঘটিত হয় তখনই তার পেছনে অবশ্যই কোনো কারণ থাকে। অর্থাৎ কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

৩। কারণ ও কার্যের প্রকৃতি এক : কারণের প্রকৃতির উপরই কার্যের প্রকৃতি নির্ভরশীল। অর্থাৎ কারণ যেরূপ হয়, এর কার্যও সেরূপ হয়। কারণ যদি বড় হয় তাহলে কার্যও বড় হয়, আর কারণ যদি ছোট হয় তাহলে কার্যও ছোট হয়। যেমন- কাউকে জোরে আঘাত করলে সে বেশি ব্যথা অনুভব করবে, আর আস্তে আঘাত করলে সে কম ব্যথা অনুভব করবে।

৪। কার্য-কারণ নীতি বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য : যে ধারণা বা তত্ত্ব বিনা বিচারে সত্য বলে মেনে নেয়া হয় তাকে স্বীকার্য সত্য বলে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় কার্য-কারণ নীতিকে সেভাবেই মেনে নেয়া হয়েছে। তাই এ নিয়মটি বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য বলে গৃহীত।

৫। কার্য-কারণ নীতি গুণগত ও পরিমাণগতভাবে সম্পর্কযুক্ত : কারণকে গুণগত ও পরিমাণগত দিক থেকে বিচার করা হয়। গুণগত দিক থেকে কারণ হলো কার্যের অপরিবর্তনীয়, শর্তহীন ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনা। আর পরিমাণগত দিক থেকে কারণ ও কার্য সমান। অর্থাৎ কার্য-কারণ নীতি গুণগত ও পরিমাণগতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৬। কারণ হলো কার্যের পর্যাপ্ত শর্ত : যে শর্তসমষ্টি উপস্থিত থাকলে ঘটনা বা কার্য সংঘটিত হয় সে শর্তসমষ্টিকে কারণ বলে। আর এ শর্তসমষ্টি উপস্থিত থাকলে ঘটনা বা কার্য সংঘটিত হয় বলে তা কার্যের পর্যাপ্ত শর্ত।

৭। কার্য-কারণ নীতি আরোহের আকারগত ভিত্তি : কার্য-কারণ নীতি থেকে আরোহমূলক পদ্ধতিতে কতিপয় নিয়ম পাওয়া যায়। এ নিয়মগুলো হলো 'অপনয়নের মূল সূত্রাবলি'। বৈজ্ঞানিক আরোহ এর আকারগত সত্যতা বা যথার্থতার জন্য এ মূল সূত্রগুলোর উপর নির্ভরশীল। তাই কার্য-কারণ নীতি বৈজ্ঞানিক আরোহের অন্যতম আকারগত ভিত্তি।

শিক্ষার্থীর কাজ : কারণের যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড-এর মূল তত্ত্বটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কার্যকারণ নীতি একটি মৌলিক, স্বতঃসিদ্ধ ও পরম নিয়ম বলে এর সংজ্ঞা দেয়া যায় না। তবে বিভিন্ন যুক্তিবিদ বিভিন্নভাবে এ নিয়মটির বর্ণনা প্রদান করেছেন। তাঁদের বর্ণনার মূল কথা হলো- যে নীতি অনুসারে কোনো কারণ সৃষ্টি হলে অবশ্যই তাকে অনুসরণ করে কোনো কার্য বা ঘটনা ঘটবে বা কোনো কার্য সংঘটিত হলে তা অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ অনুসৃত হবে, তাকেই কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে। অর্থাৎ কার্য ও কারণের মধ্যে আবশ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান। কার্য-কারণ নীতি বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য এবং এটি বৈজ্ঞানিক আরোহের অন্যতম আকারগত ভিত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। "যে ঘটনার শুরু আছে তার অবশ্যই শেষ আছে" এ উক্তিটি করেছেন-
(ক) এইচ ডব্লিউ বি যোসেফ (খ) আই এম কপি
(গ) জন স্টুয়ার্ট মিল (ঘ) আলেকজেন্ডার বেইন

২। নিচের কোন্‌টি কার্য-কারণ নীতির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়?
(ক) আরোহের আকারগত ভিত্তি (খ) আরোহের বস্তুগত ভিত্তি
(গ) বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য (ঘ) কারণ ও কার্যের প্রকৃতি এক

৩। কারণ হলো কার্যের -
(i) পর্যাপ্ত শর্ত (ii) অব্যবহিত শর্ত
(iii) অপরিবর্তনীয় শর্ত

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.২ পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও এর প্রকৃতি (Experimental Method and Its Nature)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।
- পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রকরণ জানতে পারবেন।

পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (Experimental Method)

কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) যে সব পদ্ধতি প্রবর্তন করেন সে পদ্ধতিগুলোকে সাধারণত পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (Experimental Method) বলা হয়। আর কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বলতে বুঝায় কোনো জানা কার্যের কারণ নির্ণয় করা বা কোনো জানা কারণের কার্য নির্ণয় করা। যুক্তিবিদ মিল (Mill) প্রবর্তিত এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে মূলত এ কাজটিই করা হয়ে থাকে। মিলের এ পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলো যে শুধুমাত্র পরীক্ষণের উপরই নির্ভর করে তা নয়। এগুলো বরং নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয়ের উপরই নির্ভরশীল। কেননা এ পদ্ধতিসমূহ প্রকৃতিগতভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক। আর নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয়ই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। তাই এ পদ্ধতিসমূহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরীক্ষণের পদ্ধতি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষণের পদ্ধতি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, যে পদ্ধতির সাহায্যে অনুসন্ধেয় বিষয়ের সাথে জড়িত নয় এমন সব অপ্রয়োজনীয় ও আকস্মিকভাবে আগত উপাদানগুলোকে অপনয়নের সূত্র প্রয়োগে বাদ দিয়ে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা ঘটনাবলির পূর্বাপর সম্পর্কটি যথাযথ লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) পাঁচটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির কথা বলেন। এ পদ্ধতিগুলো হলো- অন্বয়ী পদ্ধতি (The Method of Agreement), ব্যতিরেকী পদ্ধতি (The Method of Difference), যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি (The Joint Method of Agreement and Difference), সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি (The Method of Concomitant Variation) এবং পরিশেষ পদ্ধতি (The Method of Residues)। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল কর্তৃক প্রবর্তিত এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয় বলে এ পদ্ধতিগুলোকে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে 'পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি' বলা হয়। অন্যদিকে, এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের সময় অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করা হয় বলে এ পদ্ধতিগুলোকে নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে 'অপনয়ন পদ্ধতি' বলা হয়।

পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির প্রকৃতি (Nature of the Experimental Method)

১। **মৌলিক ও রূপান্তরিত পদ্ধতি :** যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) উল্লিখিত পাঁচটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির মধ্যে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতিকে মৌলিক পদ্ধতি বলে মনে করেন। কারণ তাঁর মতে, অন্বয়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে একক অন্বয়ের ভিত্তিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয়। আর ব্যতিরেকী পদ্ধতির ক্ষেত্রে একক ব্যতিরেকী সম্পর্কের ভিত্তিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা হয়। তাই এ দু'টি পদ্ধতি হলো মৌলিক পদ্ধতি। অন্যদিকে, যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি, সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি এবং পরিশেষ পদ্ধতিকে তিনি রূপান্তরিত পদ্ধতি বলে মনে করেন। কারণ তাঁর মতে, যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির ক্ষেত্রে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির ক্ষেত্রে কখনও অন্বয়ী পদ্ধতি এবং কখনও ব্যতিরেকী পদ্ধতির বিশেষ রূপ লক্ষ্য করা যায়। আর পরিশেষ পদ্ধতি হলো ব্যতিরেকী পদ্ধতির এক বিশেষ রূপ। এ কারণেই

অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি মৌলিক পদ্ধতি নয়, বরং এ দুই পদ্ধতিরই বিশেষ রূপান্তরিত রূপ।

২। **নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ এ দুই পদ্ধতির সমাহার :** মিলের এ পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলো যে শুধুমাত্র পরীক্ষণের উপরই নির্ভর করে তা নয়। এগুলো নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয়ের উপরই নির্ভরশীল। কেননা এ পদ্ধতিসমূহ প্রকৃতিগতভাবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক। আর নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ উভয়ই অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। তাই এ পদ্ধতিসমূহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিরীক্ষণের পদ্ধতি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষণের পদ্ধতি। তাছাড়া এ পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলো নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা ঘটনাবলির পূর্বাপর সম্পর্কটি যথাযথ লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

৩। **অপনয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ :** কার্য বা করণ নির্ণয় করতে গিয়ে যে সব অবস্থা বা বিষয়াবলি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়, সে সব অবস্থা বা বিষয়াবলি বর্জন বা পরিহার করাকে বলা হয় অপনয়ন। উল্লেখ্য পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিসমূহ সব সময়ই ঘটনার মধ্যকার অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বাদ দেয় এবং প্রকৃত কারণ বা কার্য আবিষ্কার ও প্রমাণ করে। সুতরাং এ পদ্ধতিগুলোতে অপনয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ বিদ্যমান।

৪। **কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি :** পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিসমূহের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এগুলোর মূল উদ্দেশ্য ঘটনাবলি থেকে কোনো কিছু অপনয়ন বা পরিহার করা নয়, বরং ঘটনাবলির মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার বা প্রমাণ করা।

৫। **সদর্থক ও নঞর্থক উভয় দিক বিদ্যমান :** বিভিন্ন পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে ঘটনাবলি থেকে কোনো কিছু অপনয়ন বা পরিহার করা হলো এ পদ্ধতিগুলোর নঞর্থক দিক এবং ঘটনাবলির মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার বা প্রমাণ করা হলো এ পদ্ধতিগুলোর সদর্থক দিক। তাই পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সদর্থক ও নঞর্থক উভয় দিক বিদ্যমান।

৬। **আরোহাত্মক পদ্ধতি :** যুক্তিবিদ্যায় এ পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে বিশেষ ঘটনার মধ্য থেকে সার্বিক কার্য-কারণ সম্পর্কে উপনীত হওয়া যায় বলে এগুলোকে আরোহাত্মক পদ্ধতি বলা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : যুক্তিবিদ মিল প্রবর্তিত পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

যে পদ্ধতির সাহায্যে অনুসন্ধেয় বিষয়ের সাথে জড়িত নয় এমন সব অপ্রয়োজনীয় ও আকস্মিকভাবে আগত উপাদানগুলোকে অপনয়নের সূত্র প্রয়োগে বাদ দিয়ে নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ দ্বারা ঘটনাবলির পূর্বাপর সম্পর্কটি যথাযথ লক্ষ্য করে তাদের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয় বলে এ পদ্ধতিগুলোকে 'পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি' বলা হয়। অন্যদিকে, এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের সময় অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করা হয় বলে এ পদ্ধতিগুলোকে 'অপনয়ন পদ্ধতি' বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল কয়টি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির কথা বলেন?

(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। নিচের কোনটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?
(ক) আরোহাত্মক পদ্ধতি (খ) অপনয়ন পদ্ধতি
(গ) কার্য-কারণ নির্ণয়ের পদ্ধতি (ঘ) অমৌলিক পদ্ধতি

৩। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল প্রবর্তিত মৌলিক পদ্ধতিগুলো হলো-
(i) অন্বয়ী পদ্ধতি (ii) ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(iii) পরিশেষ পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও অপনয়ন সূত্র (Experimental Method and Principles of Elimination)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির সূত্রগুলো জানতে পারবেন।
- পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র বর্ণনা ও প্রয়োগ করতে পারবেন।

পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ও অপনয়ন সূত্র (Experimental Method and Principles of Elimination)

অপনয়ন শব্দটির অর্থ হলো পরিহার করা বা বর্জন করা। জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর সাথে আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) এবং এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (H.W.B. Joseph) এর অপনয়ন সূত্রগুলো অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ মিল (Mill) পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবন করেছেন ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে। আর বেইন (Bain) এবং যোসেফ (Joseph) অপনয়ন সূত্রগুলো উদ্ভাবন করেছেন ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যকার অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পরিহার করে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজটি সহজ ও সঠিকভাবে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং বলা যায়, যে সব সূত্রের সাহায্যে কার্য-কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পরিহার করে এ সম্পর্কটি সহজে ও নির্ভুলভাবে করা যায় সে সব সূত্রকে অপনয়ন সূত্র বলে। যুক্তিবিদ বেইন (Bain) তিনটি এবং যোসেফ (Joseph) একটি অপনয়ন সূত্র উদ্ভাবন করেছেন। নিম্নে এ অপনয়ন সূত্রগুলো উল্লেখ করা হলো—

প্রথম সূত্র বা অন্বয়ী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র : যুক্তিবিদ বেইন (Bain) অন্বয়ী পদ্ধতির ভিত্তি স্বরূপ তাঁর *Logic-Induction* গ্রন্থে যে অপনয়ন সূত্রটি প্রদান করেন তাহলো, "পূর্ববর্তী ঘটনার মধ্য থেকে যে অংশটি বাদ দিলে কার্যের কোনো হানি হয় না, তা কারণের অংশ হতে পারে না।"("Whatever antecedent can be left out without prejudice to the effect can be no part of the cause." 1870, P. 47)

সূত্রটির তাৎপর্য : এ অপনয়ন সূত্রটির মূল তাৎপর্য হলো কোনো পূর্ববর্তী ঘটনাকে বাদ দেয়ার পরও যদি দেখা যায় যে, আলোচ্য ঘটনাটি রয়ে গেছে, তাহলে ধরে নেয়া যায় যে সেই পূর্ববর্তী ঘটনার সাথে উক্ত ঘটনার কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে অবস্থাটি সব সময়ই আলোচ্য ঘটনার সাথে বর্তমান এবং যাকে আলোচ্য ঘটনা থেকে আলাদা করা যায় না, সেটিই হবে উক্ত ঘটনার কারণ বা কার্য।

দ্বিতীয় সূত্র বা ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র : অনুসন্ধেয় ঘটনা থেকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic- Induction* গ্রন্থে ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "যদি অনুগের অঙ্গহানি না করে কোনো পূর্বগকে বাদ দেয়া না যায়, তাহলে সে পূর্বগটি অবশ্যই কারণ বা কারণের অংশ।"("When an antecedent cannot be left out without the consequent disappearing, such antecedent must be the cause or part of the cause." 1870, P.48)

সূত্রটির তাৎপর্য : যুক্তিবিদ বেইন (Bain)-এর এ সূত্রটির অর্থ হলো, কোনো ঘটনা থেকে আমরা যদি একটি বিশেষ অবস্থা অপসারণ করার পর দেখতে পাই যে, এর ফলে অপর একটি অবস্থাও অপসারিত হয়েছে অথচ ঐ ঘটনার অন্য সব অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে যে উক্ত অবস্থার সাথে অপসারিত অবস্থার কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে।

তৃতীয় সূত্র বা সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র : যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic-Induction* গ্রন্থে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে অপনয়ন সূত্রটি প্রদান করেছেন তাহলো, "একটি পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী ঘটনা যদি একই সাথে সমপরিমাণে বাড়তে ও কমতে থাকে তাহলে ঘটনা দু'টিকে কারণ এবং কার্য বলে ধরতে হবে।"("An

antecedent and a consequent rising and falling together in numerical concomitance are to be held as cause and effect." 1870, P.48)

সূত্রটির তাৎপর্য : যুক্তিবিদ বেইন (Bain)-এর এ সূত্রটি কারণের পরিমাণগত দিকটির নির্দেশক। এর অর্থ হলো পরিমাণগতভাবে কারণ ও কার্য সমান। তাই কারণ যে হারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায় এর কার্যও সে হারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। যেমন- বাজারে পণ্য সামগ্রীর যোগান বাড়লে তার দাম কমে এবং যোগান কমলে দাম বাড়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি ও হ্রাসের সম্পর্কটি কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ।

চতুর্থ সূত্র বা পরিশেষ পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র : যুক্তিবিদ এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (H.W.B. Joseph) তাঁর *An Introduction to Logic* গ্রন্থে পরিশেষ পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র দিতে গিয়ে বলেন, "যা ভিন্ন একটি ঘটনার কারণ বলে পরিচিত তা কিছুতেই আলোচ্য ঘটনার কারণ হতে পারে না।" ("Nothing is the cause of the phenomenon which is known to be the cause of a different phenomenon."1916, p.440)

সূত্রটির তাৎপর্য : যুক্তিবিদ যোসেফ (Joseph)-এর এ সূত্রটির অর্থ হলো, কোনো নির্দিষ্ট ঘটনার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট কারণ থাকবে। তাই একটি পূর্ববর্তী ঘটনা যদি অন্য কোনো ঘটনার কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তা কিছুতেই আলোচ্য ঘটনার কারণ হতে পারে না।

পঞ্চম সূত্র বা যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র : যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির কোনো অপনয়ন সূত্র প্রদান করেননি। তবে তিনি অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে অপনয়ন সূত্রদ্বয় প্রদান করেছেন তাদের সমন্বয়ে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র পাওয়া যায়। আর এ সমন্বিত সূত্রটি হলো, "যে পূর্বগকে কার্যের কোনো হানি না করে বাদ দেয়া যায়, সেই পূর্বগ কারণ হতে পারে না এবং যে পূর্বগকে কার্যের কোনো হানি না করে বাদ দেয়া যায় না, সেই পূর্বগ অবশ্যই কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ হবে।"

শিক্ষার্থীর কাজ : পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির অপনয়ন সূত্রগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যে সব সূত্রের সাহায্যে কার্য-কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পরিহার করা করা যায় সে সব সূত্রকে অপনয়ন সূত্র বলে। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর সাথে আলেকজেন্ডার বেইন এবং এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ-এর অপনয়ন সূত্রগুলো অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ মিল (Mill) পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলো উদ্ভাবন করেছেন ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে। আর বেইন (Bain) এবং যোসেফ (Joseph) অপনয়ন সূত্রগুলো উদ্ভাবন করেছেন ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যকার অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পরিহার করে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজটি সহজ ও সঠিকভাবে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে। যুক্তিবিদ বেইন তিনটি এবং যোসেফ একটি অপনয়ন সূত্র উদ্ভাবন করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদ বেইন কয়টি অপনয়ন সূত্র উদ্ভাবন করেছেন?
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। পরিশেষ পদ্ধতির অপনয়ন সূত্রটি প্রদান করেছেন-
(ক) যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (খ) যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন
(গ) যুক্তিবিদ এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (ঘ) যুক্তিবিদ এইচ. এস. মেলোন

৩। "যা ভিন্ন একটি ঘটনার কারণ বলে পরিচিত তা কিছুতেই আলোচ্য ঘটনার কারণ হতে পারে না।" সূত্রটি-
(i) পরিশেষ পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র (ii) পরিশেষ পদ্ধতির সূত্র
(iii) যোসেফ প্রদান করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ অন্বয়ী পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র (The Method of Agreement, Its Nature and Principles of Elimination)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- অন্বয়ী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অন্বয়ী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র জানতে পারবেন।
- অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অন্বয়ী পদ্ধতি (The Method of Agreement)

যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) প্রবর্তিত পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর প্রথমটি হচ্ছে অন্বয়ী পদ্ধতি। অন্বয় শব্দের অর্থ মিল। এদিক থেকে অন্বয়ী পদ্ধতির অর্থ হলো মিলের পদ্ধতি। অন্বয়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুসন্ধেয় ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্তে সাধারণভাবে উপস্থিত পূর্ববর্তী বিষয়কে কারণ এবং পরবর্তী বিষয়কে কার্য হিসেবে অনুমান করা হয়। নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই অন্বয়ী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাই নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণই হলো অন্বয়ী পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

অন্বয়ী পদ্ধতির সূত্র (Canon of the Method of Agreement) : যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে অন্বয়ী পদ্ধতির যে সূত্র প্রদান করেছেন তাহলো, "যদি আলোচ্য ঘটনার দুই বা ততোধিক দৃষ্টান্তে একটি সাধারণ অবস্থা বর্তমান থাকে, তাহলে যে অবস্থাটিতে সবগুলো দৃষ্টান্তের মধ্যে মিল থাকে সেটিই হবে আলোচ্য ঘটনার কারণ বা কার্য।"("If two or more instances of the phenomenon under investigation have only one circumstance in common, the circumstance in which alone all the instances agree is the cause (or effect) of the given phenomenon." 1889, P- 255)

অন্বয়ী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র (Principles of Elimination of the Method of Agreement) : যুক্তিবিদ বেইন (Bain) অন্বয়ী পদ্ধতির ভিত্তি স্বরূপ তাঁর *Logic- Induction* গ্রন্থে যে অপনয়ন সূত্রটি প্রদান করেন তাহলো, "পূর্ববর্তী ঘটনার মধ্য থেকে যে অংশটি বাদ দিলে কার্যের কোনো হানি হয় না, তা কারণের অংশ হতে পারে না।"("Whatever antecedent can be left out without prejudice to the effect can be no part of the cause." 1870, P- 47)

এ অপনয়ন সূত্রটির মূল তাৎপর্য হলো কোনো পূর্ববর্তী ঘটনাকে বাদ দেয়ার পরও যদি দেখা যায় যে, আলোচ্য ঘটনাটি রয়ে গেছে, তাহলে ধরে নেয়া যায় যে সেই পূর্ববর্তী ঘটনার সাথে উক্ত ঘটনার কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে অবস্থাটি সব সময়ই আলোচ্য ঘটনার সাথে বর্তমান এবং যাকে আলোচ্য ঘটনা থেকে আলাদা করা যায় না, সেটিই হবে উক্ত ঘটনার কারণ বা কার্য।

অন্বয়ী পদ্ধতির সংজ্ঞা (Definition of the Method of Agreement) : অন্বয়ী পদ্ধতির এ ব্যাখ্যা থেকে আমরা এর যে সংজ্ঞাটি প্রদান করতে পারি তাহলো- কার্য-কারণ সম্পর্কের যে পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুসন্ধেয় ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্তে সাধারণভাবে উপস্থিত পূর্ববর্তী বিষয়কে কারণ আর পরবর্তী বিষয়কে কার্য হিসেবে অনুমান করা হয় তাকে অন্বয়ী পদ্ধতি বলে।

অন্বয়ী পদ্ধতির উদাহরণ (Example of the Method of Agreement)

সাংকেতিক উদাহরণ

পূর্ববর্তী ঘটনা	পরবর্তী ঘটনা
ক খ গ	প ফ ব
ক গ ঘ	প ব ভ
ক ঘ ঙ	প ভ ম

অতএব, ক হলো প এর কারণ।

উল্লিখিত উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনাবলির ক্ষেত্রে খ গ ঘ ঙ কখনও উপস্থিত আবার কখনও অনুপস্থিত। অন্যদিকে পরবর্তী ঘটনাবলির ক্ষেত্রে ফ ব ভ ম কখনও উপস্থিত আবার কখনও অনুপস্থিত। কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাবলির ক্ষেত্রে খ গ ঘ এবং ঙ অনুপস্থিত থাকলেও পরবর্তী ঘটনাবলির ক্ষেত্রে প অপরিবর্তনীয়ভাবে উপস্থিত থাকছে। তাই খ গ ঘ ঙ কোনোভাবেই প এর কারণ হতে পারে না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলির ক্ষেত্রে ফ ব ভ এবং ম অনুপস্থিত থাকলেও পূর্ববর্তী ঘটনাবলির ক্ষেত্রে ক অপরিবর্তনীয়ভাবে উপস্থিত থাকছে। তাই ফ ব ভ ম কোনোভাবেই ক এর কারণ হতে পারে না। তবে এখানে লক্ষণীয় যে পূর্ববর্তী ঘটনাবলির ক্ষেত্রে ক এবং পরবর্তী ঘটনাবলির ক্ষেত্রে প অপরিবর্তনীয়ভাবে উপস্থিত থাকছে। সুতরাং ক হচ্ছে প এর কারণ।

বাস্তব উদাহরণ

(ক) কার্য থেকে কারণ : অতিবৃষ্টি, খরা, আবহাওয়ার পরিবর্তন,স্যাঁতসেঁতে অবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষের ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরের সব ক্ষেত্রেই স্ত্রী এনোফিলিস নামক মশার কামড় সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে। অতএব, স্ত্রী এনোফিলিস নামক মশার কামড়ই ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ।

(খ) কারণ থেকে কার্য : কালো মানুষ বিষ পান করলে মৃত্যুবরণ করে। ফর্সা মানুষ বিষ পান করলে মৃত্যুবরণ করে। ধনী মানুষ বিষ পান করলে মৃত্যুবরণ করে। গরীব মানুষ বিষ পান করলে মৃত্যুবরণ করে। বিভিন্ন পেশার মানুষ বিষ পান করলে মৃত্যুবরণ করে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বিষ পান করলে মৃত্যুবরণ করে। অতএব, বিষ পানের কার্য হলো মৃত্যু।

অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতি

(Nature of the Method of Agreement)

১। **একক অন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত :** অন্বয়ী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত অনুমানের ক্ষেত্রে পূর্বগ ও অনুগের মধ্যে একটি মাত্র বিষয়ের উপস্থিতির অন্বয় বা মিলের উপর নির্ভর করা হয়। তাই কফি (Coffey), মেলন (Mellone) প্রমুখ যুক্তিবিদ অন্বয়ী পদ্ধতিকে 'একক অন্বয়ী পদ্ধতি' বলে অভিহিত করেছেন।

২। **সাদৃশ্য ভিত্তিক পদ্ধতি :** অন্বয়ী পদ্ধতিতে অনুসন্ধেয় বিষয়ের পূর্বাপর ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করে এদের মধ্যে কোনো বিশেষ অবস্থার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। যে অবস্থাটি সবগুলো দৃষ্টান্তে পূর্বাপর মিল থাকে বা সাধারণভাবে অবস্থান করে সেই পূর্বাপর ঘটনাটি কার্য-কারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত বলে ধরে নেয়া হয়। তাই অন্বয়ী পদ্ধতি হলো মূলত সাদৃশ্য ভিত্তিক পদ্ধতি।

৩। **কার্য ও কারণ উভয় দিক থেকেই প্রয়োগযোগ্য :** অন্বয়ী পদ্ধতি প্রধানত নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি হওয়ায় এর সাহায্যে আমরা একটি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য একদিকে যেমন কার্য থেকে কারণে যেতে পারি, অন্যদিকে তেমনি কারণ থেকে কার্যেও যেতে পারি। সুতরাং এ পদ্ধতি কার্য ও কারণ উভয় দিক থেকেই প্রয়োগযোগ্য।

৪। **নিরীক্ষণ ভিত্তিক পদ্ধতি :** প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় যখন প্রকৃতির কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় তখন তাকে বলা হয় নিরীক্ষণ। অন্বয়ী পদ্ধতিতে প্রায় সব সময়ই এ প্রক্রিয়ায় যে কোনো

ঘটনার মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। এজন্য অন্বয়ী পদ্ধতি হলো একটি নিরীক্ষণ ভিত্তিক পদ্ধতি।

৫। **সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য :** নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে এ পদ্ধতির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত সব সময় সম্ভাব্য হয়ে থাকে, নিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছায় না। কারণ এ পদ্ধতির সহায়তায় কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব হলেও তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা যায় না।

৬। **আবিষ্কারের পদ্ধতি :** অন্বয়ী পদ্ধতি অনুসন্ধেয় ঘটনার পূর্বগ ও অনুগের মধ্যে সম্ভাব্য কার্য-কারণ সম্পর্কটি আবিষ্কার করে বলে এটিকে আবিষ্কারের পদ্ধতি বলা হয়। এছাড়া এ পদ্ধতি কার্য-কারণ সম্পর্কিত একটি প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা প্রদান পূর্বক এটিকে আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করে।

৭। **পরিসর ব্যাপক :** প্রকৃতির অনেক ঘটনা আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি না বলে এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সম্ভব হয় না। কিন্তু নিরীক্ষণধর্মী পদ্ধতি হওয়ার কারণে এসব ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনুসন্ধানাধীন ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি। আর এ কারণেই অন্বয়ী পদ্ধতির পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক।

অন্বয়ী পদ্ধতি মূলত নিরীক্ষণের পদ্ধতি : প্রাকৃতিক পরিবেশে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় যখন প্রকৃতির কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় তখন তাকে বলা হয় নিরীক্ষণ। অন্বয়ী পদ্ধতিতে প্রায় সব সময়ই এ প্রক্রিয়ায় যে কোনো ঘটনার মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। এজন্য অন্বয়ী পদ্ধতিকে মূলত নিরীক্ষণের পদ্ধতি বলা হয়।

প্রকৃতিতে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলোকে সাধারণত পরীক্ষণের আওতায় আনা যায় না। এমতাবস্থায় এসব ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে পুরোপুরি নিরীক্ষণের উপর নির্ভর করতে হয়। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতির কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করে স্বাভাবিক নিরীক্ষণের উপর নির্ভর করতে হয়। তাই এ জাতীয় প্রাকৃতিক ঘটনার কার্য-কারণ নির্ণয়ের কাজটি অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করে সম্পাদন করা অত্যন্ত সহজ ও সুবিধাজনক। কেননা অন্বয়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুসন্ধেয় ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্তে যখন সাধারণভাবে উপস্থিত পূর্ববর্তী বিষয়কে কারণ এবং পরবর্তী বিষয়কে কার্য হিসেবে অনুমান করা হয় তখন তা নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই করা হয়ে থাকে। তাই নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণই হলো অন্বয়ী পদ্ধতির মূল ভিত্তি।

তবে অন্বয়ী পদ্ধতির উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা থেকে আমাদের মধ্যে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, এটি কেবল নিরীক্ষণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পরীক্ষণের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু আসলে তা নয়। কারণ আমরা জানি যে, যে সব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সম্ভব সে সব ক্ষেত্রে নিরীক্ষণও সম্ভব। তাছাড়া পরীক্ষণও এক ধরনের নিরীক্ষণ। বস্তুত অন্বয়ী পদ্ধতিকে নিরীক্ষণের পদ্ধতি বলার অর্থ হলো, প্রকৃতিতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলোকে কোনোভাবেই পরীক্ষণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। এসব ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল যা কেবলমাত্র অন্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যেই সম্ভব। এ প্রেক্ষিতেই অন্বয়ী পদ্ধতি মূলত নিরীক্ষণের পদ্ধতি।

শিক্ষার্থীর কাজ : অন্বয়ী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্রটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কার্য-কারণ সম্পর্কের যে পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুসন্ধেয় ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্তে সাধারণভাবে উপস্থিত পূর্ববর্তী বিষয়কে কারণ আর পরবর্তী বিষয়কে কার্য হিসেবে অনুমান করা হয় তাকে অন্বয়ী পদ্ধতি বলে। নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করেই অন্বয়ী পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাই নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণই হলো অন্বয়ী পদ্ধতির মূল ভিত্তি। এই পদ্ধতিটি একক অন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য এবং পরিসর খুবই ব্যাপক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদ জে. এস. মিল প্রবর্তিত পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে-
(ক) ব্যতিরেকী পদ্ধতি (খ) যৌথ পদ্ধতি
(গ) পরিশেষ পদ্ধতি (ঘ) অন্বয়ী পদ্ধতি

২। নিচের কোনটি অন্বয়ী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নয় ?
(ক) পরীক্ষণমূলক (খ) পরিসর ব্যাপক
(গ) একক অন্বয় (ঘ) সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য

৩। অন্বয়ী পদ্ধতির-
(i) মূল ভিত্তি নিরীক্ষণ (ii) পরিসর ব্যাপক
(iii) অর্থ মিলের পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ অন্বয়ী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা
(Advantages and Disadvantages of the Method of Agreement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- অন্বয়ী পদ্ধতির সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অন্বয়ী পদ্ধতির অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অন্বয়ী পদ্ধতির সুবিধা
(Advantages of the Method of Agreement)

অন্বয়ী পদ্ধতি একটি সহজ-সরল পদ্ধতি বলে এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। নিম্নে এ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো-

১। **পরিসর ব্যাপক :** অন্বয়ী পদ্ধতির পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ প্রকৃতির অনেক ঘটনা আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি না বলে এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সম্ভব হয় না। কিন্তু নিরীক্ষণধর্মী পদ্ধতি হওয়ার কারণে এসব ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনুসন্ধানাধীন ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি।

২। **প্রকল্প গঠনে সহায়ক :** যে কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলো প্রকল্প গঠন। অন্বয়ী পদ্ধতিটি এক্ষেত্রে বৈধ প্রকল্প গঠনে সহায়তা করে থাকে।

৩। **কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায় :** অন্বয়ী পদ্ধতিতে কোনো একটি ঘটনাকে কারণ হিসেবে ধরে নিয়ে যেমন এর কার্য আবিষ্কার করা যায়, তেমনিভাবে কোনো ঘটনাকে কার্য বলে ধরে নিয়ে তার কারণও খুঁজে বের করা যায়। অর্থাৎ এটির সাহায্যে কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায়।

৪। **অন্যান্য পদ্ধতির সহায়ক :** এ পদ্ধতিটি অন্যান্য পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে বলে সব আরোহী পদ্ধতিই কোনো না কোনোভাবে এর উপর নির্ভরশীল। তাই এটি অন্যান্য সকল পদ্ধতি বিশেষ করে সব আরোহী পদ্ধতির সহায়ক।

৫। **সহজ পদ্ধতি :** অন্বয়ী পদ্ধতি একটি সহজ-সরল পদ্ধতি। কেননা নিরীক্ষণধর্মী পদ্ধতি হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি।

৬। **বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না :** অন্বয়ী পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ঘটনা নিরীক্ষণ করেই কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এর জন্য কোনো প্রকার গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না এবং কোনো প্রকার যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করতে হয় না। তাই এ পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

৭। **ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক :** অন্বয়ী পদ্ধতি নিরীক্ষণমূলক হয় বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত না হয়ে সম্ভাব্য হয়। আর ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে অন্বয়ী পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়। যাচাইয়ের মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় যে, সে সিদ্ধান্ত বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তাহলে তা তত্ত্বের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং অন্বয়ী পদ্ধতি এভাবে প্রাথমিক বা সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

অন্বয়ী পদ্ধতির অসুবিধা
(Disadvantages of the Method of Agreement)

অন্বয়ী পদ্ধতি একটি সহজ-সরল পদ্ধতি বলে এর বেশ কিছু সুবিধা থাকলেও কিছু অসুবিধা বা ত্রুটি রয়েছে। নিম্নে এ পদ্ধতির অসুবিধা বা ত্রুটিসমূহ তুলে ধরা হলো-

১। **বহুকারণ দোষ বা প্রকৃতিগত ত্রুটি :** অন্বয়ী পদ্ধতি অনেক সময় বহুকারণবাদ দ্বারা ব্যর্থ হতে পারে। এই দোষটিকে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত ত্রুটি (characteristic imperfection) বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এই দোষটি এ পদ্ধতির স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। বহুকারণবাদ অনুসারে একই কার্য বিভিন্ন কারণ দ্বারা সংঘটিত হতে পারে। এমতাবস্থায় অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ক্ষেত্র বিশেষে হয়তো দেখা যাবে যে, অপরিবর্তনীয় সাধারণ পূর্বগটি কারণ নয়, শুধুমাত্র একটি আকস্মিক আগন্তুক। যেমন, তিনজন রোগীকে একই রঙের সিরাপের সাথে তিন ধরনের ওষুধ মিশিয়ে প্রয়োগ করে সুস্থ করা হলো। এক্ষেত্রে সাধারণ পূর্বগ সিরাপই রোগ মুক্তির কারণ বলে অনুমিত হতে পারে। অথচ এখানে মূল কারণটি হলো বিভিন্ন ধরনের ওষুধ।

প্রকৃতিগত ত্রুটি প্রতিকারের উপায় : দু'টি উপায়ে অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত ত্রুটি বা বহুকারণবাদজনিত ত্রুটির প্রতিকার করা যায়; যথা-

(ক) দৃষ্টান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি : দৃষ্টান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। কেননা অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগের সময় আমরা যদি এক সাথে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করি এবং একটি বিশেষ অবস্থাকে সব সময়ই আলোচ্য ঘটনার সাথে ঘটতে দেখি তাহলে উক্ত অবস্থাটি কার্য বা কারণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(খ) যৌথ পদ্ধতির প্রয়োগ : অনেক সময় অন্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় না। কিন্তু যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে দু'দিক থেকে একসাথে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। অর্থাৎ এতে সদর্থক ও নঞর্থক এ দু'ধরনের দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে এর সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয়। তাই যৌথ পদ্ধতির প্রয়োগ করে অন্বয়ী পদ্ধতির ত্রুটি দূর করা যেতে পারে।

২। **ব্যবহারিক ত্রুটি :** অন্বয়ী পদ্ধতি একটি নিরীক্ষণধর্মী পদ্ধতি। কিন্তু নিরীক্ষণধর্মী হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ক্ষেত্রে সব কিছু পরিপূর্ণভাবে যাচাই করা সম্ভব হয় না। তাই এ পদ্ধতির সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গেলে আমাদের নিরীক্ষণ থেকে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়তে পারে, অন্যদিকে তেমনি অপ্রয়োজনীয় বিষয় আমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটতে পারে। যেমন- যাদের মাথা বড় তারা বেশি বুদ্ধিমান। এ যুক্তিটিতে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি সংঘটিত হয়েছে। কারণ প্রদত্ত যুক্তিটির সিদ্ধান্ত অনুমান করার ক্ষেত্রে যদি আরও দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করা হতো তাহলে হয়তো এমন লোক পাওয়া যেতো যার মাথা বড় কিন্তু বুদ্ধি কম এবং মাথা ছোট কিন্তু বুদ্ধি বেশি।

ব্যবহারিক ত্রুটি প্রতিকারের উপায় : দৃষ্টান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অন্বয়ী পদ্ধতির ব্যবহারিক ত্রুটি দূর করা যেতে পারে। কেননা অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগের সময় আমরা যদি এক সাথে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করি এবং একটি বিশেষ অবস্থাকে সব সময়ই আলোচ্য ঘটনার সাথে ঘটতে দেখি তাহলে উক্ত অবস্থাটি কার্য বা কারণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

৩। **অন্বয়ী পদ্ধতি কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ :** এ পদ্ধতিতে অনেক সময় কোনো ঘটনার সহ-কার্যকে ভুল করে এর কারণ বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র একসাথে পরিবর্তিত হলেই বা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেই অনেক সময় সেগুলো কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় না। যেমন- দিন ও রাত্রির ঘটনা দু'টিকে এ পদ্ধতি অনুসারে একটিকে অপরটির কারণ বা কার্য বলে মনে করা হতে পারে। আসলে এ দু'টির কোনোটিই একটি অপরটির কারণ বা কার্য নয়। বস্তুত এ দু'টি একই কারণের সহ-কার্য মাত্র। আর এ সহ-কার্যের কারণ হলো পৃথিবীর আহ্নিক গতি। সুতরাং অন্বয়ী পদ্ধতি কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ।

শিক্ষার্থীর কাজ : অন্বয়ী পদ্ধতির সুবিধাগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

অন্বয়ী পদ্ধতি একটি সহজ-সরল পদ্ধতি বলে এর বেশ কিছু সুবিধা থাকলেও কিছু অসুবিধা বা ত্রুটিও রয়েছে। এ পদ্ধতির সুবিধাগুলো হলো- এটি প্রকল্প গঠনে সহায়ক, সহজ পদ্ধতি, ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপুরক, এতে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না এবং এর সাহায্যে কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায়। অন্যদিকে এর অসুবিধাগুলো হলো-এর প্রকৃতিগত ত্রুটি, ব্যবহারিক ত্রুটি এবং কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি অন্বয়ী পদ্ধতির সুবিধা নয় ?
(ক) পরিসর ব্যাপক (খ) প্রকল্প গঠনে সহায়ক
(গ) ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপুরক (ঘ) ব্যবহারিক ত্রুটি

২। কয়টি উপায়ে অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত ত্রুটি বা বহুকারণবাদজনিত ত্রুটির প্রতিকার করা যায় ?
(ক) দু'টি (খ)তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৩। অন্বয়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়গুলো হলো-
(i) প্রকৃতিগত ত্রুটি (ii) পরিসর ব্যাপক
(iii) কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ অন্বয়ী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of Improper Application of the Method of Agreement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- অন্বয়ী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অন্বয়ী পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

অন্বয়ী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of Improper Application of the Method of Agreement)

অন্বয়ী পদ্ধতি মূলত নিরীক্ষণের পদ্ধতি বলে এতে অনিরীক্ষণজনিত ও কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তিসমূহ ঘটে থাকে। এ পদ্ধতিতে সাধারণত যে সকল অনুপপত্তি ঘটে থাকে সেগুলো হলো-ক. প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি; খ. দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি; গ. শর্তকে কারণ মনে করা সংক্রান্ত অনুপপত্তি; ঘ. সহ-কার্যকে কারণ মনে করা সংক্রান্ত অনুপপত্তি এবং ঙ. অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি।

ক. প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : কলেজের অধ্যক্ষ যতবার খেলার মাঠে উপস্থিত থেকেছেন ততবারই কলেজ ফুটবল দল খেলায় জয় লাভ করেছে। অতএব খেলার মাঠে কলেজের অধ্যক্ষের উপস্থিতিই খেলায় জয়ের কারণ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সব প্রয়োজনীয় ও মৌলিক অবস্থা নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন সে সব প্রয়োজনীয় ও মৌলিক অবস্থা যদি অনিরীক্ষিত থেকে যায় তাহলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি বলে। আলোচ্য যুক্তিটি অন্বয়ী পদ্ধতির নিরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে এর সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় অবস্থাবলি যেমন পুরোপুরি অপসারণ করা সম্ভব হয় না, তেমনি প্রয়োজনীয় অবস্থাবলিও যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এ যুক্তি অনুসারে কলেজের অধ্যক্ষ যতবার খেলার মাঠে উপস্থিত থেকেছেন ততবারই কলেজ ফুটবল দল খেলায় জয় লাভ করেছে। অর্থাৎ খেলার মাঠে কলেজের অধ্যক্ষের উপস্থিতির উপর খেলায় জয়ী হওয়া নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবে কলেজের অধ্যক্ষের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর খেলার জয়-পরাজয়ের কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। দলের জয়-পরাজয় মূলত নির্ভর করে নিজ দলের খেলোয়াড়দের পারদর্শিতা, খেলোয়াড়দের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বিপক্ষ দলের শক্তি-সামর্থ্যের উপর। কিন্তু প্রদত্ত যুক্তিটির সিদ্ধান্ত অনুমান করার ক্ষেত্রে এসব প্রয়োজনীয় ও মৌলিক অবস্থাসমূহ নিরীক্ষণ করা হয়নি। ফলে যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটেছে।

খ. দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : টেলিগ্রাম অশুভ। কারণ এটি মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সব দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন সে সব দৃষ্টান্ত যদি অনিরীক্ষিত থেকে যায় তাহলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি বলে। আলোচ্য যুক্তিটি অন্বয়ী পদ্ধতির নিরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুক্তি অনুসারে যতবার টেলিগ্রাম এসেছে ততবারই তা মৃত্যু সংবাদ বয়ে নিয়ে এসেছে। আর এ সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে যে, টেলিগ্রাম

অশুভ। অর্থাৎ এখানে টেলিগ্রামের সাথে মৃত্যু সংবাদের একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু প্রদত্ত যুক্তিটির সিদ্ধান্ত অনুমান করার ক্ষেত্রে যদি আরও দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করা হতো তাহলে হয়তো এমন টেলিগ্রাম আসতো যা অশুভ সংবাদ বহন করে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষিত থেকে গিয়েছে। ফলে যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটেছে।

গ. শর্তকে কারণ মনে করা সংক্রান্ত অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : 'পুলিশ ফাঁড়ি অপসারণই অপরাধ বৃদ্ধির কারণ'।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : অন্বয়ী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এতে শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো যুক্তিতে যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে প্রকৃত কারণের পরিবর্তে শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি বলে। সাধারণত অন্বয়ী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এ অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য যুক্তিটিতে অন্বয়ী পদ্ধতির নিরীক্ষণাত্মক অসতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এ যুক্তিটির ভিত্তি হলো একটি নিরীক্ষণমূলক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে যে, 'পুলিশ ফাঁড়ি অপসারণই অপরাধ বৃদ্ধির কারণ'। কিন্তু এ যুক্তিটিতে নিরীক্ষণমূলকভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করার সময় অপরাধ প্রবণতার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবস্থা যেমন- এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি অপরিবর্তিত ছিল কী-না তা নিরীক্ষণ করা হয়নি। সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঘ. সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : বিদ্যুৎ চমকানোই বজ্রপাতের কারণ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে যদি ভুল করে একটি ঘটনার সহ-কার্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তাতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি বলে। অন্বয়ী পদ্ধতিটি যখন কার্য-কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হয় তখন এতে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য যুক্তিটির ক্ষেত্রে দু'টি ঘটনা তথা বিদ্যুৎ চমকানো ও বজ্রপাতকে সব সময় সহ-অবস্থান করতে দেখে অন্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ চমকানোকে বজ্রপাতের কারণ মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে দুটি ঘটনা সর্বদা এক সাথে বা পূর্বাপর ঘটতে দেখে ঘটনা দু'টির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র একসাথে বা পূর্বাপর ঘটলেই অনেক সময় সেগুলো কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় না। আসলে বিদ্যুৎ চমকানো ও বজ্রপাত কোনোটিই একটি অপরটির কারণ বা কার্য নয়। বস্তুত এ দু'টি একই কারণের সহ-কার্য মাত্র। আর এ সহ-কার্যের কারণ হলো মেঘের ঘর্ষণ। সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ঙ. অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : আমি এ যাবৎ যত কাঁচা আম খেয়েছি সবই টক। অতএব, কাঁচা আম হয় টক।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে যদি অল্প সংখ্যক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় তাহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি বলে। আলোচ্য যুক্তিটি অন্বয়ী পদ্ধতির নিরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এ যুক্তি অনুসারে যত কাঁচা আম খাওয়া হয়েছে তার সবই

টক। কাঁচা আম খাওয়া ও টক হওয়াকে কয়েকটি দৃষ্টান্তে পর্যবেক্ষণ করেই এখানে এদের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু প্রদত্ত যুক্তিটির সিদ্ধান্ত অনুমান করার ক্ষেত্রে যদি আরও দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করা হতো তাহলে হয়তো এমন কাঁচা আম পাওয়া যেতো যা কাঁচা হলেও টক নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করা হয়নি। ফলে যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি ঘটেছে।

অন্বয়ী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট আরও কতিপয় অনুপপত্তি

১। আম খাওয়াই ফোঁড়া হওয়ার কারণ
২। শীতের পরই আসে বসন্ত। অতএব, শীত বসন্তের কারণ।
৩। কটাচুল বিশিষ্ট লোকেরা বদমেজাজী হয়।
৪। মস্তিষ্কে মারাত্মক আঘাত লাগাই সংজ্ঞাহীনতার কারণ।
৫। মশার কামড়ই ডেঙ্গু জ্বরের কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ : অন্বয়ী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তিসমূহের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

অন্বয়ী পদ্ধতি মূলত নিরীক্ষণের পদ্ধতি বলে এতে অনিরীক্ষণজনিত ও কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তিসমূহ ঘটে থাকে। এ পদ্ধতিতে সাধারণত যে সকল অনুপপত্তি ঘটে থাকে সেগুলো হলো- প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি; দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি; শর্তকে কারণ মনে করা সংক্রান্ত অনুপপত্তি; সহ-কার্যকে কারণ মনে করা সংক্রান্ত অনুপপত্তি এবং অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। 'টেলিগ্রাম অশুভ। কারণ এটি মৃত্যু সংবাদ বয়ে আনে'-এটি কোন্ ধরনের অনুপপত্তি নির্দেশ করে?
(ক) প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণজনিত অনুপপত্তি (খ) সহ-কার্যকে কারণ মনে করা সংক্রান্ত অনুপপত্তি
(গ) দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি (ঘ) শর্তকে কারণ মনে করা সংক্রান্ত অনুপপত্তি

২। নিচের কোন যুক্তিটি অধিক সম্ভাব্য?
(ক) আম খাওয়াই ফোঁড়া হওয়ার কারণ (খ) মস্তিষ্কে মারাত্মক আঘাত লাগাই সংজ্ঞাহীনতার কারণ
(গ) কটাচুল বিশিষ্ট লোকেরা বদমেজাজী হয় (ঘ) শীতের পরই আসে বসন্ত। অতএব, শীত বসন্তের কারণ

৩। অন্বয়ী পদ্ধতিতে সাধারণত যে সকল অনুপপত্তি ঘটে থাকে সেগুলো হলো-
(i) অবৈধ সার্বিকীকরণ অনুপপত্তি (ii) শর্তকে কারণ মনে করা সংক্রান্ত অনুপপত্তি
(iii) কাকতালীয় অনুপপত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৭ ব্যতিরেকী পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র (The Method of Difference, Its Nature and Principles of Elimination)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্যতিরেকী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রকৃতি বুঝতে পারবেন।
- এর অপনয়ন সূত্র জানতে পারবেন।

ব্যতিরেকী পদ্ধতি (The Method of Difference)

কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণের জন্য যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) যে সব পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন সেগুলোর মধ্যে ব্যতিরেকী পদ্ধতি অন্যতম। বস্তুত অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত ত্রুটি দূর করার জন্য তিনি ব্যতিরেকী পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। ব্যতিরেকী পদ্ধতির শব্দগত অর্থ হলো পার্থক্যের পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত থাকে। এর একটিতে আলোচ্য ঘটনা ও তার সাথে অন্য একটি অবস্থা উপস্থিত থাকে। আবার অপরটিতে আলোচ্য ঘটনা এবং ঐ বিশেষ অবস্থা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকে এবং শুধুমাত্র একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকে। আর পার্থক্যের বিষয়টি হলো আলোচ্য ঘটনা ও একটি অবস্থার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি। এ পার্থক্যের ভিত্তিতেই ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে ঘটনাটির সাথে ঐ অবস্থার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

ব্যতিরেকী পদ্ধতি সম্পর্কিত উপর্যুক্ত ধারণার আলোকে এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে পদ্ধতিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অনুসন্ধেয় ঘটনার একটি সদর্থক ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একমাত্র পূর্বগকে কারণ বা কারণের অনিবার্য অংশ এবং অনুগকে কার্য মনে করা হয়, তাকে ব্যতিরেকী পদ্ধতি বলে।

উল্লেখ্য যে, ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রকৃতি অনুযায়ী এটি একটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি। তাই এ পদ্ধতির সহায়তায় কেবলমাত্র কারণ থেকে কার্যে যাওয়ার কথা। যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) যেভাবে পদ্ধটির সূত্র প্রণয়ন করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, এর সাহায্যে একদিকে যেমন কারণ থেকে কার্যে যাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি কার্য থেকেও কারণে যাওয়া যায়। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো-

ব্যতিরেকী পদ্ধতির বাস্তব দৃষ্টান্ত :

(ক) কারণ থেকে কার্য : বায়ুপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ঘন্টা বাজালে ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়। কিন্তু বায়ুশূণ্য পাত্রের মধ্যে ঘন্টা বাজালে ঘন্টাধ্বনি শোনা যায় না। সুতরাং বায়ুই ঘন্টাধ্বনির কারণ।

এ যুক্তিটি ব্যতিরেকী পদ্ধতির একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। যার সাহায্যে কারণ থেকে কার্যে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। কারণ যুক্তিটিতে দেখা যাচ্ছে, যে পাত্রে বায়ুর উপস্থিতি রয়েছে তাতে ঘন্টা বাজালে ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়, আর যে পাত্রে বায়ু অনুপস্থিত তাতে ঘন্টা বাজালে ঘন্টাধ্বনি শোনা যায় না। সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বায়ুর উপস্থিতির সাথে ঘন্টাধ্বনি শোনার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ বায়ুর উপস্থিতি হচ্ছে কারণ এবং ঘন্টাধ্বনি হচ্ছে এর কার্য।

(খ) কার্য থেকে কারণ : মস্তিষ্কের একটি অংশ অপসারিত হলে শরীরের ডান হাত অবশ হয়ে যায়। সুতরাং মস্তিষ্কের একটি অংশ অপসারণই হলো শরীরের ডান হাত অবশ হয়ে যাওয়ার কারণ।

এ যুক্তিটিও ব্যতিরেকী পদ্ধতির একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। যার সাহায্যে কার্য থেকে কারণে যাওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। কেননা এ যুক্তি অনুযায়ী মস্তিষ্কের সব অংশ ঠিক থাকলে শরীরেরও সব অংশ ঠিক থাকে। এটি এ যুক্তির একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত। কিন্তু মস্তিষ্কের একটি অংশ অপসারিত হলে শরীরের ডান হাত অবশ হয়ে যায়। এটি হলো যুক্তিটির নঞর্থক দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্ত দু'টিতে একমাত্র ব্যতিরেকী বা অমিল হলো মস্তিষ্কের একটি অংশের অপসারণ। সুতরাং শরীরের ডান হাত অবশ হয়ে যাওয়ার সাথে মস্তিষ্কের একটি অংশের অপসারণ কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ। অর্থাৎ শরীরের ডান হাত অবশ হয়ে যাওয়া হচ্ছে কার্য এবং মস্তিষ্কের একটি অংশের অপসারণ এর কারণ।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাংকেতিক দৃষ্টান্ত :

সদর্থক দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্ত	পূর্ববর্তী ঘটনা	পরবর্তী ঘটনা
প্রথম দৃষ্টান্ত	ক খ গ	প ফ ব
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	খ গ	ফ ব

উল্লেখিত ছকে লক্ষণীয় যে, প্রথম দৃষ্টান্তে পূর্ববর্তী ঘটনায় 'ক' থাকার কারণে পরবর্তী ঘটনায় 'প' রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে পূর্ববর্তী ঘটনায় 'ক' অনুপস্থিত থাকার কারণে পরবর্তী ঘটনায় 'প' অনুপস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'ক' এবং 'প' ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মিল রয়েছে। সুতরাং 'ক' এবং 'প' হচ্ছে একে অপরের কারণ বা কার্য।

নঞর্থক দৃষ্টান্ত

দৃষ্টান্ত	পূর্ববর্তী ঘটনা	পরবর্তী ঘটনা
প্রথম দৃষ্টান্ত	খ গ	ফ ব
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	ক খ গ	প ফ ব

উল্লিখিত ছকে লক্ষণীয় যে, প্রথম দৃষ্টান্তে পূর্ববর্তী ঘটনায় 'ক' অনুপস্থিত থাকার কারণে পরবর্তী ঘটনায় 'প' অনুপস্থিত রয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে পূর্ববর্তী ঘটনায় 'ক' উপস্থিত থাকার কারণে পরবর্তী ঘটনায় 'প' উপস্থিত রয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 'ক' এবং 'প' ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মিল রয়েছে। সুতরাং 'ক' এবং 'প' হচ্ছে একে অপরের কারণ বা কার্য।

ব্যতিরেকী পদ্ধতি সম্পর্কে মিল-এর সূত্র :

যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে যেভাবে ব্যতিরেকী পদ্ধতির সূত্র প্রদান করেছেন তা হলো- " অনুসন্ধেয় ঘটনাটি ঘটে এমন একটি দৃষ্টান্ত এবং তা ঘটেনা না এমন একটি দৃষ্টান্তের মধ্যে যদি একটি বিষয় ছাড়া দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে অপর সকল বিষয়ে মিল থাকে এবং অমিলের বিষয়টি শুধু প্রথম দৃষ্টান্তেই বিদ্যমান থাকে, তাহলে দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে যে বিষয়ে অমিল, সে বিষয়টিই অনুসন্ধেয় ঘটনার কার্য বা কারণ অথবা কারণের অপরিহার্য অংশ।" ("If an instance in which the phenomenon under investigation occurs and an instance in which it does not occur, have every circumstance in common save one, that one occurring only in the former; the circumstance, in which alone the two instances differ is the effect, or the cause, or an indispensable part of the cause of the phenomenon."1889, p-256)।

ব্যতিরেকী পদ্ধতি সম্পর্কে মেলন-এর সূত্র :

যুক্তিবিদ মেলন (Mellone) তাঁর *An Introductory Textbook of Logic* গ্রন্থে বলেন, "যখন কোনো ঘটনার সাথে কোনো উপাদান যোগ দ্বারা কোনো একটি বিশেষ ঘটনার আবির্ভাব ঘটে, অথবা বিয়োগ দ্বারা তার তিরোভাব ঘটে এবং অন্য সকল অবস্থা একই রকম থাকে, তাহলে উক্ত উপাদান ঘটনাটির সাথে কার্য-কারণ সম্পর্কে যুক্ত।" ("When the addition of an agent is followed by the appearance, or its subtraction by the disappearance of a certain event, other circumstances remaining the same, that agent is causally connected with the event." 1902, p.274)

ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রকৃতি (The Nature of the Method of Difference) : ব্যতিরেকী পদ্ধতির সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়-

প্রথমত, ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের বা প্রমাণের জন্য শুধুমাত্র দু'টি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়। এই দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে একটি সদর্থক এবং অন্যটি নঞর্থক। সদর্থক দৃষ্টান্তে সব সময় আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত থাকে এবং নঞর্থক দৃষ্টান্তে সব সময় আলোচ্য ঘটনাটি অনুপস্থিত থাকে।
দ্বিতীয়ত, ব্যতিরেকী পদ্ধতির সদর্থক এবং নঞর্থক দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে কেবলমাত্র একটি বিষয়ে অমিল বা পার্থক্য থাকে, অবশিষ্ট সব বিষয়ে মিল থাকে। এই অমিলের বিষয়টি সদর্থক দৃষ্টান্তে উপস্থিত থাকে, নঞর্থক দৃষ্টান্তে নয়। আর দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে একমাত্র অমিল বা পার্থক্যের বিষয়টিই আলোচ্য ঘটনার কারণ বা কার্য।
তৃতীয়ত, এ পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে একটি বিষয়ে অমিল থাকলেও অন্যান্য সকল বিষয়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় মিল থাকে।

চতুর্থত, ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে যে দু'টি দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে অবশ্যই নির্বাচনযোগ্য ও নিয়ন্ত্রণযোগ্য হতে হবে।

পঞ্চমত, এ পদ্ধতিতে কেবলমাত্র একটি বিষয়ে ব্যতিরেকী বা পার্থক্যমূলক সম্পর্কের ভিত্তিতে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়। এ কারণেই যুক্তিবিদ কফি ও মেলোন একে একক ব্যতিরেকী পদ্ধতি বলে অভিহিত করেন।
ষষ্ঠত, ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে ব্যবহৃত দৃষ্টান্তগুলো পরীক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় বলে এ পদ্ধতি মূলত পরীক্ষণের পদ্ধতি।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র (Principles of Elimination of the Method of Difference) : অনুসন্ধেয় ঘটনা থেকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ দেয়ার উদ্দেশ্যে যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic-Induction* গ্রন্থে ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র প্রদান করতে গিয়ে বলেন, "যদি অনুগের অন্তর্ধান না ঘটিয়ে পূর্বগকে অপসারণ না করা যায়, তাহলে সে পূর্বগটি অবশ্যই কারণ বা কারণের অংশ।"("When an antecedent cannot be left out without the consequent disappearing, such antecedent must be the cause or part of the cause." 1870, P-48)।

যুক্তিবিদ বেইন (Bain) এর এ সূত্রটির অর্থ হলো, কোনো ঘটনা থেকে আমরা যদি একটি বিশেষ অবস্থা অপসারণ করার পর দেখতে পাই যে, এর ফলে অপর একটি অবস্থাও অপসারিত হয়েছে অথচ ঐ ঘটনার অন্য সব অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে যে উক্ত অবস্থার সাথে অপসারিত অবস্থার কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে।

শিক্ষার্থীর কাজ : ব্যতিরেকী পদ্ধতি সম্পর্কে মিল-এর সূত্রটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত ত্রুটি দূর করার জন্য যুক্তিবিদ জে. এস. মিল ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন। যে পদ্ধতিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অনুসন্ধেয় ঘটনার একটি সদর্থক ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একমাত্র পূর্বগকে কারণ বা কারণের অনিবার্য অংশ এবং অনুগকে কার্য মনে করা হয়, তাকে ব্যতিরেকী পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত থাকে। এর একটিতে আলোচ্য ঘটনা ও তার সাথে অন্য একটি অবস্থা উপস্থিত থাকে। আবার অপরটিতে আলোচ্য ঘটনা এবং ঐ বিশেষ অবস্থা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকে এবং শুধুমাত্র একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকে। আর পার্থক্যের বিষয়টি হলো আলোচ্য ঘটনা ও একটি অবস্থার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি। এ পার্থক্যের ভিত্তিতেই ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে ঘটনাটির সাথে ঐ অবস্থার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। যুক্তিবিদ মিল ও মেলন ব্যতিরেকী পদ্ধতির সূত্র প্রদান করেছেন এবং যুক্তিবিদ বেইন এর অপনয়ন সূত্র প্রদান করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে ক'টি দৃষ্টান্ত থাকে?

(ক) একটি (খ) দু'টি

(গ) তিনটি (ঘ) চারটি

২।

দৃষ্টান্ত	পূর্ববর্তী ঘটনা	পরবর্তী ঘটনা
প্রথম দৃষ্টান্ত	ক খ গ	প ফ ব
দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত	খ গ	ফ ব

উপরিউক্ত ছকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির কোন প্রকারের দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে?

(ক) সদর্থক (খ) নঞর্থক

(গ) ব্যহতার্থক (ঘ) ভাবার্থক

৩। ব্যতিরেকী পদ্ধতির সূত্র প্রদান করেছেন-

(i) মিল (ii) বেইন

(iii) মেলোন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৮ ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Method of Difference)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of the Method of Difference)

পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি হওয়ায় ব্যতিরেকী পদ্ধতির যেমন বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে তেমনি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো :

১। **সহজ পদ্ধতি :** ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন, একটি সদর্থক ও একটি নঞর্থক। এর একটিতে আলোচ্য ঘটনা ও তার সাথে অন্য একটি অবস্থা উপস্থিত থাকে। আবার অপরটিতে আলোচ্য ঘটনা এবং ঐ বিশেষ অবস্থা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। এ ধরনের মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে পারলেই এ পদ্ধতির সাহায্যে খুব সহজেই কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় ও প্রমাণ করা যায়।

২। **অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত প্রমাণে সহায়ক :** অন্বয়ী পদ্ধতিসহ অন্যান্য পদ্ধতি থেকে অনুসন্ধেয় ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কে যে আভাস পাওয়া যায়, ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে তা যাচাই ও প্রমাণ করা যায়। অর্থাৎ এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত প্রমাণে সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে।

৩। **নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় :** ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে অন্যান্য অবস্থাবলি অপরিবর্তিত রেখে একটি বিশেষ অবস্থার উপস্থিতিতে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয় এবং ঐ বিশেষ অবস্থার অনুপস্থিতিতে আর একবার এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হয়। এভাবে পরীক্ষণের ভিত্তিতে এ পদ্ধতির সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়।

৪। **কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় :** অন্বয়ী পদ্ধতিতে কয়েকটি দৃষ্টান্তে অনুসন্ধেয় ঘটনার সাথে আরও একটি অবস্থাকে উপস্থিত থাকতে দেখে এদের মধ্যকার 'কার্য-কারণ সম্পর্ক' সম্বন্ধে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়। আর ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে নঞর্থক দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে ঐ ধারণাটিকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর ফলে অন্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যে আবিষ্কৃত কার্য-কারণ সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ব্যতিরেকী পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। সুতরাং ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক কেবলমাত্র আবিষ্কারই করা হয় না, বরং একে প্রমাণও করা হয়।

৫। **পরিবেশ সুনিয়ন্ত্রিত থাকে :** ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরীক্ষণ কার্য পরিচালনা করা যায় বলে এক্ষেত্রে ধীর-স্থিরভাবে ও পুনরাবৃত্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

৬। **অনুপপত্তি ঘটে না :** এ পদ্ধতিতে ধীর-স্থিরভাবে ও পুনরাবৃত্তির ভিত্তিতে কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয় বলে এতে অনুপপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

৭। **অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত যাচাই করা যায় :** ব্যতিরেকী পদ্ধতি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি হওয়ায় এর সাহায্যে নিরীক্ষণমুলক পদ্ধতিসমূহের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই ও প্রতিপাদন করা যায়। অর্থাৎ এ পদ্ধতির মাধ্যমে অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত যাচাই করা যায়।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসুবিধা
(Disadvantages of the Method of Difference)

১। **ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত :** আমরা জানি, ব্যতিরেকী পদ্ধতি হচ্ছে মূলত একটি পরীক্ষণের পদ্ধতি। আর এ কারণেই যে সব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সম্ভব নয়, সে সব ক্ষেত্রে ব্যতিরেকী পদ্ধতিও প্রয়োগ করা যায় না। অর্থাৎ ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত।

২। **কার্য থেকে কারণে যাওয়া যায় না :** ব্যতিরেকী পদ্ধতি একটি পরীক্ষণের পদ্ধতি বলে পরীক্ষণের অসুবিধাগুলোও এর মধ্যে রয়েছে। এ পদ্ধতির সাহায্যে কেবল কোনো একটি জ্ঞাত কারণ থেকে এর কার্যকে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। কিন্তু এর সাহায্যে কোনো কার্য থেকে সরাসরি এর কারণ আবিষ্কার করা যায় না।

৩। **কাকতালীয় অনুপপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে :** ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে সাধারণত দু'টি ঘটনার একটিকে অপরটির পূর্বে ঘটতে দেখে আমরা পূর্ববর্তী ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ বলে ধরে নেই। কিন্তু বাস্তবে হয়তো এদের মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্কই থাকে না। যেমন- ব্যবসায়ী পিতার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করার পরপরই ব্যবসার উন্নতি ঘটতে থাকলে যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন করাকে ব্যবসার উন্নতির কারণ মনে করা হয়, তবে এতে কাকতালীয় অনুপপত্তি ঘটবে। কারণ এ অনুমান প্রক্রিয়ায় পূর্বগ 'পুত্র সন্তান জন্মগ্রহন'-এর সাথে অনুগ 'ব্যবসার উন্নতি'-এর কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা না করেই ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক ও নিরীক্ষণমূলক প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্তটি অনুমান করা হয়েছে।

৪। **প্রয়োগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য :** পরীক্ষণের পদ্ধতি বলে ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট অবস্থাবলি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আবার এতে অনেক সময় যান্ত্রিক কলা-কৌশল ব্যবহার করেও ঘটনা সৃষ্টি করতে হয়। সুতরাং এ পদ্ধতির প্রয়োগ মোটেই সহজসাধ্য নয়; বরং কষ্টসাধ্য ও দুরূহ।

৫। **বহুকারণের সম্ভাবনা থেকে যায় :** ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে আমরা শুধু এটুকুই প্রমাণ করতে পারি যে, কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে পূর্বগামী ঘটনা এর অনুগামী ঘটনার কারণ। কিন্তু ঐ পূর্বগামী ঘটনাই যে এর একমাত্র কারণ, তা প্রমাণ করা যায় না। যেমন- একই কার্য 'মৃত্যু' বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণ যথা; বিষপান, ফাঁসি, ক্যান্সার, দুর্ঘটনা, অনাহার, অস্ত্রাঘাত ইত্যাদি থেকে ঘটতে পারে। তাই ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে বহুকারণের সম্ভাবনা থেকে যায় বলে এর সিদ্ধান্ত যথার্থ নাও হতে পারে।

৬। **দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে :** আমরা জানি যে, কারণ হলো কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শর্তের সমষ্টি। অনেক সময় পূর্বাপর দু'টি ঘটনার মধ্যে সময়ের একটি বড় ব্যবধান থাকলেও বিষয়টি লক্ষ্য না করেই আমরা ঘটনা দু'টির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করি। যেমন- আমরা যদি ভালো বৃষ্টিপাতকে কৃষকের সমৃদ্ধির কারণ বলে মনে করি, তাহলে এক্ষেত্রে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটবে। কেননা, ভালো বৃষ্টিপাতের ফলে ভালো ফসল হয়, আর ভালো ফসল হলে কৃষকেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল হয় এবং এর ফলে তাদের জীবনে সমৃদ্ধি আসে। সতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভালো বৃষ্টিপাত কৃষকের সমৃদ্ধির কারণ নয়; বরং একটি দূরবর্তী শর্ত মাত্র যা সরাসরি কার্য সংঘটন করতে পারে না। তাই কোনো ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করা হলে তাতে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে থাকে।

৭। **শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে :** আমরা জানি যে, কারণ হলো কার্যের পূর্ববর্তী শর্তসমূহের সমষ্টি। অর্থাৎ একটি কারণ একাধিক বা অনেকগুলো শর্তের সমষ্টি হতে পারে। কিন্তু অনেক সময় ভুল করে আমরা একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করি। যেমন- তরকারীতে লবণ দিলে স্বাদ হয়। এটি ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি ভ্রান্ত প্রক্রিয়া। কারণ প্রকৃতপক্ষে তরকারীর বিভিন্ন উপাদান বা শর্ত যেমন-

লবণ, মরিচ, হলুদ, ঝিরা, আদা, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে তরকারীতে স্বাদ উৎপন্ন করে। এগুলোর মধ্যে লবণ একটিমাত্র উপাদান বা শর্ত। তাই শুধুমাত্র লবণকেই তরকারী স্বাদের কারণ বলে গ্রহণ করা হলে এতে শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ : ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্যতিরেকী পদ্ধতির যেমন বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে তেমনি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। এ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ হলো-এটি একটি সহজ পদ্ধতি, এটি অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত প্রমাণে সহায়ক, এর সাহায্যে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত যাচাই করা যায়। অন্যদিকে, এর অসুবিধাসমূহ হলো- এর প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত, এর মাধ্যমে কার্য থেকে কারণে যাওয়া যায় না, এতে বহুকারণের সম্ভাবনা থেকে যায় এবং এর অসতর্ক প্রয়োগে বিভিন্ন ধরনের অনুপপত্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ?
(ক) এটি একটি সহজ পদ্ধতি (খ) এতে বহুকারণের সম্ভাবনা থাকে না
(গ) এর প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত নয় (ঘ) এতে অনুপপত্তি ঘটে না

২। ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসুবিধা কোন্‌টি ?
(ক) নিশ্চিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না (খ) জটিল পদ্ধতি
(গ) অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত প্রমাণে সহায়ক (ঘ) বহুকারণের সম্ভাবনা থেকে যায়

৩। ব্যতিরেকী পদ্ধতির-
(i) সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় (ii) প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত
(iii) বহুকারণের সম্ভাবনা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৯ ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of Improper Application of the Method of Difference)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল জানতে পারবেন।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of Improper Application of the Method of Difference)

আমরা জানি, ব্যতিরেকী পদ্ধতি হলো মূলত পরীক্ষণের পদ্ধতি। তাই পরীক্ষণের সাহায্যে সাধারণত এর দৃষ্টান্তসমূহ সংগ্রহ করা হয়। যখন কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষণ কার্য চালানো সম্ভব না হয়, তখন এ পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য নিরীক্ষণের সাহায্য নেয়া হয়। আর নিরীক্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত হয় বলে এতে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়। ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক বা অপপ্রয়োগের ফলে সাধারণত তিন রকমের অনুপপত্তি ঘটতে পারে। যথা :

(ক) কাকতালীয় অনুপপত্তি;
(খ) একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ও
(গ) দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি।

(ক) কাকতালীয় অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : নববধূর গৃহে আগমনই গৃহকর্তার ব্যবসায় উন্নতির কারণ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এতে কাকতালীয় অনুপপত্তি ঘটেছে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো যুক্তিতে যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা না করে যেকোনো পূর্ববর্তী ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে কাকতালীয় অনুপপত্তি বলে। সাধারণত ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এ অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য যুক্তিটিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণাত্মক অসতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণের চেষ্টা না করে কেবলমাত্র একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। এ যুক্তি অনুসারে যখন গৃহে নববধূ আগমন করেনি, তখন গৃহকর্তার ব্যবসায় উন্নতি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু যখন নববধূ গৃহে আগমন করলো ঠিক তখন থেকেই গৃহকর্তার ব্যবসায় উন্নতি দেখা দিল। উল্লেখ্য ব্যবসার অন্য সব অবস্থা অপরিবর্তিত। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, 'নববধূর আগমনই গৃহকর্তার ব্যবসায় উন্নতির কারণ'। কিন্তু বাস্তবে নববধূর গৃহে আগমন ও ব্যবসায়ে উন্নতির মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ যুক্তিটিতে অসতর্ক নিরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং যুক্তিটি অবৈধ এবং এতে কাকতালীয় অনুপপত্তি ঘটেছে।

প্রদত্ত যুক্তি : আকাশে ধূমকেতুর উদয়ই রাজার মৃত্যুর কারণ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এতে কাকতালীয় অনুপপত্তি ঘটেছে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো যুক্তিতে যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা না করে যেকোনো পূর্ববর্তী ঘটনাকে পরবর্তী ঘটনার কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে কাকতালীয় অনুপপত্তি বলে। সাধারণত ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এ অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য যুক্তিটিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণাত্মক অসতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণের চেষ্টা না করে কেবলমাত্র একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। এ যুক্তি অনুসারে যখন আকাশে ধূমকেতুর উদয় হয়নি, তখন রাজার মৃত্যু অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু যখন আকাশে ধূমকেতুর উদয় হলো, তখন রাজার মৃত্যু হলো। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে, 'আকাশে ধূমকেতুর উদয়ই রাজার মৃত্যুর কারণ'। কিন্তু বাস্তবে 'আকাশে ধূমকেতুর উদয়' ও 'রাজার মৃত্যুর' মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ যুক্তিটিতে অসতর্ক নিরীক্ষণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং যুক্তিটি অবৈধ এবং এতে কাকতালীয় অনুপপত্তি ঘটেছে।

(খ) একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : 'পুলিশ ফাঁড়ি অপসারণই অপরাধ বৃদ্ধির কারণ'।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এতে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো যুক্তিতে যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে প্রকৃত কারণের পরিবর্তে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি বলে। সাধারণত ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এ অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য যুক্তিটিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণাত্মক অসতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এ যুক্তিটির ভিত্তি হলো দু'টি নিরীক্ষণমূলক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। সদর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন পুলিশ ফাঁড়ি ছিল তখন অপরাধ কম সংঘটিত হতো। অন্যদিকে, নঞর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন পুলিশ ফাঁড়ি অপসারণ করা হলো তখন অপরাধ সংঘটনের প্রবণতা বেড়ে গেল। আর এক্ষেত্রে একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত অনুমান করা হলো যে, 'পুলিশ ফাঁড়ি অপসারণই অপরাধ বৃদ্ধির কারণ'। কিন্তু এ যুক্তিটিতে নিরীক্ষণমূলকভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করার সময় অপরাধ প্রবণতার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবস্থা যেমন- এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সুশিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকারত্বের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি অপরিবর্তিত ছিল কী-না তা নিরীক্ষণ করা হয়নি। সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

প্রদত্ত যুক্তি : 'গাছটি বৃষ্টিতে ভেজা ছিল বলেই লোকটি গাছ থেকে পড়ে গেল'।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এতে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো যুক্তিতে যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে প্রকৃত কারণের পরিবর্তে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি বলে। সাধারণত ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এ অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য যুক্তিটিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণাত্মক অসতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এ যুক্তিটির ভিত্তি হলো দু'টি নিরীক্ষণমূলক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। সদর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন গাছটি বৃষ্টিতে ভেজা ছিল তখন লোকটি গাছ থেকে পড়ে গেল। অন্যদিকে, নঞর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন গাছটি বৃষ্টিতে ভেজা ছিল না তখন লোকটি গাছ থেকে পড়ে যায়নি। আর এক্ষেত্রে একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত অনুমান করা হলো যে, 'গাছটি বৃষ্টিতে ভেজা ছিল বলেই লোকটি গাছ থেকে পড়ে গেল'। কিন্তু এ যুক্তিটিতে নিরীক্ষণমূলকভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করার সময় গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অবস্থা যেমন- লোকটির সতর্কতা, পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে কোনো

লোকের উপস্থিতি, ধরার মতো ডালপালার অবস্থান ইত্যাদি বিষয় অপরিবর্তিত ছিল কী-না তা নিরীক্ষণ করা হয়নি। সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

(গ) দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : 'বন্যাই দুর্ভিক্ষের কারণ'

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এতে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো যুক্তিতে যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে প্রকৃত কারণের পরিবর্তে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি বলে। সাধারণত ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এ অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য যুক্তিটিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণাত্মক অসতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এ যুক্তিটির ভিত্তি হলো দু'টি নিরীক্ষণমূলক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। সদর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন বন্যা হলো তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অন্যদিকে, নঞর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন বন্যা হয়নি তখন দুর্ভিক্ষও দেখা দেয়নি। আর এক্ষেত্রে একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত অনুমান করা হলো যে, 'বন্যাই দুর্ভিক্ষের কারণ'। কিন্তু এ যুক্তিটিতে নিরীক্ষণমূলকভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করার সময় বন্যা ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ার মধ্যবর্তী অবস্থাসমূহ বিবেচনায় না এনে একটি দূরবর্তী শর্ত তথা বন্যাকে একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে বন্যার পরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও দুর্ভিক্ষ বন্যার অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা নয়, বরং দূরবর্তী ঘটনা। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মধ্যবর্তী পর্যায় বা ধাপ যেমন- ফসল নষ্ট হয়ে যাওয়া, মজুদ খাদ্য যথাযথভাবে ও দ্রুত বন্যার্ত এলাকয় পৌঁছিয়ে না দেয়া, ত্রাণসামগ্রী বিতরণে দুর্নীতি করা, খাদ্যশস্য আমদানি না করা ইত্যাদি নিরীক্ষণ করা হয়নি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাক্ষাৎ পূর্ববর্তী বিষয় বিবেচনা করা হয়নি। সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

প্রদত্ত যুক্তি : 'পরীক্ষায় ভালো ফলাফলই তার সংসারের সমৃদ্ধির কারণ'।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এতে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো যুক্তিতে যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে প্রকৃত কারণের পরিবর্তে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি বলে। সাধারণত ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগে বা অপপ্রয়োগে এ অনুপপত্তি ঘটে থাকে। আলোচ্য যুক্তিটিতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণাত্মক অসতর্ক প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ এ যুক্তিটির ভিত্তি হলো দু'টি নিরীক্ষণমূলক দৃষ্টান্তের অভিজ্ঞতা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে। সদর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যখন পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলো তখন তার সংসারে সমৃদ্ধি দেখা দিল। অন্যদিকে, নঞর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার পূর্বে তার সংসারে সমৃদ্ধি দেখা দেয়নি। আর এক্ষেত্রে একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত অনুমান করা হলো যে, 'পরীক্ষায় ভালো ফলাফলই তার সংসারের সমৃদ্ধির কারণ'। কিন্তু এ যুক্তিটিতে নিরীক্ষণমূলকভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করার সময় পরীক্ষায় ভালো ফলাফল ও সংসারের সমৃদ্ধি দেখা দেয়ার মধ্যবর্তী অবস্থাসমূহ বিবেচনায় না এনে একটি দূরবর্তী শর্ত তথা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলকে একমাত্র কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আসলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার পরে সংসারের সমৃদ্ধি দেখা দিলেও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা সংসারের সমৃদ্ধির অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনা নয়, বরং দূরবর্তী ঘটনা। এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মধ্যবর্তী পর্যায় বা ধাপ যেমন- ভালোভাবে জীবিকা উপার্জন করা, উপার্জিত অর্থ-সম্পদের সঠিক ব্যবহার করা ইত্যাদি নিরীক্ষণ করা হয়নি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সাক্ষাৎ পূর্ববর্তী বিষয় বিবেচনা করা হয়নি। সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির যথার্থ যুক্তি

প্রদত্ত যুক্তি : 'ক্লোরোফর্ম প্রয়োগই রোগীর চেতনা লোপ পাওয়ার কারণ'।

যুক্তিটির যথার্থতা : যুক্তিটি ব্যতিরেকী পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যুক্তিটির যথার্থতার ব্যাখ্যা : আমরা জানি ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত থাকে। এর একটিতে আলোচ্য ঘটনা ও তার সাথে অন্য একটি অবস্থা উপস্থিত থাকে। আবার অপরটিতে আলোচ্য ঘটনা এবং ঐ বিশেষ অবস্থা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকে এবং শুধুমাত্র একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকে। আর পার্থক্যের বিষয়টি হলো আলোচ্য ঘটনা ও একটি অবস্থার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি। এ পার্থক্যের ভিত্তিতেই ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে ঘটনাটির সাথে ঐ অবস্থার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আলোচ্য যুক্তিটিতে দু'টি দৃষ্টান্ত আছে। এদের একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত। নঞর্থক দৃষ্টান্ত অনুযায়ী রোগীকে যখন ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করা হয়নি তখন তার চেতনা লোপ পায়নি। আর সদর্থক দৃষ্টান্ত অনুযায়ী রোগীকে যখন ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করা হয়েছে তখন তার চেতনা লোপ পেয়েছে। অর্থাৎ এখানে একটি ঘটনার অনুপস্থিতিতে অপর একটি ঘটনার অনুপস্থিতি এবং একটি ঘটনার উপস্থিতিতে অপর একটি ঘটনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ থেকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ ও চেতনা লোপ পাওয়ার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অনুমান করা হয় যে, 'ক্লোরোফর্ম প্রয়োগই রোগীর চেতনা লোপ পাওয়ার কারণ'। ব্যতিরেকী পদ্ধতির এ যুক্তিটি পরীক্ষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ও যুক্তিটি যথার্থ।

প্রদত্ত যুক্তি : 'মস্তিষ্কের একটি অংশ অপসারণ করাই শরীরের একটি অংশ অবশ হওয়ার কারণ'।

যুক্তিটির যথার্থতা : যুক্তিটি ব্যতিরেকী পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যুক্তিটির যথার্থতার ব্যাখ্যা : আমরা জানি ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত থাকে। এর একটিতে আলোচ্য ঘটনা ও তার সাথে অন্য একটি অবস্থা উপস্থিত থাকে। আবার অপরটিতে আলোচ্য ঘটনা এবং ঐ বিশেষ অবস্থা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকে এবং শুধুমাত্র একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকে। আর পার্থক্যের বিষয়টি হলো আলোচ্য ঘটনা ও একটি অবস্থার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি। এ পার্থক্যের ভিত্তিতেই ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে ঘটনাটির সাথে ঐ অবস্থার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। আলোচ্য যুক্তিটিতে দু'টি দৃষ্টান্ত আছে। এদের একটি সদর্থক দৃষ্টান্ত ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্ত। নঞর্থক দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মস্তিষ্কের একটি অংশ অপসারণ না করলে শরীরের কোনো অংশ অবশ হয় না। আর সদর্থক দৃষ্টান্ত অনুযায়ী মস্তিষ্কের একটি অংশ অপসারণ করলে শরীরের একটি অংশ অবশ হয়। অর্থাৎ এখানে একটি ঘটনার অনুপস্থিতিতে অপর একটি ঘটনার অনুপস্থিতি এবং একটি ঘটনার উপস্থিতিতে অপর একটি ঘটনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ থেকে মস্তিষ্কের একটি অংশ অপসারণ ও শরীরের একটি অংশ অবশ হওয়ার মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং অনুমান করা হয় যে, 'মস্তিষ্কের একটি অংশ অপসারণ করাই শরীরের একটি অংশ অবশ হওয়ার কারণ'। ব্যতিরেকী পদ্ধতির এ যুক্তিটি পরীক্ষণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত ও যুক্তিটি যথার্থ।

ব্যতিরেকী পদ্ধতির আরও দৃষ্টান্ত :

১। পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াই লোকটির সুস্বাস্থ্যের কারণ।
২। বন্দুকের নলই রাষ্ট্র ক্ষমতার উৎস।
৩। তরকারীতে লবণ দেওয়াই এর স্বাদের কারণ।
৪। পুলিশ ফাঁড়ি অপসারণই অপরাধ বৃদ্ধির কারণ।
৫। ঘরের চালায় কাক বসাই সংসারের অশান্তির কারণ।
৬। থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারণই মানুষের কর্মতৎপরতা লোপ পাওয়ার কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ : ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তিগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ব্যতিরেকী পদ্ধতি মূলত পরীক্ষণের পদ্ধতি। তাই পরীক্ষণের সাহায্যেই সাধারণত এর দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষণ কার্য চালানো সম্ভব না হলে এ পদ্ধতিতে দৃষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য নিরীক্ষণের সাহায্য নেয়া হয়। আর নিরীক্ষণ অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত হয় বলে এতে অনুপপত্তির সৃষ্টি হয়। ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক বা অপপ্রয়োগের ফলে সাধারণত কাকতালীয় অনুপপত্তি, একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ও দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগের ফলে সাধারণত কয় রকমের অনুপপত্তি ঘটে?
(ক) ২ রকমের (খ) ৩ রকমের
(গ) ৪ রকমের (ঘ) ৫ রকমের

২। 'পুলিশ ফাঁড়ি অপসারণই অপরাধ বৃদ্ধির কারণ'-এটি কোন্ ধরণের অনুপপত্তি?
(ক) কাকতালীয় অনুপপত্তি (খ) একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি
(গ) দূরবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি
(ঘ)নিকটবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি

৩। ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসতর্ক প্রয়োগের ফলে সংঘটিত অনুপপত্তিগুলো হলো-
(i) নিকটবর্তী শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি
(ii) একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি (iii) কাকতালীয় অনুপপত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১০ যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি (The Joint Method of Agreement and Difference)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সূত্র জানতে পারবেন।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি (The Joint Method of Agreement and Difference)

যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) যে কয়টি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন সেগুলোর মধ্যে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি অন্যতম। অনেক সময় অন্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় না। আবার ব্যতিরেকী পদ্ধতির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হলেও এর সাহায্যে সিদ্ধান্ত অনুমান করা বেশ কষ্টকর। অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির এরূপ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করার জন্য এই দু'টি পদ্ধতির সমন্বয়ে মিল (Mill) যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন তাই হলো যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি। সংক্ষেপে এ পদ্ধতিকে যৌথ পদ্ধতিও বলা হয়।

বাংলা 'অন্বয়' শব্দটির অর্থ মিল বা সাদৃশ্য এবং 'ব্যতিরেকী' শব্দটির অর্থ অমিল বা বৈসাদৃশ্য। সুতরাং শব্দগত অর্থে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অর্থ হলো একই সাথে মিল ও পার্থক্যের পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একদিকে যেমন দুই বা ততোধিক সদর্থক দৃষ্টান্তে একটি বিশেষ অবস্থায় মিল থাকে অন্যদিকে তেমনি দুই বা ততোধিক নঞর্থক দৃষ্টান্তে ঐ বিশেষ অবস্থার অনুপস্থিতি ছাড়া আর কোনো বিষয়েই মিল থাকে না। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় যে, যে বিষয়টিতে উভয় প্রকার দৃষ্টান্ত সমষ্টির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সে বিষয়টির সাথে আলোচ্য ঘটনার অবশ্যই কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকবে। অর্থাৎ যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির ক্ষেত্রে সদর্থক দৃষ্টান্তসমূহে ও নঞর্থক দৃষ্টান্তসমূহে যে বিষয় সাধারণভাবে উপস্থিত ও অনুপস্থিত থাকার ফলে দৃষ্টান্তগুলোর মাঝে যে পার্থক্যমূলক সম্পর্কের সৃষ্টি হয় সে পার্থক্যমূলক সম্পর্ক সৃষ্টিকারী পূর্ববর্তী বিষয় কারণ ও পরবর্তী বিষয় কার্য।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সূত্র (The Law of the Joint Method of Agreement and Difference) : যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির যে সূত্র প্রদান করেন তাহলো, "আলোচ্য ঘটনাটি ঘটে এমন দুই বা ততোধিক দৃষ্টান্তে যদি একটি মাত্র অবস্থার মিল থাকে এবং আলোচ্য ঘটনাটি ঘটে না এমন দুই বা ততোধিক দৃষ্টান্তে যদি সেই অবস্থার অনুপস্থিতি ছাড়া অন্য কিছুই মিল না থাকে, তাহলে শুধু যে অবস্থাটিতে দৃষ্টান্তগুচ্ছ দু'টির মধ্যে পার্থক্য, সে অবস্থাটিই আলোচ্য ঘটনার কার্য বা কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ।"("If two or more instances in which the phenomenon occurs have only one circumstance in common, while two or more instances in which it does not occur have nothing in common save the absence of that circumstance, the circumstances in which alone the two sets of instances differ is the effect, or the cause, or an indispensable part of the phenomenon." P-259)।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সংজ্ঞা (The Definition of Joint Method of Agreement and Difference) : যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির ব্যাখ্যায় যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) ও যুক্তিবিদ মেলন (Mellone) প্রদত্ত সূত্রের

আলোকে এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে পদ্ধতির সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অনুসন্ধেয় ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্তের সকল ক্ষেত্রেই একটি পূর্বগের উপস্থিতিতে একটি অনুগের উপস্থিতি এবং একই পূর্বগের অনুপস্থিতিতে একই অনুগের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ এবং পরবর্তী ঘটনাকে কার্য মনে করা হয়, তাকে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি বা যৌথ পদ্ধতি বলে।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র
(The Law of Elimination Joint Method of Agreement and Difference)

যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির কোনো অপনয়ন সূত্র প্রদান করেননি। তবে তিনি অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে অপনয়ন সূত্রদ্বয় প্রদান করেছেন তাদের সমন্বয়ে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র পাওয়া যায়। আর এ সমন্বিত সূত্রটি হলো, যে পূর্বগকে কার্যের কোনো হানি না করে বাদ দেয়া যায়, সেই পূর্বগ কারণ হতে পারে না এবং যে পূর্বগকে কার্যের কোনো হানি না করে বাদ দেয়া যায় না, সেই পূর্বগ অবশ্যই কারণ বা কারণের অপরিহার্য অংশ হবে।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির উদাহরণ :

সাংকেতিক উদাহরণ

সদর্থক দৃষ্টান্ত		নঞর্থক দৃষ্টান্ত	
পূর্ববর্তী ঘটনা	পরবর্তী ঘটনা	পূর্ববর্তী ঘটনা	পরবর্তী ঘটনা
ক খ গ	প ফ ব	খ গ ঘ	ফ ব ভ
ক ঘ ঙ	প ভ ম	গ ঘ ঙ	ম য র
ক চ ছ	প য র	চ ছ জ	ল শ স

অতএব 'ক' হলো 'প' এর কারণ বা 'প' হলো 'ক' এর কার্য।

উল্লেখিত উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে, সদর্থক দৃষ্টান্তের পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহে 'ক' এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহে 'প' সাধারণভাবে উপস্থিত। আর নঞর্থক দৃষ্টান্তের পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহে 'ক' এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহে 'প' সাধারণভাবে অনুপস্থিত। সুতরাং এর অর্থ হলো যেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিষয় হিসেবে 'ক' উপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে পরবর্তী বিষয় হিসেবে 'প' উপস্থিত থাকে। আর যেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বিষয় হিসেবে 'ক' অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে পরবর্তী বিষয় হিসেবে 'প' অনুপস্থিত থাকে। অতএব এ থেকে অনুমান করা যায় যে, 'ক' হলো 'প' এর কারণ।

বাস্তব উদাহরণ :

১। যে সব দেশের নাগরিকগণ দেশপ্রেমিক, সেসব দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অন্যদিকে, যে সব দেশের নাগরিকগণ দেশপ্রেমিক নন, সেসব দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় না। সুতরাং নাগরিকগণের দেশপ্রেমই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার কারণ।

২। যে সব বস্তু দ্রুত তাপ বিকিরণ করতে পারে, সেগুলোর ওপর শিশির জমে এবং যে সব বস্তু দ্রুত তাপ বিকিরণ করতে পারে না, সেগুলোর ওপর শিশির জমে না। অতএব দ্রুত তাপ বিকিরণ করাই হলো শিশির জমা হওয়ার কারণ।

৩। আমি যেদিনই চিংড়ি খাই সেদিনই আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয় এবং যেদিন আমি চিংড়ি খাইনা সেদিন আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয় না। সুতরাং চিংড়ি খাওয়াই আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয়ার কারণ।

৪। নেপোলিয়ন নিজে যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সে সব যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যরা জয় লাভ করেছে এবং নেপোলিয়ন নিজে যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, সে সব যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যরা জয় লাভ করতে পারেনি। অতএব নেপোলিয়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাই ফরাসি সৈন্যদের জয় লাভের কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ : যুক্তিবিদ জে. এস. মিল প্রদত্ত যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সূত্রটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যে পদ্ধতির সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অনুসন্ধেয় ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্তের সকল ক্ষেত্রেই একটি পূর্বগের উপস্থিতিতে একটি অনুগের উপস্থিতি এবং একই পূর্বগের অনুপস্থিতিতে একই অনুগের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ এবং পরবর্তী ঘটনাকে কার্য মনে করা হয়, তাকে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি বা যৌথ পদ্ধতি বলে। অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য যুক্তিবিদ মিল এই দু'টি পদ্ধতির সমন্বয়ে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। সংক্ষেপে এ পদ্ধতিকে যৌথ পদ্ধতিও বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যে পূর্বগকে কার্যের কোনো হানি না করে বাদ দেয়া যায় সেই পূর্বগ-
(ক) কারণ হতে পারে (খ) কারণ হতে পারে না
(গ) শর্ত হতে পারে (ঘ) শর্ত হতে পারে না

২। আমি যেদিনই চিংড়ি খাই সেদিনই আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয় এবং যেদিন আমি চিংড়ি খাইনা সেদিন আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয় না। সুতরাং চিংড়ি খাওয়াই আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয়ার কারণ। এটি কোন ধরনের পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি ?
(ক) অন্বয়ী পদ্ধতি (খ) ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(গ) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি (ঘ) পরিশেষ পদ্ধতি

৩। যুক্তিবিদ মিল যে সব পদ্ধতির সমন্বয়ে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রবর্তন করেন-
(i) অন্বয়ী পদ্ধতি (ii) ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(iii) যৌথ পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১১ যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Joint Method of Agreement and Difference)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধাগুলো জানতে পারবেন।
- যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Joint Method of Agreement and Difference)

অন্যান্য পদ্ধতির মতো যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিরও কতিপয় সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে এ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো—

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির সুবিধাসমূহ (Advantages of the Joint Method of Agreement and Difference)

১। **প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যাপক :** প্রকৃতির অনেক ঘটনা আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি না বলে এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সম্ভব হয় না। কিন্তু নিরীক্ষণধর্মী পদ্ধতি হওয়ার কারণে এসব ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজেই যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনসন্ধানাধীন ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি। আর এ কারণেই যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক।

২। **কার্য ও কারণ উভয় দিক থেকেই প্রয়োগযোগ্য :** যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রধানত নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি হওয়ায় এর সাহায্যে আমরা একটি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য একদিকে যেমন কার্য থেকে কারণে যেতে পারি, অন্যদিকে তেমনি কারণ থেকে কার্যেও যেতে পারি। সুতরাং এ পদ্ধতি কার্য ও কারণ উভয় দিক থেকেই প্রয়োগযোগ্য।

৩। **বহুকারণের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত :** যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে সদর্থক ও নঞর্থক এ দু'ধরনের দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বলে এতে বহুকারণের সম্ভাবনা থাকে না বললেই চলে। কেননা বহুকারণবাদ এ পদ্ধতিকে অচল করে দিতে পারে না। বস্তুত যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) বহুকারণের সম্ভাবনা এড়ানোর জন্যই এ পদ্ধতির অবতারণা করেন।

৪। **সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয় :** যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে দু'দিক থেকে একসাথে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। অর্থাৎ এতে সদর্থক ও নঞর্থক এ দু'ধরনের দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে এর সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয়।

৫। **ব্যতিরেকী পদ্ধতির বিকল্প :** যে সব ঘটনা আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি না সে সব ক্ষেত্রে পরীক্ষণ সম্ভব হয় না। আর পরীক্ষণ সম্ভব নয় বলেই এ সব ক্ষেত্রে ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি হওয়ায় এসব ক্ষেত্রে খুব সহজেই যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এটি ব্যতিরেকী পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে কাজ করে।

৬। **প্রকল্প গঠনে সহায়ক :** যে কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলো প্রকল্প গঠন। যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিটি এক্ষেত্রে বৈধ প্রকল্প গঠনে সহায়তা করে থাকে।

৭। **অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির ত্রুটি দূর করে :** অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির ত্রুটি দূর করার জন্যই মূলত এই দু'টি পদ্ধতির সমন্বয়ে মিল (Mill) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এ পদ্ধতি দু'টির মধ্যে যেসব অসম্পূর্ণতা ও অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো এ পদ্ধতির সাহায্যে অনেকাংশে দূর করা যায়। তাই এ পদ্ধতিটিকে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির উন্নততর সংস্করণ বলে গণ্য করা হয়।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ
(Disadvantages of the Joint Method of Agreement and Difference)

১। **সময় ও শ্রমসাপেক্ষ পদ্ধতি :** যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে সদর্থক ও নঞর্থক এ দু'ধরনের দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এসব দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা একদিকে যেমন সময় সাপেক্ষ অন্যদিকে তেমনি শ্রমসাপেক্ষ। বিশেষ করে বহুকারণের সম্ভাবনাকে এড়ানোর জন্য এ পদ্ধতিতে যে পরিমাণ নঞর্থক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে হয় তা খুবই সময় ও শ্রমসাপেক্ষ।

২। **কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণে যথেষ্ট নয় :** যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রধানত নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি হওয়ায় এর সাহায্যে আমরা একটি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে নিরীক্ষণের আশ্রয় নিয়ে থাকি। আর নিরীক্ষণের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সিদ্ধান্ত অনুমান করতে হয় বলে এটি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণে যথেষ্ট নয়।

৩। **অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটে থাকে :** যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে এর সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় অবস্থাবলি যেমন পুরোপুরি অপসারণ করা সম্ভব হয় না, তেমনি প্রয়োজনীয় অবস্থাবলিও যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। তাই এ পদ্ধতি প্রয়োগে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটে থাকে।

৪। **কার্য-কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ :** এ পদ্ধতিতে দুটি ঘটনা সর্বদা এক সাথে বা পূর্বাপর ঘটতে দেখে ঘটনা দু'টির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র একসাথে বা পূর্বাপর ঘটলেই অনেক সময় সেগুলো কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় না। যেমন- দিন ও রাত্রির ঘটনা দু'টিকে এ পদ্ধতি অনুসারে একটিকে অপরটির কারণ বা কার্য বলে মনে করা হয়। আসলে এ দু'টির কোনোটিই একটি অপরটির কারণ বা কার্য নয়। বস্তুত এ দু'টি একই কারণের সহ-কার্য মাত্র। আর এ সহ-কার্যের কারণ হলো পৃথিবীর আহ্নিক গতি। সুতরাং যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি কার্য-কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ।

৫। **সূত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় :** যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill)-এর সূত্রানুসারে যা সদর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছের প্রত্যেকটিতে উপস্থিত, শুধুমাত্র সেটিকে নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে অনুপস্থিত রেখে অন্যান্য সব কিছু ঐ নঞর্থক দৃষ্টান্তগুচ্ছে উপস্থিত রাখতে হবে। কিন্তু এরূপ হলে এ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া অনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করবে। কেননা এ ধরনের দৃষ্টান্তের প্রয়োগ বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৬। **জটিল পদ্ধতি :** যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রধানত নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি। ফলে এর সাহায্যে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সদর্থক ও নঞর্থক এ দু'ধরনের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য। তাই এটি একটি জটিল পদ্ধতি।

৭। **এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য :** নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে এ পদ্ধতির সাহায্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত সব সময় সম্ভাব্য হয়ে থাকে, নিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছায় না। কারণ এ পদ্ধতির সহায়তায় কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব হলেও তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করা যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ : যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অসুবিধাসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির কতিপয় সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। এ পদ্ধতির মূল সুবিধাসমূহ হলো- এর প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যাপক, এটি কার্য ও কারণ উভয় দিক থেকেই প্রয়োগযোগ্য এবং এটি বহুকারণের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। আবার এ পদ্ধতির অসুবিধাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-এটি একটি জটিল পদ্ধতি, এর সূত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এতে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটে থাকে। তবে এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণে এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোন্‌টি যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির কতিপয় সুবিধা ?
(ক) এর প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যাপক (খ) এটি একটি সহজ পদ্ধতি
(গ) এতে বহুকারণের সম্ভাবনা থাকে (ঘ) এর সূত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ

২। নিচের কোনটি যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় ?
(ক) শ্রমসাপেক্ষ (খ) সময়সাপেক্ষ
(গ) জটিল পদ্ধতি (ঘ) অনুপপত্তি ঘটে না

৩। যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি -
(i) ব্যতিরেকী পদ্ধতির ত্রুটি দূর করে (ii) অন্বয়ী পদ্ধতির ত্রুটি দূর করে
(iii) একটি জটিল পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১২ যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of Improper Application of the Joint Method of Agreement and Difference)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অনুপপত্তি (Fallacies Arising out of Improper Application of the Joint Method of Agreement and Difference)

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রধানত নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি। তাই এর সাহায্যে আমরা একটি ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য নিরীক্ষণের ওপর নির্ভর করে থাকি। নিরীক্ষণের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সিদ্ধান্ত অনুমান করতে হয় বলে এটি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণে যথেষ্ট নয়। তাই এ পদ্ধতি প্রয়োগে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের সময় সাধারণত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ও সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ঘটে থাকে।

১। অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি

(ক) প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : কলেজের অধ্যক্ষ যতবার খেলার মাঠে উপস্থিত থেকেছেন ততবারই কলেজ ফুটবল দল খেলায় জয় লাভ করেছে এবং কলেজের অধ্যক্ষ যতবার খেলার মাঠে অনুপস্থিত থেকেছেন ততবারই কলেজ ফুটবল দল খেলায় পরাজিত হয়েছে। অতএব খেলার মাঠে কলেজের অধ্যক্ষের উপস্থিতিই খেলায় জয়-পরাজয়ের কারণ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সব প্রয়োজনীয় ও মৌলিক অবস্থা নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন সে সব প্রয়োজনীয় ও মৌলিক অবস্থা যদি অনিরীক্ষিত থেকে যায় তাহলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি বলে। আলোচ্য যুক্তিটি যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে এর সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় অবস্থাবলি যেমন পুরোপুরি অপসারণ করা সম্ভব হয় না, তেমনি প্রয়োজনীয় অবস্থাবলিও যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। এ যুক্তিটিতে দু'ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। এ যুক্তির সদর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে কলেজের অধ্যক্ষ যতবার খেলার মাঠে উপস্থিত থেকেছেন ততবারই কলেজ ফুটবল দল খেলায় জয় লাভ করেছে এবং নঞর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে কলেজের অধ্যক্ষ যতবার খেলার মাঠে অনুপস্থিত থেকেছেন ততবারই কলেজ ফুটবল দল খেলায় পরাজিত হয়েছে। অর্থাৎ খেলার মাঠে কলেজের অধ্যক্ষের উপস্থিতির উপর খেলার জয়-পরাজয় নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবে কলেজের অধ্যক্ষের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর খেলার জয়-পরাজয়ের কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। দলের জয়-পরাজয় মূলত নির্ভর করে নিজ দলের খেলোয়াড়দের পারদর্শিতা, খেলোয়াড়দের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও বিপক্ষ দলের শক্তি-সামর্থ্যের উপর। কিন্তু প্রদত্ত যুক্তিটির সিদ্ধান্ত অনুমান করার ক্ষেত্রে এসব প্রয়োজনীয় ও মৌলিক অবস্থাসমূহ নিরীক্ষণ করা হয়নি। ফলে যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটেছে।

(খ) প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : যাদের মাথা বড় তারা বেশি বুদ্ধিমান। কিন্তু যাদের মাথা বড় নয় তারা বেশি বুদ্ধিমান নয়।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সব দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করা প্রয়োজন সে সব দৃষ্টান্ত যদি অনিরীক্ষিত থেকে যায় তাহলে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি বলে । আলোচ্য যুক্তিটি যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণমূলক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত । নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলে এর সাহায্যে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না । এ যুক্তিটিতে দু'ধরনের দৃষ্টান্ত রয়েছে । এ যুক্তির সদর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যাদের মাথা বড় তারা বেশি বুদ্ধিমান হয় এবং নঞর্থক দৃষ্টান্ত অনুসারে যাদের মাথা বড় নয় তারা বেশি বুদ্ধিমান নয় । অর্থাৎ মাথার আকৃতির উপর বুদ্ধিমত্তা নির্ভরশীল । কিন্তু বাস্তবে মাথার আকৃতির উপর বুদ্ধিমান হওয়া নির্ভরশীল নয় । কারণ মাথার আকৃতির সাথে বুদ্ধিমান হওয়ার কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই । মাথা বড় ও বেশি বুদ্ধিকে কয়েকটি দৃষ্টান্তে পর্যবেক্ষণ করেই এখানে এদের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক অনুমান করা হয়েছে । কিন্তু প্রদত্ত যুক্তিটির সিদ্ধান্ত অনুমান করার ক্ষেত্রে যদি আরও দৃষ্টান্ত নিরীক্ষণ করা হতো তাহলে হয়তো এমন লোক পাওয়া যেতো যার মাথা বড় কিন্তু বুদ্ধি কম এবং মাথা ছোট কিন্তু বুদ্ধি বেশি । অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষিত থেকে গিয়েছে । ফলে যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটেছে ।

২ । সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : দিনের পর রাত আসে; অতএব দিন রাতের কারণ ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে যদি ভুল করে একটি ঘটনার সহ-কার্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তাতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি বলে । যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিটি যখন কার্য-কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হয় তখন এতে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ঘটে থাকে । আলোচ্য যুক্তিটির ক্ষেত্রে দু'টি ঘটনা তথা দিন ও রাতকে সব সময় সহ-অবস্থান করতে দেখে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগ করে দিনকে রাতের কারণ মনে করা হয়েছে । অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে দুটি ঘটনা সর্বদা এক সাথে বা পূর্বাপর ঘটতে দেখে ঘটনা দু'টির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করা হয় । কিন্তু শুধুমাত্র একসাথে বা পূর্বাপর ঘটলেই অনেক সময় সেগুলো কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় না । আসলে দিন ও রাত কোনোটিই একটি অপরটির কারণ বা কার্য নয় । বস্তুত এ দু'টি একই কারণের সহ-কার্য মাত্র । আর এ সহ-কার্যের কারণ হলো পৃথিবীর আহ্নিক গতি । সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে ।

যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির আরও দৃষ্টান্ত

১ । যে সব বস্তু দ্রুত তাপ বিকিরণ করতে পারে, সেগুলোর ওপর শিশির জমে এবং যে সব বস্তু দ্রুত তাপ বিকিরণ করতে পারে না, সেগুলোর ওপর শিশির জমে না । অতএব দ্রুত তাপ বিকিরণ করাই হলো শিশির জমা হওয়ার কারণ ।

২ । আমি যেদিনই চিংড়ি খাই সেদিনই আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয় এবং যেদিন আমি চিংড়ি খাইনা সেদিন আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয় না । সুতরাং চিংড়ি খাওয়াই আমার শরীরে এলার্জি দেখা দেয়ার কারণ ।

৩ । নেপোলিয়ন নিজে যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সে সব যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যরা জয় লাভ করেছে এবং নেপোলিয়ন নিজে যে সব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, সে সব যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যরা জয় লাভ করতে পারেনি । অতএব নেপোলিয়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাই ফরাসি সৈন্যদের জয় লাভের কারণ ।

শিক্ষার্থীর কাজ : সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

নিরীক্ষণের মাধ্যমে অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সিদ্ধান্ত অনুমান করতে হয় বলে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণে যথেষ্ট নয়। কেননা এ পদ্ধতি প্রয়োগে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কারের সময় সাধারণত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ও সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ঘটে থাকে। এরপরও এ পদ্ধতির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতির অপপ্রয়োগের ফলে কত রকমের অনুপপত্তি সৃষ্টি হয় ?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

২। কটা চুলওয়ালা ব্যক্তিরা সাধারণত বদমেজাজী হয়। এ যুক্তিটিতে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে ?
(ক) সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি (খ) প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি
(গ) প্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি (ঘ) কাকতালীয় অনুপপত্তি

৩। যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি হলো -
(i) যৌথ পদ্ধতি (ii) পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (iii নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৩ সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র (The Method of Concomitant Variation, Its Nature and Principles of Elimination)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র জানতে পারবেন।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি (The Method of Concomitant Variation)

যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) প্রদত্ত পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর চতুর্থটি হলো সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি (The Method of Concomitant Variation)। সহ-পরিবর্তন কথাটির অর্থ হলো একই সাথে পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি। এটি এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে দু'টি ঘটনাকে একই সাথে পরিবর্তিত হতে দেখে তাদের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করা হয়। যুক্তিবিদ বেকন (Bacon) কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য অন্বয়ী পদ্ধতি, ব্যতিরেকী পদ্ধতি ও সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি নামে তিনটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন। বেকন (Bacon) এ তিনটি পদ্ধতির মধ্যে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতি দু'টি কার্য-কারণের গুণগত দিক নির্ণয়ের জন্য এবং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি পরিমাণগত দিক নির্ণয়ের জন্য প্রণয়ন করেন। অন্যদিকে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) প্রদত্ত মোট পাঁচটি পদ্ধতির মধ্যে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতি দু'টিকে মৌলিক পদ্ধতি এবং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিকে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপান্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে কার্য-কারণ সম্পর্কের পরিমাণগত দিক নির্ণয় করাই সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। এ দিক থেকে এ পদ্ধতিটি অনন্য।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সূত্র (The Law of the Method of Concomitant Variation)

যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে সূত্র প্রদান করেছেন তাহলো, "যখন কোনো ঘটনার বিশেষ কোনো পরিবর্তনের সাথে অন্য কোনো ঘটনাও যেকোনো রূপে পরিবর্তিত হয়, তখন প্রথম ঘটনাটি দ্বিতীয় ঘটনার কারণ বা কার্য বা যেকোনোভাবেই হোক ঐ ঘটনার সাথে কার্য-কারণ সম্পর্কযুক্ত।" ("Whatever phenomenon varies in any manner whenever another phenomenon varies in some particular manner is either a cause of an effect of that phenomenan, or connected with through some fact of causation." 1889, P-263)

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সূত্র দিতে গিয়ে যুক্তিবিদ কফি (Coffey) তাঁর *The Science of Logic* বইয়ে বলেন, "দু'টি ঘটনা যদি একই সাথে পরিবর্তিত হয় এবং অন্য সব অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে, অথবা স্বতন্ত্রভাবে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়, তবে ঐ ঘটনা দু'টি সম্ভবত কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ।"("If two phenomenan vary together, other circumstances remaining the same or varying independently, there is probably a causal connection between the two phenomenon.")

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র (The Law of Elimination of the Method of Concomitant Variation) : যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic- Induction* গ্রন্থে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে অপনয়ন সূত্রটি প্রদান করেছেন তাহলো, "একটি পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী ঘটনা যদি একই সাথে সমপরিমানে বাড়তে ও কমতে থাকে

তাহলে ঘটনা দু'টিকে কারণ এবং কার্য বলে ধরতে হবে ।"("An antecedent and a consequent rising and falling together in numerical concomitance are to be held as cause and effect." 1870, P-48)

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সংজ্ঞা (Definition of the Method of Concomitant Variation)

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি সম্পর্কিত উপর্যুক্ত আলোচনা, সূত্র ও অপনয়ন সূত্রের ভিত্তিতে এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে পদ্ধতির ক্ষেত্রে পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত দু'টি ঘটনার মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ এবং পরবর্তী ঘটনাকে কার্যরূপে অনুমান করা হয় তাকে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি বলে ।

বস্তুত কার্য-কারণের পরিমাণগত লক্ষণের ভিত্তিতে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে । আমরা জানি যে, জড় ও শক্তির অবিনশ্বরতার নীতি অনুসারে পরিমাণের দিক থেকে কারণ ও কার্য সমান । সুতরাং এ হিসেবে কারণ যতটুকু বাড়ে বা কমে কার্যও ততটুকু বাড়ে বা কমে ।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির উদাহরণ (Example of the Method of Concomitant Variation)

সাংকেতিক উদাহরণ

পূর্ববর্তী ঘটনা	পরবর্তী ঘটনা
ক$_১$ খ গ	প$_১$ ফ ব
ক$_২$ খ গ	প$_২$ ফ ব
ক$_৩$ খ গ	প$_৩$ ফ ব

সুতরাং 'ক' হলো 'প' এর কারণ

উল্লিখিত উদাহরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী ঘটনার ক্ষেত্রে খ গ এবং পরবর্তী ঘটনার ক্ষেত্রে ফ ব অপরিবর্তিত অবস্থায় উপস্থিত রয়েছে । কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনার ক্ষেত্রে 'ক' বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এবং পরবর্তী ঘটনার ক্ষেত্রে 'প' বৃদ্ধি পেয়েছে । সুতরাং এ থেকে বলা যায় যে, 'ক' হলো 'প' এর কারণ ।

বাস্তব উদাহরণ

১। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে থার্মোমিটারের পারদ স্তম্ভ উপরের দিকে উঠে যায় । সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধিই পারদ স্তম্ভ উপরের দিকে উঠার কারণ ।

২। জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ করলে ফলন বৃদ্ধি পায় । অতএব, জমিতে কীটনাশক প্রয়োগই ফলন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ।

৩। দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যত বেশি হয়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত ব্যহত হয় । সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হওয়ার কারণ ।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির প্রকৃতি (The Nature of the Method of Concomitant Variation) : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সূত্র, অপনয়ন সূত্র ও সংজ্ঞা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নোক্ত প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়-

১। **কার্য-কারণ সূত্রের পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান :** কার্য-কারণের অন্যান্য দিক অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন সাধন করলে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি কার্যকর হয় । বস্তুত কার্য-কারণের পরিমাণগত লক্ষণের ভিত্তিতেই সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে । আমরা জানি যে, জড় ও শক্তির অবিনশ্বরতার নীতি অনুসারে পরিমাণের দিক থেকে কারণ ও কার্য সমান । সুতরাং এ হিসেবে কারণ যতটুকু বাড়ে বা কমে কার্যও ততটুকু বাড়ে বা কমে । আর এ নীতির আলোকে এ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয় বলে এটিকে পরিমাণগত পদ্ধতিও বলে ।

২। **কেবল স্থায়ী অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য :** যে সব ক্ষেত্রে অপনয়ন সূত্র প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব, সে সব স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় অবস্থার ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে শুধুমাত্র সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন

করে থাকে। অর্থাৎ সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিই হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যার সাহায্যে স্থায়ী কারণসমূহের ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৩। **দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি :** সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাবস্থায় নিজেদের অজান্তেই এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। তাই বলা যায়, সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।

৪। **অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপান্তর হিসেবে প্রয়োগযোগ্য :** সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী ঘটনার অন্তর্গত আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলো স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্তিত হয় তাকে অন্বয়ী পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়। আর অন্বয়ী পদ্ধতির রূপ লাভ করলে তা নিরীক্ষণাত্মক হয় বলে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয়। আবার সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী ঘটনার অন্তর্গত আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়। আর ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপ লাভ করলে তা পরীক্ষণাত্মক হয় বলে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয়।

৫। **দু'প্রকারের পরিবর্তন বিদ্যমান :** সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিতে ঘটনাবলির মধ্যে দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে, যথা- সমমুখী পরিবর্তন ও বিপরীতমুখী পরিবর্তন। যখন দু'টি ঘটনা একসাথে একইভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে থাকে, অর্থাৎ তাদের একটি বৃদ্ধি পেলে অপরটিও সমভাবে বৃদ্ধি পায় এবং একটি হ্রাস পেলে অপরটিও সমভাবে হ্রাস পায় তখন তাদের মধ্যকার পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ বা সমমুখী পরিবর্তন বলে। কিন্তু যখন দু'টি ঘটনা একসাথে পরস্পর বিপরীত দিকে হ্রাস-বৃদ্ধি পেতে থাকে, অর্থাৎ তাদের একটি বৃদ্ধি পেলে অপরটি সমভাবে হ্রাস পায় এবং একটি হ্রাস পেলে অপরটি সমভাবে বৃদ্ধি পায় তখন তাদের মধ্যকার পরিবর্তনকে পরোক্ষ বা বিপরীতমুখী পরিবর্তন বলে। সুতরাং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিতে দু'প্রকারের পরিবর্তন বিদ্যমান।

শিক্ষার্থীর কাজ : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির একটি সাংকেতিক উদাহরণ ও একটি বাস্তব উদাহরণ দিন।

সারসংক্ষেপ

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি যার সাহায্যে দু'টি ঘটনাকে একই সাথে পরিবর্তিত হতে দেখে তাদের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে বলে অনুমান করা হয়। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিকে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপান্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কার্য-কারণ সম্পর্কের পরিমাণগত দিক নির্ণয় করাই সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। তাই এটিকে পরিমাণগত পদ্ধতিও বল হয়। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিতে ঘটনাবলির মধ্যে দু'ধরনের পরিবর্তন ঘটে থাকে, যথা- সমমুখী পরিবর্তন ও বিপরীতমুখী পরিবর্তন। এ পদ্ধতির সাহায্যে স্থায়ী কারণসমূহের ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে থার্মোমিটারের পারদ স্তম্ভ উপরের দিকে উঠে যায়। সুতরাং তাপমাত্রা বৃদ্ধিই পারদ স্তম্ভ উপরের দিকে উঠার কারণ। এটি সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির কোন ধরনের রূপান্তর ?
(ক) অন্বয়ী পদ্ধতির (খ) ব্যতিরেকী পদ্ধতির
(গ) যৌথ পদ্ধতির (ঘ) পরিশেষ পদ্ধতির

২। কার্য-কারণ সম্পর্কের কোন দিকটি নির্ণয় করাই সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির মূল লক্ষ্য ?
(ক) গুণগত (খ) পরিমাণগত
(গ) গুণগত ও পরিমাণগত (ঘ) কোনোটিই নয়

৩। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিকে ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপান্তর হিসেবে বিবেচনা করা হয় -
(i) অন্বয়ী পদ্ধতির (ii) ব্যতিরেকী পদ্ধতির
(iii) যৌথ পদ্ধতির

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৪ সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Method of Concomitant Variation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ জানতে করতে পারবেন।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Method of Concomitant Variation)

প্রতিটি প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) প্রবর্তিত অন্যান্য পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিসমূহের ন্যায় সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিরও কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হলো-

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সুবিধাসমূহ (Advantages of the Method of Concomitant Variation)

১। **সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয় :** সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী ঘটনার অন্তর্গত আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়। আর এটি যখন ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপ লাভ করে তখন এ পদ্ধতির দৃষ্টান্তগুলো পরীক্ষণের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। আমরা জানি, পরীক্ষণের সাহায্যে সংগৃহীত দৃষ্টান্ত থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। সুতরাং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি যখন ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপ লাভ করে তখন তা পরীক্ষণাত্মক হয় বলে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়।

২। **স্থায়ী কারণের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ফলপ্রসূ :** প্রকৃতিতে এমন কিছু কারণ আছে যেগুলো বস্তু বা ঘটনা থেকে সম্পূর্ণরূপে অপনয়ন করা যায় না। যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) এরূপ কারণসমূহের নাম দিয়েছেন স্থায়ী কারণ। তাপ, ওজন, চাপ, আকর্ষণ, আকার ইত্যাদি হচ্ছে বস্তু বা ঘটনার স্থায়ী কারণ। যে সব স্থায়ী কারণসমূহের ক্ষেত্রে অপনয়ন সূত্র প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব, সে সব স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় অবস্থার ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে শুধুমাত্র সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিই হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যার সাহায্যে স্থায়ী কারণসমূহের ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

৩। **অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক :** সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী ঘটনার অন্তর্গত আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলো স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্তিত হয় তাকে অন্বয়ী পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়। আর অন্বয়ী পদ্ধতির রূপ লাভ করলে এটি নিরীক্ষণাত্মক রূপ লাভ করে। আবার সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী ঘটনার অন্তর্গত আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়। আর ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপ লাভ করলে তা হয় পরীক্ষণাত্মক। সুতরাং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি এমন একটি পরীক্ষণ পদ্ধতি যা অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

৪। **বৈজ্ঞানিক মূল্য খুবই বেশি :** সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে কার্য-কারণের পরিমাণগত সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তাই এ পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক মূল্য খুবই বেশি।

৫। **অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করে :** অন্বয়ী পদ্ধতি বা ব্যতিরেকী পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের পর তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ দেখা দিলে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সফল প্রয়োগের মাধ্যমে তা যাচাই করা যায়। এর ফলে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ
(Disadvantages of the Method of Concomitant Variation)

১। **সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য হয় :** সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির যে প্রক্রিয়ায় পূর্ববর্তী ও অনুবর্তী ঘটনার অন্তর্গত আনুষঙ্গিক অবস্থাগুলো স্বতন্ত্রভাবে পরিবর্তিত হয় তাকে অন্বয়ী পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়। আর অন্বয়ী পদ্ধতির রূপ লাভ করলে তা নিরীক্ষণমুলক হয় বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত না হয়ে সম্ভাব্য হয়।

২। **প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত :** কোনো ঘটনার বা কোনো বিষয়ের গুণগত বা পরিমাণগত পরিবর্তন তথা হ্রাস-বৃদ্ধির উপরই মূলত সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি কার্যকরী হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি সব সময়ই একটি সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি এ সীমা অতিক্রম করতে পারে না। যেমন-জড় বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করলে এর আয়তন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর আয়তন বৃদ্ধির একটি সীমা আছে। কারণ এর আয়তন বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছায় যে, তাতে যতই তাপ প্রয়োগ করা হোক না কেন এর আয়তন আর বৃদ্ধি পায় না। সুতরাং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র সীমিত।

৩। **গুণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় :** কার্য-কারণের অন্যান্য দিক অপরিবর্তিত রেখে কেবলমাত্র পরিমাণগত পরিবর্তন সাধন করলে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি কার্যকর হয়। বস্তুত কার্য-কারণের পরিমাণগত লক্ষণের ভিত্তিতেই সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে। তাই যখন দু'টি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে একসাথে গুণের দিক দিয়ে পরিবর্তন ঘটে তখন এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করা যায় না। এছাড়া কোনো কোনো সময় দু'টি বস্তু বা ঘটনার মধ্যে একইসাথে পরিমাণগত ও গুণগত হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রেও এ পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ সম্ভব নয়।

৪। **স্থিতিশীল বস্তু বা ঘটনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় :** আমরা অনেক সময় প্রকৃতিতে কিছু বস্তু দেখতে পাই বা এমন অনেক ঘটনা ঘটতে দেখি যেগুলো সাধারণত পরিবর্তিত হয় না। আবার এসব বস্তু বা ঘটনায় কৃত্রিমভাবেও পরিবর্তন আনয়ন করা যায় না। আর এরূপ স্থায়ী বস্তু বা ঘটনার ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি কার্যকরী নয় বলে এগুলোর উপর সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়।

৫। **শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে :** আমরা জানি যে, কারণ হলো কার্যের পূর্ববর্তী শর্তসমূহের সমষ্টি। অর্থাৎ একটি কারণ একাধিক বা অনেকগুলো শর্তের সমষ্টি হতে পারে। কিন্তু অনেক সময় ভুল করে আমরা একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করি। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিতে নিরীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয় বলে অনেক সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় অনুসন্ধেয় ঘটনার সাথে শর্তটির সাময়িক হ্রাস-বৃদ্ধি দেখে ভুলবশত আমরা উক্ত শর্তটিকেই সমগ্র কারণ হিসেবে গ্রহণ করি। আর এভাবেই এই পদ্ধতিতে কার্য-কারণ সংক্রান্ত তথা শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

৬। **এতে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির ত্রুটি বিদ্যমান :** যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতি দু'টিকে মৌলিক পদ্ধতি এবং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিকে অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির রূপান্তর হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি এমন একটি পরীক্ষণ পদ্ধতি যা অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। আর এটি অন্বয়ী পদ্ধতি ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে বলে এদের ত্রুটিসমূহও এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

৭। **কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ :** এ পদ্ধতিতে অনেক সময় কোনো ঘটনার সহ-কার্যকে ভুল করে এর কারণ বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র একসাথে পরিবর্তিত হলেই বা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেই অনেক সময় সেগুলো কার্য-কারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় না। যেমন- দিন ও রাত্রির ঘটনা দু'টিকে এ পদ্ধতি অনুসারে একটিকে

অপরটির কারণ বা কার্য বলে মনে করা হতে পারে। আসলে এ দু'টির কোনোটিই একটি অপরটির কারণ বা কার্য নয়। বস্তুত এ দু'টি একই কারণের সহ-কার্য মাত্র। আর এ সহ-কার্যের কারণ হলো পৃথিবীর আহ্নিক গতি। সুতরাং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগ।

শিক্ষার্থীর কাজ : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা, স্থায়ী কারণের ক্ষেত্রে এর ফলপ্রসূ প্রয়োগ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে এর ভূমিকা ইত্যাদি এ পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা। অন্যদিকে এর প্রয়োগ ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা, কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি সংঘটন এবং কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে অপারগতা এ পদ্ধতির অন্যতম অসুবিধা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অসুবিধা নয়?
(ক) সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা (খ) প্রয়োগ ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা
(গ) অনুপপত্তি সংঘটন (ঘ) কারণ ও সহ-কার্যের পার্থক্যকরণে অপারগতা

২। দিন ও রাত্রির ঘটনা দু'টি—
(ক) একটি অপরটির কারণ (খ) একটি অপরটির কার্য
(গ) একটি অপরটির কারণ ও কার্য (ঘ) একটি অপরটির সহ-কার্য

৩। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সুবিধাগুলো হলো—
(i) সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা (ii) স্থায়ী কারণের ক্ষেত্রে এর ফলপ্রসূ প্রয়োগ
(iii) অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপূরক

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৫ সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত অনুপপত্তিসমূহ (Fallacies Related to the Method of Concomitant Variation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অনুপপত্তিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত অনুপপত্তিসমূহ (Fallacies Related to the Method of Concomitant Variation)

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি কখনো পরীক্ষণ আবার কখনো নিরীক্ষণের ভিত্তিতে এর সিদ্ধান্ত অনুমান করে থাকে। এ পদ্ধতিটি যখন পরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল হয় তখন এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। কিন্তু যখন এটি নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল হয় তখন এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত না হয়ে কখনো সম্ভাব্য হয়, কখনোবা এতে অনুপপত্তি ঘটে। এ পদ্ধতিতে সাধারণত তিন রকমের অনুপপত্তি ঘটে থাকে। যথা-

(ক) অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি;
(খ) কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি ও
(গ) সহ-কার্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি।

(ক) অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হয় দেশের সমৃদ্ধি তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই এর সমৃদ্ধির কারণ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির দৃষ্টান্তগুলো যখন নিরীক্ষণের উপর নির্ভর করে সংগ্রহ করা হয় তখন যদি অনুসন্ধেয় ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনিরীক্ষিত থেকে যায় তাহলে এতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি বলে। এ যুক্তি অনুসারে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা যত উন্নত হয় দেশের সমৃদ্ধি তত বৃদ্ধি পায়। তাই যুক্তিটিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে যে, দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা এর সমৃদ্ধির কারণ। আসলে একটি দেশের উন্নয়নের সাথে যেসব মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পৃক্ত সেগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি শর্ত মাত্র। আরও যে বিষয়গুলো এক্ষেত্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন সেগুলো হলো- উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দক্ষ মানব সম্পদ, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু এ বিষয়সমূহ নিরীক্ষণ না করেই সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির অপপ্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, 'দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নই এর সমৃদ্ধির কারণ'। ফলে যুক্তিটি যথার্থ প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এতে অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটেছে।

(খ) কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : একটি দেশে শিক্ষার হার যত বৃদ্ধি পায় সে দেশের দুর্নীতি তত হ্রাস পায়। কিন্তু একটি দেশে শিক্ষার হার যত হ্রাস পায় সে দেশের দুর্নীতি তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শিক্ষার হার বৃদ্ধিই দেশের দুর্নীতি হ্রাসের কারণ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি বা একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো যুক্তিতে যখন কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে প্রকৃত কারণের পরিবর্তে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তখন তাকে কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি বা একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি বলে। এ যুক্তি অনুসারে একটি দেশে শিক্ষার হার যত বৃদ্ধি পায় সে দেশের দুর্নীতি তত হ্রাস পায়। কিন্তু একটি দেশে শিক্ষার হার যত হ্রাস পায় সে দেশের দুর্নীতি তত বৃদ্ধি পায়। তাই যুক্তিটিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে যে, শিক্ষার হার বৃদ্ধিই দেশের দুর্নীতি হ্রাসের কারণ। কিন্তু এ যুক্তিটিতে নিরীক্ষণমূলকভাবে সিদ্ধান্ত অনুমান করার সময় দেশের দুর্নীতি হ্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার হার সহ অন্যান্য শর্ত বা অবস্থা যেমন- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, দেশপ্রেম, নৈতিকতাবোধ ইত্যাদি বিষয় নিরীক্ষণ করা হয়নি। আসলে এগুলোর প্রতিটিই এক একটি শর্ত এবং এ শর্তগুলোর সমষ্টি হলো দেশের দুর্নীতি হ্রাসের কারণ। সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

(গ) সহ-কার্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি

প্রদত্ত যুক্তি : দিনের স্থায়িত্ব যতই বৃদ্ধি পায় রাতের স্থায়িত্ব ততই হ্রাস পায়। আর রাতের স্থায়িত্ব যতই বৃদ্ধি পায় দিনের স্থায়িত্ব ততই হ্রাস পায়। অতএব দিন রাতের কারণ।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তি : সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি।

যুক্তিটিতে সংঘটিত অনুপপত্তির ব্যাখ্যা : কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে যদি ভুল করে একটি ঘটনার সহ-কার্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তাতে যে অনুপপত্তি ঘটে তাকে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি বলে। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিটি যখন কার্য-কারণ ও সহ-কার্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হয় তখন এতে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ঘটে থাকে। এ যুক্তি অনুসারে দিনের স্থায়িত্ব যতই বৃদ্ধি পায় রাতের স্থায়িত্ব ততই হ্রাস পায়। আর রাতের স্থায়িত্ব যতই বৃদ্ধি পায় দিনের স্থায়িত্ব ততই হ্রাস পায়। তাই যুক্তিটিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে যে, দিন রাতের কারণ। আসলে দিন ও রাত কোনোটিই একটি অপরটির কারণ বা কার্য নয়। বস্তুত এ দু'টি একই কারণের সহ-কার্য মাত্র। আর এ সহ-কার্যের কারণ হলো পৃথিবীর আহ্নিক গতি। সুতরাং যুক্তিটি যথার্থ নয় এবং এতে সহ-কার্যকে কারণ মনে করা জনিত অনুপপত্তি ঘটেছে।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত যথার্থ যুক্তি :

প্রদত্ত যুক্তি : খাদ্যে ভেজাল দেয়ার প্রবণতা যত বাড়ছে মানুষের ততই স্বাস্থ্যহানী ঘটছে। সুতরাং খাদ্যে ভেজাল দেয়াই মানুষের স্বাস্থ্যহানীর কারণ।

যুক্তিটির যথার্থতা : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত যথার্থ যুক্তি।

যুক্তিটির যথার্থতার ব্যাখ্যা : যে পদ্ধতির ক্ষেত্রে পূর্বাপর সম্পর্কযুক্ত দু'টি ঘটনার মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্কের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী ঘটনাকে কারণ এবং পরবর্তী ঘটনাকে কার্যরূপে অনুমান করা হয় তাকে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি বলে। এ যুক্তি অনুসারে খাদ্যে ভেজাল দেয়ার প্রবণতা যত বাড়ছে মানুষের ততই স্বাস্থ্যহানী ঘটছে। তাই যুক্তিটিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে যে, খাদ্যে ভেজাল দেয়াই মানুষের স্বাস্থ্যহানীর কারণ। এটি সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি যথার্থ যুক্তি। কেননা এতে 'খাদ্যে ভেজাল দেয়ার প্রবণতা' এবং 'স্বাস্থ্যহানী ঘটা' এ দু'টি ঘটনা সমহারে ঘটে। অর্থাৎ এদের একটি যে হারে বৃদ্ধি পায় অপরটিও সেই হারে বৃদ্ধি পায়। তাই এদের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ সম্পর্কের ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়েছে যে, খাদ্যে ভেজাল দেয়াই মানুষের স্বাস্থ্যহানীর কারণ। তবে যুক্তিটি নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল বলে এর সিদ্ধান্ত সম্ভাব্য।

শিক্ষার্থীর কাজ : সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত অনুপপত্তিসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি যখন নিরীক্ষণের উপর নির্ভরশীল হয় তখন এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত না হয়ে সম্ভাব্য হয় এবং এতে অনুপপত্তি ঘটে। এ পদ্ধতিতে সাধারণত তিন রকমের অনুপপত্তি ঘটে থাকে। যথা- অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি; কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি ও সহ-কার্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিতে সাধারণত কয় রকমের অনুপপত্তি ঘটে থাকে ?
(ক) দুই রকমের (খ) তিন রকমের
(গ) চার রকমের (ঘ) পাঁচ রকমের

২। খাদ্যে ভেজাল দেয়ার প্রবণতা যত বাড়ছে মানুষের ততই স্বাস্থ্যহানী ঘটছে। সুতরাং খাদ্যে ভেজাল দেয়াই মানুষের স্বাস্থ্যহানীর কারণ। এ যুক্তিটিতে-
(ক) কার্য-কারণ সংক্রান্ত অনুপপত্তি ঘটেছে (খ) সহ-কার্যকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে
(গ) অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটেছে (ঘ) কোনো অনুপপত্তি ঘটেনি

৩। একটি দেশে শিক্ষার হার যত বৃদ্ধি পায় সে দেশের দুর্নীতি তত হ্রাস পায়। কিন্তু একটি দেশে শিক্ষার হার যত হ্রাস পায় সে দেশের দুর্নীতি তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শিক্ষার হার বৃদ্ধিই দেশের দুর্নীতি হ্রাসের কারণ। এ যুক্তিটি-
(i) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির (ii) সমমুখী পরিবর্তন ঘটেছে
(iii) বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটেছে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৬ পরিশেষ পদ্ধতি, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন সূত্র (The Method of Residues, Its Nature and Principles of Elimination)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- পরিশেষ পদ্ধতির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পরিশেষ পদ্ধতির প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ পারবেন।
- এর অপনয়ন সূত্র জানতে পারবেন।

পরিশেষ পদ্ধতি (The Method of Residues)

যুক্তিবিদ্যায় পরিশেষ শব্দটি বিয়োগফল বা অবশিষ্ট অংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে পদ্ধতির সহায়তায় কোনো পূর্ববর্তী জটিল ঘটনা সমষ্টির মধ্যকার কিছু অংশকে অনুবর্তী ঘটনা সমষ্টির কিছু অংশের কারণ বলে আমাদের আগে থেকেই জানা থাকলে আমরা সমগ্র অংশ থেকে জানা অংশকে বিয়োগ করে অবশিষ্ট পূর্ববর্তী ঘটনাকে অবশিষ্ট পরবর্তী ঘটনার কারণ বলে সিদ্ধান্ত অনুমান করি তাকে পরিশেষ পদ্ধতি বলে। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) যে সব পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন সেগুলোর মধ্যে পরিশেষ পদ্ধতি অন্যতম। তাঁর মতে, পরিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে ব্যতিরেকী পদ্ধতির একটি বিশেষ পরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ এটি মৌলিক কোনো পদ্ধতি নয়। আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে তিনি এ পদ্ধতিকে অবরোহমূলক পদ্ধতি বলেও অভিহিত করেছেন। কারণ এক্ষেত্রে পূর্ব অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে সমগ্র অংশ থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়ে অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়।

পরিশেষ পদ্ধতির সূত্র (Canon of the Method of Residues)

পরিশেষ পদ্ধতির সূত্র প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) তাঁর *A System of Logic* গ্রন্থে বলেন, "কোনো ঘটনার যে অংশ পূর্বে আরোহানুমানের সাহায্যে কোনো পূর্বগের কার্য বলে জানা গেছে, সে অংশ ঐ ঘটনা থেকে বাদ দিলে যা থাকে, তা অবশিষ্ট পূর্বগের কার্য।"("Subduct from any given phenomenon such part as known by previous induction to be the effect of certain antecedents and the residue of the phenomenon is the effect of the remaining antecedents." 1889, P-260)

আবার যুক্তিবিদ মেলন (Mellone) তাঁর *Elements of Modern Logic* গ্রন্থে পরিশেষ পদ্ধতির সূত্র প্রসঙ্গে বলেন, "একটি জটিল ঘটনার কোনো অংশ বিশেষ যখন নির্ণীত কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, তখন ঐ অবশিষ্ট অংশের জন্য অন্য একটি কারণ অবশ্যই খুঁজতে হবে।"("When any part of a complex phenomenon is still unexplained by the causes which have been assigned, a further cause for this reminder must be sought." 1902, p.287)

পরিশেষ পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র (The Law of Elimination of the Method of Residues) ঃ যুক্তিবিদ এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (H.W.B. Joseph) তাঁর *An Introduction to Logic* গ্রন্থে পরিশেষ পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র দিতে গিয়ে বলেন, "যা ভিন্ন একটি ঘটনার কারণ বলে পরিচিত তা কিছুতেই আলোচ্য ঘটনার কারণ হতে পারে না।" ("Nothing is the cause of the phenomenon which is known to be the cause of a different phenomenon."1916, p.440)

পরিশেষ পদ্ধতির সংজ্ঞা
(Definition of the Method of Residues)

পরিশেষ পদ্ধতির সূত্র ও অপনয়ন সূত্রের ভিত্তিতে এর সংজ্ঞায় বলা যায়, যে পদ্ধতিতে কোনো জটিল ঘটনার অংশ বিশেষের কারণ আগে থেকে জানা থাকলে মনে করা হয় যে, অবশিষ্ট অংশের কারণ হবে পূর্বগের অবশিষ্ট অংশটুকু, তাকে পরিশেষ পদ্ধতি বলে। অর্থাৎ পরিশেষ পদ্ধতির মূল বক্তব্য হলো কোনো ঘটনার যে অংশ ইতোপূর্বেই বিভিন্ন আরোহ অনুমান দ্বারা কতগুলো পূর্বগের কার্য বলে জানা গেছে, তা বাদ দেয়ার পর সে ঘটনার ক্ষেত্রে যা অবশিষ্ট থাকে, তা অবশিষ্ট পূর্বগের কার্য।

পরিশেষ পদ্ধতির উদাহরণ (Example of the Method of Residues)

সাংকেতিক উদাহরণ

পূর্বগ	অনুগ
ক খ গ	প ফ ব
খ	ফ
গ	ব
∴ খ গ	∴ ফ ব

∴ অবশিষ্ট ক এর কার্য হচ্ছে প

উল্লেখিত উদাহরণে পফব একটি জটিল ঘটনা যার পূর্বগ হচ্ছে কখগ। এখানে ফ হচ্ছে খ এর কার্য এবং ব হচ্ছ গ এর কার্য। সুতরাং খগ এবং ফব এর কার্য-কারণ সম্পর্কটি এক্ষেত্রে জানা বিষয়। তাই এ জটিল ঘটনা পফব-এর অবশিষ্ট অংশ হচ্ছে প এবং পূর্বগ কখগ-এর মধ্যকার অবশিষ্ট অংশ হচ্ছে ক। সুতরাং অবশিষ্ট প-এর কারণ হচ্ছে অবশিষ্ট ক।

বাস্তব উদাহরণ

১। একটি চৌবাচ্চায় তিনটি নল আছে। এর তিনটি নল একসাথে খোলা থাকলে প্রতি ঘন্টায় ৩০০ লিটার পানি প্রবেশ করে। তবে আগে থেকেই জানা আছে যে, এর প্রথম দু'টি নল দ্বারা একত্রে প্রতি ঘন্টায় ১৮০ লিটার পানি প্রবেশ করে। সুতরাং প্রতি ঘন্টায় তিনটি নল দ্বারা প্রবেশ করা পানির মোট পরিমাণ ৩০০ লিটার থেকে প্রথম দু'টি নল দ্বারা প্রবেশ করা জানা পানির পরিমাণ ১৮০ লিটার বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা যায় যে, তৃতীয় নল দ্বারা প্রতি ঘন্টায় ১২০ লিটার পানি প্রবেশ করে।

২। কফিসহ একটি মগের ওজন ৪৫০ গ্রাম। পূর্ব থেকেই জানা আছে যে, মগের ওজন ১০০ গ্রাম। অতএব, কফিসহ মগের ওজন ৪৫০ গ্রাম থেকে মগের ওজন ১০০ গ্রাম বাদ দিলে কফির ওজন পাওয়া যায় ৩৫০ গ্রাম।

৩। এইচ এস সি পরীক্ষায় কেয়া চতুর্থ বিষয়সহ মোট ৬৫০ নম্বর পেল। জানা আছে যে, সে চতুর্থ বিষয়ে ৫০ নম্বর পেয়েছে। অতএব চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর বিয়োগ করলে অবশিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে সে নম্বর পেয়েছে ৬০০।

পরিশেষ পদ্ধতির প্রকৃতি
(Nature of the Method of Residues)

পরিশেষ পদ্ধতির সূত্র, অপনয়ন সূত্র এবং এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নরূপ প্রকৃতি বা স্বরূপ পরিলক্ষিত হয়-

১। **মিশ্র কার্য ক্ষত্রে প্রযোজ্য :** একাধিক পূর্ববর্তী ঘটনা ক্রিয়াশীল থাকার ফলে যখন কোনো জটিল ঘটনা বা মিশ্র কার্যের উদ্ভব ঘটে, তখন পরিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই একক কোনো কার্য বা কারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়।

২। পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল : সম্পূর্ণ ঘটনার যে অংশ সম্পর্কে আমাদের জানা থাকে, সে অংশটুকু বাদ দেয়ার পর পূর্বগের ক্ষেত্রে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকেই অনুগের অবশিষ্ট অংশের কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

৩। **সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয় :** পূর্ব থেকে সমগ্র কার্যের একটি অংশের কারণ জানা থাকে বলে অবশিষ্ট অংশ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা সাধারণত নির্ভুল হয়।

৪। **পরিশেষ পদ্ধতির পরিধি ব্যাপক :** পরিশেষ পদ্ধতি যে কোনো পরিবেশে বিশেষ করে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় পরিবেশে প্রয়োগ করা যায়। এ পদ্ধতি অন্যান্য যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই এ পদ্ধতির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

৫। **কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায় :** পরিশেষ পদ্ধতিতে কোনো একটি ঘটনাকে কারণ হিসেবে ধরে নিয়ে যেমন এর কার্য আবিষ্কার করা যায়, তেমনিভাবে কোনো ঘটনাকে কার্য বলে ধরে নিয়ে তার কারণও খুঁজে বের করা যায়। অর্থাৎ এটির সাহায্যে কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায়।

৬। **অবরোহমূলক পদ্ধতি :** পরিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে কোনো জটিল ঘটনা নিয়ে গবেষণা করার সময় এর মধ্য থেকে জানা বিষয়গুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পূর্ববর্তী ঘটনাকে অবশিষ্ট পরবর্তী ঘটনার কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়। অর্থাৎ এখানে বেশি ব্যাপক বিষয় থেকে কম ব্যাপক বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়। তাই অবশিষ্ট পরবর্তী ঘটনার কারণ নির্ণয়ের এ প্রক্রিয়াটি আরোহমূলক নয়, বরং অবরোহমূলক।

৭। **বিয়োজনমূলক পদ্ধতি :** এ পদ্ধতির সাহায্যে জানা ও অজানা বিষয় সমষ্টি থেকে জানা বিষয় সমষ্টি বিয়োগ করা হয় বা বাদ দেয়া হয় বলে এটি একটি বিয়োজনমূলক পদ্ধতি।

৮। মৌলিক পদ্ধতি নয় : যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) এ পদ্ধতিকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির এক বিশেষ ধরনের রূপান্তর বলে অভিহিত করেছেন। তাই এটি কোনো মৌলিক পদ্ধতি নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : পরিশেষ পদ্ধতির প্রকৃতিগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যে পদ্ধতির সহায়তায় কোনো পূর্ববর্তী জটিল ঘটনা সমষ্টির মধ্যকার কিছু অংশকে অনুবর্তী ঘটনা সমষ্টির কিছু অংশের কারণ বলে আমাদের আগে থেকেই জানা থাকলে আমরা সমগ্র অংশ থেকে জানা অংশকে বিয়োগ করে অবশিষ্ট পূর্ববর্তী ঘটনাকে অবশিষ্ট পরবর্তী ঘটনার কারণ বলে সিদ্ধান্ত অনুমান করি তাকে পরিশেষ পদ্ধতি বলে। পরিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে ব্যতিরেকী পদ্ধতির একটি বিশেষ পরিবর্তিত রূপ। অর্থাৎ এটি মৌলিক কোনো পদ্ধতি নয়। আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে তিনি এ পদ্ধতিকে অবরোহমূলক পদ্ধতি বলেও অভিহিত করেছেন। কারণ এক্ষেত্রে পূর্ব অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে সমগ্র অংশ থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়ে অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত অনুমান করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৫.১৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পরিশেষ পদ্ধতি কোন পদ্ধতির একটি বিশেষ পরিবর্তিত রূপ।
(ক) সহপরিবর্তন পদ্ধতির (খ) ব্যতিরেকী পদ্ধতির
(গ) অন্বয়ী পদ্ধতির (ঘ) যৌথ পদ্ধতির

২। কোন পদ্ধতিকে বিয়োজনমূলক পদ্ধতি বলা যায়?
(ক) সহপরিবর্তন পদ্ধতিকে (খ) ব্যতিরেকী পদ্ধতিকে
(গ) অন্বয়ী পদ্ধতিকে (ঘ) পরিশেষ পদ্ধতিকে

৩। পরিশেষ পদ্ধতি হলো-
(i) মৌলিক পদ্ধতি (ii) অবরোহমূলক পদ্ধতি
(iii) বিয়োজনমূলক পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৭ পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Method of Residues)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধাগুলো জানতে পারবেন।
- পরিশেষ পদ্ধতি অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা (Advantages and Disadvantages of the Method of Residues)

অন্যান্য পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর ন্যায় পরিশেষ পদ্ধতিরও কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। নিম্নে এ পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধাসমূহ তুলে ধরা হলো-

পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of the Method of Residues)

১। **বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সহায়ক :** পরিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। যেমন এ পদ্ধতির সহায়তায় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও নেপচুন গ্রহটি আবিষ্কার করেন। সুতরাং পরিশেষ পদ্ধতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

২। **অন্যান্য আরোহী পদ্ধতির সহায়ক :** এ পদ্ধতিটি অন্যান্য পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে বলে সব আরোহী পদ্ধতিই কোনো না কোনো ভাবে এর উপর নির্ভরশীল। তাই এটি অন্যান্য সকল পদ্ধতি বিশেষ করে সব আরোহী পদ্ধতির সহায়ক।

৩। **জটিল ও মিশ্র ঘটনা ব্যাখ্যার উপযোগী :** প্রকৃতিতে সব সময়ই ঘটনাসমূহ জটিল ও মিশ্র অবস্থায় অবস্থান করে। পরিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে এসব জটিল ও মিশ্র ঘটনা থেকে অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা বিষয়গুলো বিয়োজন করে অজানা বিষয় অনুমান করা যায়। অর্থাৎ এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় জটিল ও মিশ্র ঘটনা ব্যাখ্যার জন্য বেশি উপযোগী।

৪। **কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায় :** পরিশেষ পদ্ধতিতে কোনো একটি ঘটনাকে কারণ হিসেবে ধরে নিয়ে যেমন এর কার্য আবিষ্কার করা যায়, তেমনিভাবে কোনো ঘটনাকে কার্য বলে ধরে নিয়ে তার কারণও খুঁজে বের করা যায়। অর্থাৎ এটির সাহায্যে কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায়।

৫। **পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য :** পরিশেষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ উভয় প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে এর সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয়। কিন্তু নিরীক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে এর সিদ্ধান্ত সাধারণত সম্ভাব্য হয়।

৬। **বহুকারণবাদ থেকে মুক্ত :** বহুকারণবাদ অনুসারে একটি কার্যের একাধিক কারণ থাকতে পারে। বিশেষ করে পরিশেষ পদ্ধতি প্রমাণ করতে সমর্থ হয় যে একটি মিশ্র কার্যের মধ্যে বহুকারণ থাকার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু এ পদ্ধতির সফল প্রয়োগ সম্ভব হলে বহুকারণ সংক্রান্ত সমস্যা অতিক্রম করে বিশেষ কার্য-কারণ বা কার্য-কারণের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা যায়।

৭। **পরিসর ব্যাপক :** পরিশেষ পদ্ধতি যে কোনো পরিবেশে বিশেষ করে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয় পরিবেশে প্রয়োগ করা যায়। এ পদ্ধতি অন্যান্য যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই এ পদ্ধতির পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক।

পরিশেষ পদ্ধতির অসুবিধা

(Disadvantages of the Method of Residues)

১। **একক কার্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় :** একাধিক পূর্ববর্তী ঘটনা ক্রিয়াশীল থাকার ফলে যখন কোনো জটিল ঘটনা বা মিশ্র কার্যের উদ্ভব ঘটে, তখন পরিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করেই কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই মিশ্র কোনো কার্য বা কারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রযোজ্য হলেও একক কোনো কার্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২। **পূর্বধারণার উপর নির্ভরশীল :** সমগ্র ঘটনার যে অংশ সম্পর্কে আমাদের জানা থাকে, সে অংশটুকু বাদ দেয়ার পর পূর্বগের ক্ষেত্রে যা অবশিষ্ট থাকে, তাকেই অনুগের অবশিষ্ট অংশের কারণ বলে বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ এ পদ্ধতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। তাই এ পদ্ধতির বড় অসবিধা হলো, যে সব ঘটনা সম্পর্কে আমাদের পূর্ব ধারণা থাকে না সে সব ঘটনার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি কার্যকর হয় না।

৩। **ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় :** পরিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে কেবল সমজাতীয় কার্য সংমিশ্রণ ব্যাখ্যা করা সম্ভব, ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। কেননা ভিন্ন ভিন্ন কার্যের ভিন্ন ভিন্ন কারণ জানা থাকলেও মিশ্র কার্য যদি ভিন্ন ভিন্ন কার্যের কেবল সমষ্টি না হয়ে অন্য প্রকৃতির হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে পরিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

৪। **বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য নয় :** পরিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাধারণত নিশ্চিতভাবে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলেও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি প্রয়োগযোগ্য নয়। কেননা যে কোনো ঘটনা সম্পর্কে প্রথমে আমাদের পূর্ব ধারণা থাকলেই কেবলমাত্র তার উপর ভিত্তি করে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

৫। **ব্যতিরেকী পদ্ধতির ত্রুটি বিদ্যমান :** যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) এ পদ্ধতিকে ব্যতিরেকী পদ্ধতির এক বিশেষ ধরনের রূপান্তর বলে অভিহিত করেছেন। তাই ব্যতিরেকী পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ এ পদ্ধতিতে বিদ্যমান।

৬। **শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে :** আমরা জানি যে, কারণ হলো কার্যের পূর্ববর্তী শর্তসমূহের সমষ্টি। অর্থাৎ একটি কারণ একাধিক বা অনেকগুলো শর্তের সমষ্টি হতে পারে। কিন্তু অনেক সময় ভুল করে আমরা একটিমাত্র শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণ করি। পরিশেষ পদ্ধতিতে অনেক সময় নিরীক্ষণের সাহায্যে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয় বলে একটি শর্তের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে পারে। আর এভাবেই এই পদ্ধতিতে কার্য-কারণ সংক্রান্ত তথা শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত অনুপপত্তি ঘটে।

৭। **অপ্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটে :** পরিশেষ পদ্ধতি অনেক সময় নিরীক্ষণের উপর নির্ভর করে বলে এর সাহায্যে অপ্রয়োজনীয় অবস্থাবলি পুরোপুরি শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে এ পদ্ধতি প্রয়োগে অপ্রয়োজনীয় অবস্থাকেই ভুলক্রমে কারণ হিসেবে গ্রহণ করা হতে পারে। আর এ কারণেই এ পদ্ধতিতে অপ্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ অনুপপত্তি ঘটে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ : পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা ছক আকারে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

অন্যান্য পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর ন্যায় পরিশেষ পদ্ধতিরও কিছু সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। এর প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো হলো-এটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে সহায়ক, জটিল ও মিশ্র ঘটনা ব্যাখ্যার উপযোগী, পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বহুকারণবাদ থেকে মুক্ত, এর পরিসর ব্যাপক এবং এর সাহায্যে কারণ ও কার্য উভয়ই নির্ণয় করা যায়। আর এ পদ্ধতির অসুবিধাগুলো হলো- এটি একক কার্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, পূর্বধারণার উপর নির্ভরশীল, ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য নয় এবং এতে ব্যতিরেকী পদ্ধতির ত্রুটি বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৫.১৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি পরিশেষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?
(ক) অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযোজ্য (খ) একক কার্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
(গ) ভিন্ন জাতীয় কার্য সংমিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (ঘ) মিশ্র ঘটনা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

২। নিচের কোনটি পরিশেষ পদ্ধতির সুবিধা ?
(ক) পূর্বধারণার উপর নির্ভরশীল (খ) একক কার্য ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য
(গ) বহুকারণবাদ থেকে মুক্ত (ঘ) ব্যতিরেকী পদ্ধতির ত্রুটি বিদ্যমান

৩। পরিশেষ পদ্ধতিতে সংঘটিত অনুপপত্তিসমূহ হলো-
(i) শর্তকে কারণ হিসেবে গ্রহণজনিত (ii) অপ্রয়োজনীয় অবস্থা অনিরীক্ষণ
(iii) দৃষ্টান্তের অনিরীক্ষণ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৮ ব্যবহারিক জীবনে পরীক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব (The Importance of the Experimental Methods in Practical Life)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্যবহারিক জীবনে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রমাণের পদ্ধতিসমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ব্যবহারিক জীবনে পরীক্ষণ পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করতে পারবেন।

ব্যবহারিক জীবনে পরীক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব (Importance of the Experimental Methods in Practical Life)

ব্রিটিশ যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) পাঁচটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির কথা বলেন। এ পদ্ধতিগুলো হলো- অন্বয়ী পদ্ধতি, ব্যতিরেকী পদ্ধতি, যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি, সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি এবং পরিশেষ পদ্ধতি। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল কর্তৃক প্রবর্তিত এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয় বলে এ পদ্ধতিগুলোকে 'পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি' বলা হয়। এই পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়ত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি সেগুলোর যৌক্তিক সমাধানের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। তাই ব্যবহারিক জীবনে এসব পরীক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে এ পদ্ধতিগুলোর গুরুত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

প্রথমত, অন্বয়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে অনুসন্ধেয় ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্তে সাধারণভাবে উপস্থিত পূর্ববর্তী বিষয়কে কারণ এবং পরবর্তী বিষয়কে কার্য হিসেবে অনুমান করা হয়। আমরা অনেক সময় অন্বয়ী পদ্ধতির এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বা একাধিক বিষয়ে মিল দেখে বাস্তব জীবনেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি। অর্থাৎ এটি ব্যবহারিক জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি।

দ্বিতীয়ত, যে পদ্ধতিতে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অনুসন্ধেয় ঘটনার একটি সদর্থক ও একটি নঞর্থক দৃষ্টান্তের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একমাত্র পূর্বগকে কারণ বা কারণের অনিবার্য অংশ এবং অনুগকে কার্য মনে করা হয়, তাকে ব্যতিরেকী পদ্ধতি বলে। ব্যতিরেকী পদ্ধতির এ সূত্র প্রয়োগ করে যে কোনো জটিল ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব। তাই জীবনের যে কোনো জটিলতায় আমরা এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি।

তৃতীয়ত, যে কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলো প্রকল্প গঠন। কারণ প্রকল্প গঠনের মাধ্যমে একটি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা সংগ্রহ করা যায়। আর যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিটি বৈধ প্রকল্প গঠনে সহায়তা করে থাকে।

চতুর্থত, পরীক্ষণ পদ্ধতিগুলোর সঠিক প্রয়োগে বিশেষ করে যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে দু'দিক থেকে একসাথে নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। অর্থাৎ এতে সদর্থক ও নঞর্থক এ দু'ধরনের দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে পরীক্ষণ পদ্ধতিগুলো থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত সাধারণত নিশ্চিত হয় যা আমরা ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকতে পারি।

পঞ্চমত, কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণের জন্য যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) যে সব পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন সেগুলোর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে কার্য-কারণের পরিমাণগত ও গুণগত সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তাই এ পদ্ধতিগুলোর বৈজ্ঞানিক মূল্য খুবই বেশি। বিশেষ করে পরিশেষ পদ্ধতির সহায়তায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। আর যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই আমাদের ব্যবহারিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ষষ্ঠত, সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বাবস্থায় নিজেদের অজান্তেই সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকে। তাই বলা যায়, সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।

সপ্তমত, ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যকার অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো পরিহার করে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজটি সহজ ও সঠিকভাবে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে যুক্তিবিদ বেইন (Bain) এবং যোসেফ (Joseph) অপনয়ন সূত্রগুলো উদ্ভাবন করেছেন। তাই এ সব সূত্রের সাহায্যে কার্য-কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সহজে ও নির্ভুলভাবে পরিহার করা যায়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক অপ্রত্যাশিত ও অপ্রয়োজনীয় ঘটনার মুখোমুখি হয়ে থাকি। এসব পরিস্থিতিতে অপনয়ন সূত্র নির্দেশিত কৌশলগুলো অনুসরণ করে খুব সহজেই আমরা এগুলো থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।

শিক্ষার্থীর কাজ : ব্যবহারিক জীবনে পরীক্ষণ পদ্ধতির পাঁচটি গুরুত্ব লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল পাঁচটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির কথা বলেন। এ পদ্ধতিগুলো হলো- অন্বয়ী পদ্ধতি, ব্যতিরেকী পদ্ধতি, যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি, সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি এবং পরিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার এবং তা প্রমাণের চেষ্টা করা হয় বলে এ পদ্ধতিগুলোকে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি বলা হয়। এই পরীক্ষণমূলক পদ্ধতিগুলোর সফল প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়ত যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি সেগুলোর যৌক্তিক সমাধানের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। তাই ব্যবহারিক জীবনে এসব পরীক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৫.১৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পাঁচটি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির কথা বলেন-
(ক) যুক্তিবিদ বেইন (খ) যুক্তিবিদ মিল
(গ) যুক্তিবিদ যোসেফ (ঘ) যুক্তিবিদ কপি

২। কোন পদ্ধতিতে দু'দিক থেকে একসাথে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় ?
(ক) অন্বয়ী পদ্ধতিতে (খ) ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে
(গ) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতিতে (ঘ) পরিশেষ পদ্ধতিতে

৩। কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের কাজটি সহজ ও সঠিকভাবে সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে অপনয়ন সূত্রগুলো উদ্ভাবন করেছেন-
(i) যুক্তিবিদ বেইন (ii) যুক্তিবিদ মিল
(iii) যুক্তিবিদ যোসেফ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট- ৫

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। নিচের কোনটি যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল প্রবর্তিত মৌলিক পদ্ধতি?
(ক) অন্বয়ী পদ্ধতি (খ) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(গ) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি (ঘ) পরিশেষ পদ্ধতি

২। যে সব বস্তু দ্রুত তাপ বিকিরণ করতে পারে, সেগুলোর ওপর শিশির জমে এবং যে সব বস্তু দ্রুত তাপ বিকিরণ করতে পারে না, সেগুলোর ওপর শিশির জমে না। অতএব দ্রুত তাপ বিকিরণ করাই হলো শিশির জমা হওয়ার কারণ। - এটি কোন পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির বাস্তব উদাহরণ?
(ক) অন্বয়ী পদ্ধতি (খ) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(গ) সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি (ঘ) পরিশেষ পদ্ধতি

৩। কার্য-কারণ নীতি হলো-
(i) আরোহের আকারগত ভিত্তি (ii) অনিবার্য সম্পর্কের নীতি
(iii) আরোহের আকারগত ও বস্তুগত ভিত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত ত্রুটি দূর করার জন্য যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) একটি পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। এ পদ্ধতিতে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত থাকে। এর একটিতে আলোচ্য ঘটনা ও তার সাথে অন্য একটি অবস্থা উপস্থিত থাকে। আবার অপরটিতে আলোচ্য ঘটনা এবং ঐ বিশেষ অবস্থা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকে এবং শুধুমাত্র একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকে। আর পার্থক্যের বিষয়টি হলো আলোচ্য ঘটনা ও একটি অবস্থার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি। এ পার্থক্যের ভিত্তিতেই উক্ত পদ্ধতিতে ঘটনাটির সাথে ঐ অবস্থার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

৪। উদ্দীপকটিতে যে পদ্ধতির ইঙ্গিত রয়েছে তাহলো-
(ক) অন্বয়ী পদ্ধতি (খ) ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(গ) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি (ঘ) পরিশেষ পদ্ধতি

৫। উদ্দীপকটিতে প্রতিফলিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিচের কোনগুলি প্রযোজ্য?
(i) কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণ করা যায়
(ii) অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত যাচাই করা যায়
(iii) বহুকারণের সম্ভাবনা থেকে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। শশী NASA এর ওপর একটি প্রতিবেদন পড়ে জানতে পারল, চাঁদের পরিবেশ বোঝার জন্য এখানে বায়ুশূন্য কক্ষে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ বিষয়টি নিয়ে সে তার বোনের সাথে আলাপ করছিল। তখন তার বড় বোন বলল বায়ু না থাকায় সেখানে শব্দ শোনা যায় না। বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও পরীক্ষণের মাধ্যমে এই সত্য আবিষ্কার করেছেন।

ক. মিল প্রবর্তিত পরীক্ষণাত্বক পদ্ধতি কয়টি? ১

খ. অন্বয়ী পদ্ধতিকে কেন নিরীক্ষণের পদ্ধতি বলা হয়? ২

গ. শশীর বোন যে পদ্ধতির ইঙ্গিত করেছে সে সম্পর্কে লিখুন। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতিটি পরীক্ষণের পদ্ধতি"-ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। সম্রাট নেপোলিয়ন যখনই নিজে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তখনই তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে জয় লাভ করেছে। অন্যদিকে, যখনই নিজে অনুপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তখনই তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজয় বরন করেছে। অতএব, সম্রাট নেপোলিয়নের উপস্থিতিই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কারণ।

ক. ব্যতিরেকী পদ্ধতির সংজ্ঞা দিন। ১

খ. অন্বয়ী পদ্ধতিকে কেন সাদৃশ্য বা মিলের পদ্ধতি বলা হয়। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে আপনার পাঠ্যপুস্তকের কোন্ বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকটিতে নির্দেশিত বিষয়কে 'আবিষ্কার ও প্রমাণের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায়'- আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১ ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২ ঃ ১-ঘ, ২-ঘ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪ ঃ ১-ঘ, ২-ক, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫ ঃ ১-ঘ, ২-ক, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬ ঃ ১-গ, ২-খ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯ ঃ ১-খ, ২-খ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১০ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১১ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১২ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৩ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৪ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৫ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৬ ঃ ১-খ, ২-ঘ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৭ ঃ ১-ঘ, ২-গ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৮ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-খ

ইউনিট
৬

ব্যাখ্যা
(Explanation)

ভূমিকা

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষ হলো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী। স্বভাবগতভাবেই মানুষ চায় অজানাকে জানতে। যা কিছু জটিল, দুর্বোধ্য বা রহস্যাবৃত্ত, তার রহস্য উন্মোচন করতে। নানা বৈচিত্রপূর্ণ বিস্ময়ে ভরা বিশাল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে অসংখ্য ঘটনা। এসব ঘটনা আমাদের কাছে কখনও সুস্পষ্ট মনে হলেও অনেক ক্ষেত্রে তা থাকে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও রহস্যময়। অস্পষ্ট ও জটিল বিষয় বা ঘটনাকে অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট করে তোলার প্রচেষ্টাই হলো সেই বিষয়ের ব্যাখ্যা। কোনো জটিল বিষয়কে ব্যাখ্যা দেয়ার মাধ্যমেই সেটিকে সহজ করে তোলা যায়। কাজেই যুক্তিবিদ্যার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয় হলো 'ব্যাখ্যা' বা 'ব্যাখ্যাকরণ'।

ইউনিট সমাপ্তির সময় : সর্বোচ্চ ০৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৬.১ : ব্যাখ্যার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা
পাঠ - ৬.২ : ব্যাখ্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ - ৬.৩ : ব্যাখ্যার প্রকারভেদ: বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক ব্যাখ্যা
পাঠ - ৬.৪ : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ
পাঠ - ৬.৫ : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিভিন্ন রূপ
পাঠ - ৬.৬ : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতাসমূহ

পাঠ-৬.১ ব্যাখ্যার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা (Definition and Relevance of Explanation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্যাখ্যা বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন।
- ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

মানুষ কৌতূহলপ্রিয়। আর এ কারণেই প্রত্যেকটি বিষয় জানার প্রতি রয়েছে তার অপরিসীম আগ্রহ। মানব মনের এই কৌতুহল বা জিজ্ঞাসা থেকেই শুরু হয় দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা। মানব সম্পর্কিত জগত ও জীবনের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টাই হলো দর্শন। আর মানুষের চিন্তায় উদ্ভূত জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতেই ব্যাখ্যাকরণ বা ব্যাখ্যার উদ্ভব। বিশুদ্ধ যুক্তিপদ্ধতির বিষয়বস্তুকে আরো সহজ ও বোধগম্য করার জন্য প্রয়োজন ব্যাখ্যার। তাই যুক্তিবিদ্যায় ব্যাখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কার্যকারণ সম্পর্ক আবিস্কারের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ
(Etymological Meaning)

'ব্যাখ্যা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ `Explanation' উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন `Explanare' থেকে। (T.F. Hoad- The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press, Oxford, 1986, P-161.) এই Explanare শব্দটির আবার দুটি অংশ রয়েছে। তা হলো— Ex এবং Planus. Ex অর্থ `out of' বা পূর্বাবস্থা এবং Planus অর্থ `to make plain' বা সহজ করা। কাজেই শব্দগত দিক থেকে 'ব্যাখ্যা' বা Explanation এর অর্থ দাড়ায় অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কোনো পূর্বাবস্থাকে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে তোলা। অর্থাৎ, আমাদের কাছে যেসব বিষয় জটিল বলে মনে হয় সেগুলোকে অত্যন্ত সহজ করে প্রকাশ করাই ব্যাখ্যার কাজ। যুক্তিবিদগণের ভাষায় বলা যায়— যা কিছু অস্পষ্ট, জটিল, দুর্বোধ্য ও রহস্যজনক তাকে স্পষ্ট, সহজ, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করাই হলো ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যার সংজ্ঞা
(Definition of Explanation)

যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড এর ভাষায় বলা যায়— ব্যাখ্যা শব্দের অর্থ হলো অনির্দিষ্ট বিষয়কে সুনির্দিষ্টরূপে অস্পষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা।

আই এম কপি ও কার্ল কোহেন তাঁদের *Introduction to Logic* গ্রন্থে ব্যাখ্যার সংজ্ঞায় বলেন যে, ব্যাখ্যা হলো কতগুলো বিবৃতি বা একটি আলোচনা যার মাধ্যমে ব্যাখ্যাকৃত বিষয়কে যৌক্তিকভাবে প্রতিপাদন করা হয় এবং এ আলোচনার মাধ্যমে ঐ বিষয়ের জটিলতা বা দুর্বোধ্যতা দূর হয়।

আমেরিকান দার্শনিক কার্ল গুস্টাভ হেম্পেল তাঁর Studies in the Logic of Explanation নামক প্রবন্ধে ব্যাখ্যার সংজ্ঞায় বলেন যে, কোনো ঘটনাকে একটি সাধারণ নিয়ম ও যথার্থ জ্ঞানগত নিয়মের মাধ্যমে উপস্থাপন করার নামই ব্যাখ্যা।
উপরের আলোচনা থেকে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, একটা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয়ের পূর্বাবস্থায় আমরা মানসিক দিক থেকে অস্বস্তিতে থাকি। কিন্তু যখন আমরা ঐ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে পারি তখনই সেই অস্বস্তি থেকে নিস্তার পাই। তাই সাধারণভাবে বলা যায়, মানব চেতনায় সৃষ্ট জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিই হলো ব্যাখ্যা।

ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতা
(Relevance of Explanation)

জীবনে চলার পথে মানুষ যেসব জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হয় সেগুলো সহজবোধ্য না হওয়া পর্যন্ত মনে স্বস্তি আসে না। আর ব্যাখ্যার মাধ্যমেই দুর্বোধ্য কোনো বিষয় হয় সহজবোধ্য। যেহেতু ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানব মনের জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় তাই বাস্তব জীবনে ব্যাখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাখ্যা ছাড়া মানব মনের অস্পষ্টতা দূর হয় না। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যার মাধ্যমেই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান পেয়ে থাকেন।

কোনো ঘটনাকে সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও নির্ভুলভাবে যাতে আমরা বুঝতে পারি সেজন্য যুক্তিবিদ্যায় ব্যাখ্যা সম্পর্কিত আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাখ্যার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুর্বোধ্য বিষয় বা রহস্যময় ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত তথ্য ও প্রমাণ দেয়া। যৌক্তিক ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে শুরু করে যে কোনো সমস্যার সহজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোধগম্য করে তোলে। তাই যুক্তিবিদ্যা এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে বৈজ্ঞানিক ও লৌকিক ব্যাখ্যা এ দুই পদ্ধতি নিয়েই আলোচনা করে থাকে। কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক কি-না সে সম্পর্কেও গভীরভাবে সচেতন থাকতে হয়। নিম্নে ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

১। **দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করা:** ব্যাখ্যা হলো এমন এক বিবৃতি যার মাধ্যমে বিষয়টির বর্ণনা দেয়া হয় অত্যন্ত সহজভাবে। ফলে বিচার্য ঘটনার জটিলতা দূর করে আমাদের মনের জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত করে। অর্থাৎ ব্যাখ্যাকরণের মাধ্যমে কোনো দুর্বোধ্য ঘটনাকে সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করা হয়।

২। **বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কার:** ব্যাখ্যার মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা তাঁদের আবিস্কৃত নিয়মগুলোর যোগসূত্র করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে থাকেন।

৩। **সঠিক জ্ঞান লাভ করা:** কোনো বিষয়ের যথার্থ ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের জগতে নতুন তথ্য উন্মোচন করে। ফলে ব্যাখ্যা মানব মনের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সঠিক জ্ঞান লাভে সহায়তা করে।

৪। **কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা:** আমরা জানি প্রত্যেকটি কার্যেরই সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। প্রকৃতিতে যখনই কোনো ঘটনা ঘটে তখনই আমরা তার কারণ জানতে চাই। আর কোনো ঘটনার কারণ এ বিষয়ের যথার্থ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই জানা যায়। সুতরাং বলা যায় ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমাদের কাছে কার্যকারণ সম্পর্ক সুস্পষ্ট হয়।

৫। **শ্রেণিকরণ গঠনের ক্ষেত্রে :** ব্যাখ্যার সাথে শ্রেণিকরণের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ব্যাখ্যার মাধ্যমেই কোনো জটিল দুর্বোধ্য ও রহস্যময় বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে অতি সহজেই শ্রেনিকরণ করা যায়।

৬। **প্রকল্প প্রণয়নে:** প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যার ভূমিকা অনস্বীকার্য। কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিস্কৃত বা প্রমানিত হওয়ার পূর্বে কারণটি প্রকল্পের স্তরে থাকে। তাই প্রকল্পের সাথে ব্যাখ্যার একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ : ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

মানুষ কৌতূহলপ্রিয় বলে প্রত্যেকটি বিষয় জানার প্রতি রয়েছে তার অপরিসীম আগ্রহ। মানব মনের এই কৌতূহল বা জিজ্ঞাসা থেকেই শুরু হয় দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা। মানব সম্পর্কিত জগত ও জীবনের সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টাই হলো দর্শন। যুক্তিবিদগণের ভাষায় বলা যায়— যা কিছু অস্পষ্ট, জটিল, দুর্বোধ্য ও রহস্যজনক তাকে স্পষ্ট, সহজ, সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করাই হলো ব্যাখ্যা। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, নিরীক্ষণ, প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কার্যকারণ সম্পর্ক আবিস্কারের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। 'ব্যাখ্যা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Explanation' উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শব্দ—
(ক) Explain থেকে (খ) Explare থেকে
(গ) Explanare থেকে (ঘ) Explano থেকে

২। "কোনো ঘটনাকে একটি সাধারণ নিয়ম ও যথার্থ জ্ঞানগত নিয়মের মাধ্যমে উপস্থাপন করার নামই ব্যাখ্যা"- উক্তিটি করেছেন-
(ক) যুক্তিবিদ কার্ল গুস্টাভ হেম্পেল (খ) যুক্তিবিদ জে.এস.মিল
(গ) যুক্তিবিদ আই. এম. কপি (ঘ) যুক্তিবিদ ডব্লিউ এইচ.বি. যোসেফ।

৩। যুক্তিবিদ্যায় ব্যাখ্যা একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় এর কারণ হলো ব্যাখ্যা—
(i) দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজ করে;
(i i) বৈজ্ঞানিক নিয়ম আবিষ্কার করে;
(i i i) কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.২ ব্যাখ্যার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Explanation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্যাখ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাখ্যার প্রকৃতি (Nature of Explanation)

এ জগতের ঘটনাবলি যেমন বিচিত্র ধরনের মানুষের মনও তেমনি নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। মানুষের মন ভিন্ন সময়ে ভিন্নভাবে পরিচালিত হয়। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন রকমের হয়। কোনো একটি ব্যাখ্যা একজন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করলেও অন্য ব্যক্তি সেই ব্যাখ্যা দ্বারা সন্তুষ্ট নাও হতে পারে। আবার একটি ব্যাখ্যা কোনো ব্যক্তির কাছে একসময় গ্রহণযোগ্য হলেও সময়ের ব্যবধানে পরবর্তীতে তার কাছে ব্যাখ্যাটি গ্রহণেযোগ্য নাও হতে পারে। আবার যে ব্যাখ্যা একজন বিজ্ঞানীর কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন, সে ব্যাখ্যাই একজন সহজ সরল মানুষের কাছে অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য মনে হতে পারে। শিক্ষাহীন অতিসাধারণ মানুষ প্রকৃতির আকস্মিক ও দৈব ঘটনাকে নিজেদের কল্পনাশক্তি থেকে দেব-দেবী বা দৈত্য-দানবের হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কাল্পনিক কোনোকিছু বিশ্বাস করেন না। তাঁরা কোনো বিষয়ের গবেষণা করে প্রমাণসাপেক্ষে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। যেমন- বর্ষাকালে ডেঙ্গু ও চিকুনগুণিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এক্ষেত্রে গ্রামের সাধারণ মানুষের ব্যাখ্যা হবে কারো অভিশাপের কারণে অথবা কারো বদনজর বা কুদৃষ্টির কারণে কিম্বা কোনো মহাশক্তির ক্ষোভের কারণে জ্বর হয়েছে। কিন্তু একজন চিকিৎসকের ব্যাখ্যা হবে মশার কামড়ে এ রোগের আবির্ভাব হয়েছে।

সময়ের ব্যবধানে ব্যাখ্যার রকমফের হয়ে থাকে। যেমন— প্রাচীনকালে মানুষ চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণকে রাহুর গ্রাস বলে মনে করত। কিন্তু আধুনিককালে মানুষ চন্দ্রগ্রহণকে চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া হিসেবে জানে। আবার চাঁদ যখন পরিভ্রমণরত অবস্থায় কিছু সময়ের জন্য পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে তখন পৃথিবীর মানুষের কাছে সূর্য আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেলে তাকে সূর্যগ্রহণ বলে থাকে। বিজ্ঞানীরা বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করে সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা কেবল ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মতো কোনো ঘটনাকে কেবল বুঝতে বা জানতে চান না, বিষয়ের তাৎপর্যও উপলব্ধি করতে চান।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। এগুলো হলো— ক. যথার্থতা, খ. প্রমাণ ও গ. যুক্তি। যথার্থতা হলো এমন একটি বিবৃতি যা প্রকৃতি জিজ্ঞাসার উত্তর সরবরাহ করে। এ উত্তরের ক্ষেত্রে প্রমাণ হলো বৈজ্ঞানিক তথ্য। আর যুক্তি হলো বৈজ্ঞানিক তথ্যের যৌক্তিক ব্যবহার যার সাহায্যে সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করা যায়।

ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Explanation)

ব্যাখ্যার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা থেকে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলো নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো—

১. জটিল, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয়কে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সহজবোধ্য ও সরলভাবে উপস্থাপন করা যায়।

২. যথার্থ ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানগত জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায়।

৩. কার্যকারণ সম্পর্ক, প্রকল্প প্রণয়ন, শ্রেণিকরণসহ যুক্তিবিদ্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাখ্যা অবরোহ ও আরোহ উভয় প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৪. ব্যাখ্যা কোনো সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে হতে পারে আবার বিশেষ বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কেও হতে পারে।

৫. ব্যাখ্যা কোনো সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার সাধারণ বা ব্যাপকতর নিয়মের অধীন কোনো কম ব্যাপক নিয়ম বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে।

৬. স্থান কাল পাত্রভেদে ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে বলে তা যেমন বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে, তেমনি আবার অসঙ্গতিপূর্ণও হতে পারে। অর্থাৎ, ব্যাখ্যা যেমন যথার্থ হতে পারে তেমনি আবার ভ্রান্তও হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ : ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ব্যাখ্যার গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন রকমের হয়। কোনো একটি ব্যাখ্যা একজন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করলেও অন্য ব্যক্তি সেই ব্যাখ্যা দ্বারা সন্তুষ্ট নাও হতে পারে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী। এগুলো হল্মো ক. যথার্থতা, খ. প্রমাণ ও গ. যুক্তি। ব্যাখ্যা কোনো সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার সাধারণ বা ব্যাপকতর নিয়মের অধীন কোনো কম ব্যাপক নিয়ম বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে ব্যাখ্যা—
(i) একই রকমের হয়; (ii) ভিন্ন রকমের হয়; (iii) পরিবর্তিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। নীচের কোন্‌টি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?
(ক) সার্বিক সত্য প্রতিষ্ঠা করা;
(খ) বিষয়ের তাৎপর্য নির্ণয় করা;
(গ) কাল্পনিক বিষয়ের উপর নির্ভর করা;
(ঘ) যৌক্তিক অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া।

৩। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কয়টি বিষয়ের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী?
(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

পাঠ-৬.৩ ব্যাখ্যার প্রকারভেদঃ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক ব্যাখ্যা (Kinds of Explanation: Scientific Explanation and Popular Explanation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- ব্যাখার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- লৌকিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, ব্যাখ্যাকারীর অবস্থান, শিক্ষাগতযোগ্যতা, চিন্তাশক্তি, বয়স, সামাজিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্রভেদে ব্যাখ্যার তারতম্য হয়ে থাকে । সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ব্যাখ্যা কখনো এক ও অভিন্ন হয় না । ব্যাখ্যা যেমন যাচাইযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ও তথ্যনির্ভর হতে পারে । আবার ব্যাখ্যা অযৌক্তিক মনগড়া কাল্পনিকও হতে পরে । এসব দিক বিচার করে যুক্তিবিদগণ ব্যাখ্যাকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেন । এগুলো হলো—

১. বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (Scientific Explanation) এবং
২. অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (Unscientific Explanation)

অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে লৌকিক ব্যাখ্যাও (Popular Explanation) বলা হয়ে থাকে । নিম্নে ছকের মাধ্যমে ব্যাখ্যার প্রকারভেদ তুলে ধরা হলো—

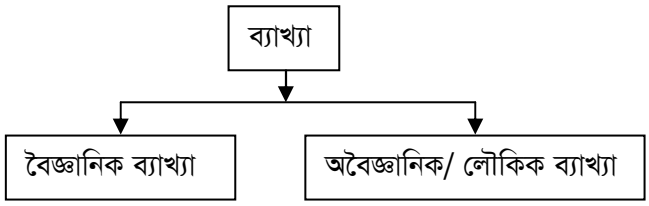

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (Scientific Explanation)

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রদত্ত বিষয়টিকে যুক্তিসম্মতভাবে বর্ণনা করা হয় । এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অন্ধবিশ্বাসের উপস্থিতি থাকে না । আলোচ্য ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচার বিশ্লেষণ করে ঘটনার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয় । অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয় ।

যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড তাঁর *Logic : Inductive* বইয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন যে, ঘটনা সমূহের অন্তর্গত নিয়মাবলি আবিষ্কার করা, অনুমান করা এবং সংযুক্ত করাই হলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকরণ ।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সংযুক্তিকরণ ও অন্তর্ভূক্তিকরণের প্রয়োজন রয়েছে । কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে হলে তার সাথে অন্যান্য জানা ঘটনার মিল খুঁজে সংযুক্ত করতে হয় । আর কোনো একটি নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে হলে তাকে অপেক্ষাকৃত কোনো ব্যাপক নিয়মের অন্তর্ভূক্ত করতে হয় । অর্থাৎ, একটি ঘটে যাওয়া ঘটনার কার্যকারণকে যেমন আবিষ্কার করতে হয় আবার আলোচ্য ঘটনার সাথে অন্যান্য ঘটনার সাদৃশ্যসমূহও নির্ণয় করতে হয় । তাই বলা যায়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রকৃতির নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে ঘটনাবলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে অন্যান্য ঘটনার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে বের করে, সর্বোপরি অল্প ব্যাপক নিয়মকে অধিক ব্যাপক নিয়মের আওতায় আনা হয় ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—জড়বস্তুর ভূমিতে পতনের কারণ ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মটিকে প্রকল্পের আকারে অনুমান করেন। এরপর তিনি ঘটনাকে জোয়ার ভাটা গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করেন। সর্বশেষ তিনি এদের সবগুলোকে মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের অধীনে এনে আলোচ্য বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

লৌকিক বা অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
(Popular or Unscientific Explanation)

প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্তিবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। আর এ দুটি বিষয় সম্পর্কে গ্রাম-গঞ্জের অতিসাধারণ মানুষের তেমন কোনো ধারণা নেই। তবে এসব ব্যক্তি প্রকৃতির প্রতিটি ঘটনারই ব্যাখ্যা দিয়ে যাবে তাদের নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে। সাধারণ মানুষ যেমন কিছু দৈব ও অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করে তেমনি এরা বিভিন্ন প্রকার সামাজিক কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকার কারণে যে কোনো ঘটনাকেই তারা অদৃশ্য শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা দেয়। সাধারণ মানুষের মনের মধ্যকার বিভিন্ন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রতিফলনই হলো লৌকিক ব্যাখ্যা। এ ধরনের ব্যাখ্যায় কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ থাকে না। লৌকিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপস্থিতি থাকে না বলে এটিকে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও (Unscientific Explanation) বলা হয়ে থাকে।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, কোনো ঘটনাকে প্রাকৃতিক নিয়মের ভিত্তি ছাড়া কিম্বা কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভর না করে মানুষ যখন প্রচলিত ধারণা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তির সাহায্যে বা বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে তখন তাকে লৌকিক ব্যাখ্যা বলে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— চন্দ্রগ্রহণ একটি প্রাকৃতিক ঘটনা এবং এটা হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানতাবশত মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের মতে, রাহু নামক এক দেবতা চাঁদকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেললে চাঁদকে আর দেখা যায় না। কিছু সময় পর রাহুর গ্রাস থেকে চাঁদ ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে পূর্ণ আকার ধারণ করে। চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে মানুষের এরূপ বক্তব্যই হলো লৌকিক ব্যাখা।

সারসংক্ষেপ

সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির ব্যাখ্যা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির ব্যাখ্যা কখনো এক ও অভিন্ন হয় না। ব্যাখ্যা যাচাইযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ও তথ্যনির্ভর হতে পারে। আবার ব্যাখ্যা অযৌক্তিক, মনগড়া, কাল্পনিকও হতে পারে। এসব দিক বিচার করে যুক্তিবিদগণ ব্যাখ্যাকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করেন। এগুলো হলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচ্য ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচার বিশ্লেষণ করে ঘটনার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধগুলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। লৌকিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপস্থিতি থাকে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদগণ ব্যাখ্যাকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করেছেন?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। লৌকিক ব্যাখ্যা হলো–
(i) সাধারণ মানুষের ব্যাখ্যা (ii) কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রতিফলন (iii) বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Scientific and Popular Explanations)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- লৌকিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক ও লৌকিক ব্যাখ্যার মধ্যকার পার্থক্যসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Scientific Explanation)

প্রকৃতির নিয়ম-নীতি অনুসরণ না করে কিম্বা বিশেষ তথ্য-উপাত্ত উল্লেখ করা ছাড়া কোনো ঘটনার যুক্তিযুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তব ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হচ্ছে কোনো বিষয় বা ঘটনার যুক্তিসম্মত যথার্থ বর্ণনা উপস্থাপন করা। যেমন—বজ্রপাতের সময় আমরা প্রচণ্ড শব্দ শুনতে পাই। এ সময় আমাদের মনে হয় বিদ্যুৎই প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে। কিন্তু বজ্রপাতের সময় শব্দ উৎপন্ন হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হলো বিদ্যুৎশক্তি উত্তাপ সৃষ্টি করে, আর উত্তাপ বায়ুকে প্রসারিত করার ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়।

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ করলে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো—

১। **বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবরোহমূলক প্রক্রিয়া:** আমরা জানি, অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে কম ব্যাপক কোনো বিশিষ্ট নিয়মকে অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যাপক নিয়ম দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। তেমনি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও কম ব্যাপক কোনো বিশেষ নিয়মকে বেশি ব্যাপক নিয়মের অধীনে এনে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে বেশি ব্যাপক নিয়মটিকে অবশ্যই মৌলিক হতে হয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা স্বত:সিদ্ধ, মৌলিক নিয়মের অধীনে এনে কোনো বিশেষ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে। আবার অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রেও স্বত:সিদ্ধ মৌলিক নিয়ম থেকে কোনো বিশেষ ঘটনাকে অনিবার্যভাবে নি:সৃত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— জোয়ার ভাটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের অধীনে এনে এর ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম হলো বেশি ব্যাপক মৌলিক নিয়ম আর জোয়ার ভাটার নিয়ম হলো কম ব্যাপক বিশেষ নিয়ম।

২। **বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরোহের সাথে সম্পর্কিত :** বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রধাণ ও মৌলিক শর্ত হলো ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে কোনো জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজ সরল ও অর্থবহ করে তোলা হয়। কোনো ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার না করলে বিষয়টি সহজবোধ্য হয় না। আর আরোহ হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যেখানে কার্যকারণ নীতির বাস্তব প্রয়োগ থাকে। তাই বলা যায়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও আরোহ ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত।

৩। **বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত:** আমরা জানি, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো ঘটনার কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু যখন কোনো ঘটনার কারণ সরাসরি আবিষ্কার করা যায় না তখন ঐ ঘটনা সম্পর্কে প্রকল্প তৈরি করা হয়। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন,গণিত, জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মৌলিক ও স্বত:সিদ্ধ নিয়মগুলো প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ব্যাখ্যা প্রকল্পের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। মূলত প্রকল্প হলো ব্যাখ্যাদানের প্রচেষ্টা। প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করে ঐ বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়। তাই বলা যায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে প্রকল্পের অত্যন্ত

ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল হলেও এ দুটো প্রক্রিয়া এক নয়।

৪। **বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রেণিকরণের সাথে সম্পর্কিত :** এই পৃথিবীতে রয়েছে অগনিত গাছ গাছালি, পাখ-পাখালি, বস্তু, প্রাণী আরো অনেক কিছু। বস্তু জগত বা প্রাণিজগত বা অন্য যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রেই এদের প্রধান প্রধান লক্ষণের দিক থেকে একসঙ্গে বিন্যস্ত করাই হলো শ্রেণিকরণ। শ্রেণিকরণ এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও শ্রেণিকরণ উভয়ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে ব্যাখা দেয়া হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কোনো ঘটনা বা বিষয় কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত তা নির্ণয় করা হয়। এছাড়াও শ্রেণিকরণের মত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও কম ব্যাপক নিয়মকে অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যাপক নিয়মের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এ জন্য বলা হয় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও শ্রেণিকরণ একে অপরের পরিপূরক।

৫। **বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সংযুক্তিকরণের সাথে সম্পর্কিত :** কোনো ঘটনা বা বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গেলে অনুরূপ অন্য ঘটনা বা বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করতে হয়। সংযুক্তিকরণের অর্থই হলো কোনো ঘটনার সাথে অন্যান্য ঘটনার সাদৃশ্য বা মিল খুঁজে বের করা। যেমন— মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম দিয়ে আমরা জোয়ার ভাটার ব্যাখ্যা দেই কারণ উভয় ঘটনাই আকর্ষণ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত। একটি ঘটনার সাথে অন্য ঘটনার সংযুক্তিকরণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপরিহার্য বিষয়। যেমন— ঘোড়া ও জেব্রার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ দুটি প্রাণী বিশেষ দিক থেকে সমতুল্য। আর এজন্য ঘোড়া ও জেব্রার মধ্যে খুব সহজেই সংযোগ করা যায়।

৬। **বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যৌক্তিক:** বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সব সময়ই কুসংস্কারমুক্ত, প্রাসঙ্গিক ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে কোনো ঘটনার সত্যতা নির্ণয় করা হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মধ্যে রয়েছে পরখযোগ্যতা যার মাধ্যমে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যাকে নির্ভুলভাবে বর্ণনা করা যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলা যায় যে, এটি একটি যৌক্তিক বিজ্ঞান ভিত্তিক বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুগোপযোগী। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মনীতি মেনে শৃঙ্খলার সাথে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হয় বলে এর যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে।

লৌকিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Popular Explanation)

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে লৌকিক ব্যাখ্যায় সাধারণ মানুষ তাদের মনগড়া ধারণা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোনো ঘটনা বা বিষয়কে অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক শক্তির সাহায্যে বা বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে থাকে। নিম্নে লৌকিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১। **লৌকিক ব্যাখ্যা কুসংস্কারপূর্ণ ঃ** অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই সাধারণ মানুষ লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রচলিত ধারণা ও কুসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে কোনো ঘটনা বা বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। যেমন—ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। এর সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কুসংস্কার মনোভাব নিয়ে মনগড়া ধারণা থেকে বলে যে, পৃথিবী একটা বড় ষাঁড়ের একটা শিং এর উপর থাকে, কিছু দিন পর পর ষাঁড়টি এক শিং থেকে অন্য শিং এ পৃথিবীকে নিয়ে যায় তখন পৃথিবীটা কেঁপে ওঠে আর এতেই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

২। **লৌকিক ব্যাখ্যা বাহ্যিক সাদৃশ্যমূলক :** লৌকিক ব্যাখ্যায় বাহ্যিক ও বিচ্ছিন্ন সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে কোনো বিষয় বা ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া হয়। যেমন— বাদুড়কে পাখির মতো উড়তে দেখে এ বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে লৌকিক ব্যাখ্যায় বাদুড়কে পাখি বলা হয়। কিন্তু বাদুড়ের দাঁত, লোম, বাচ্চাপ্রসব, স্তন্যপান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্যান্য পাখির নেই।

৩। **অনুপপত্তির উদ্ভবঃ** লৌকিক ব্যাখ্যায় কোনো ঘটনা বা বিষয়ের মৌলিক ও অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা হয় বলে এক্ষেত্রে প্রায়শই অসাধু সাদৃশ্যমূলক অনুমান অনুপপত্তির উদ্ভব হয়।

৪। **স্থান-কাল পাত্রভেদে ভিন্নতা :** দেশকাল পাত্রভেদে একই ঘটনার লৌকিক ব্যাখ্যা একেক রকম হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিশ্বাস, শিক্ষা, চরিত্র, রুচি, বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ের পার্থক্যের কারণেই এমনটি হয়ে থাকে। পরিবার ও সমাজভেদে লৌকিক ব্যাখ্যা বিভিন্নরূপে উপস্থাপিত হয় বলে এ ব্যাখ্যা পরিবর্তনশীল।

৫। **লৌকিক ব্যাখ্যা অযৌক্তিক :** প্রথাগত বিশ্বাস, আপ্তবাক্য (Authority), প্রত্যাদেশ (Revelation) প্রভৃতি লৌকিক ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি। কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ বা যাচাই ছাড়াই প্রচলিত ধারণা থেকে লৌকিক ব্যাখ্যা দেয়া হয় বলে এটি অযৌক্তিক। লৌকিক ব্যাখ্যা অনির্দিষ্ট ও অবাস্তব বলে প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। ফলে এ ধরনের ব্যাখ্যা যাচাই করা যায় না।

৬। **সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনুপস্থিতি ঃ** লৌকিক ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নীতি ও কার্যকারণ সম্পর্কের নীতি অনুপস্থিত থাকে। অনেক সময় লৌকিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো ঘটনার অন্তর্গত একটি মাত্র শর্তকে সমগ্র কারণ বলে ভুল করা হয়।

৭। **লৌকিক ব্যাখ্যা পশ্চাৎধর্মীঃ** সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির উন্নয়নের দিক থেকে লৌকিক ব্যাখ্যা অনেকটাই পিছিয়ে আছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি কিছু শ্রেণির মানুষ ভূত পেত্নীতে বিশ্বাস করা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁক করা, দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করা প্রভৃতি বিষয়ের চিন্তা লৌকিক ব্যাখ্যার মাধ্যমেই করে থাকে। অলীক অবাস্তব কল্পনা, নির্বিচার বিশ্বাস এবং অযৌক্তিক কুসংস্কার লৌকিক ব্যাখ্যাকে পশ্চাৎপদ করে তোলে। এ ধরনের ব্যাখ্যায় কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সংশয়, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা দেখা দিলে যুক্তিহীনভাবে নিজেদের বিশ্বাস ও মনগড়া ধারণা দিয়েই সমাধান দেয়া হয়ে থাকে। তবে একথাও ঠিক যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এ জাতীয় ব্যাখ্যা অচল হয়ে আসছে।

বৈজ্ঞানিক ও লৌকিক ব্যাখ্যার পার্থক্যসমূহ
(Differences between Scientific and Popular Explanations)

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও লৌকিক ব্যাখ্যার মধ্যকার পার্থক্যসমূহ খুব সহজে বোঝার জন্য নিম্নে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

পার্থক্যের ধরণ	বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা	লৌকিক ব্যাখ্যা
উৎসগত	বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ যার দ্বারা সত্যতা যাচাই করা হয়।	লৌকিক ব্যাখ্যার উৎস প্রথাগত বিশ্বাস যার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।
নিয়মগত	বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো ঘটনাকে উচ্চতর নিয়মের অধীনে এনে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এখানে আকস্মিকতার কোনো স্থান নেই।	লৌকিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো ঘটনাকে কার্যকারণ সম্পর্ক বা উচ্চতর নিয়মের অধীনে এনে ব্যাখ্যা না দিয়ে আকস্মিকতাকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
সম্পৃক্ততাগত	বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরোহের সাথে সম্পৃক্ত	লৌকিক ব্যাখ্যা আরোহের সাথে সম্পৃক্ত নয়।
উদ্দেশ্যগত	বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্য সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করা।	লৌকিক ব্যাখ্যার মূল উদ্দেশ্য বিশিষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা।
পরিসরগত	বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিভিত্তিক বলে এর পরিসর সীমিত।	লৌকিক ব্যাখ্যা মনগড়া বলে এর পরিসর ব্যাপক।
প্রকল্পগত	বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ক্ষেত্রে ঘটনার কারণ আবিষ্কার করার উদ্দেশ্য প্রকল্প প্রণয়ন	লৌকিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রকল্প প্রণয়নের প্রয়োজন হয় না।

	করতে হয় ।	
গবেষণাগত	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গবেষণার মাধ্যমে এ ব্যাখ্যা দেয়া হয় বলে এটি সার্বজনীন হয় ।	বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া কোনো প্রকার গবেষণা না করে যে কেউ তার নিজস্ব বিশ্বাস ও ধারণা থেকে এ ব্যাখ্যা দেয় বলে এটি দেশ-কাল-পাত্রভেদে একেক রকম হয়ে থাকে ।
সাদৃশ্যগত	এক্ষেত্রে ঘটনার মৌলিক ও অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা দেয়া হয় ।	এক্ষেত্রে কোনো ঘটনার বাহ্যিক ও গুরুত্বহীন সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা দেয়া হয় ।
ব্যাখ্যাগত	বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং বাস্তব কারণের সাহায্যে ঘটনার ব্যাখ্যা দেয় ।	লৌকিক ব্যাখ্যা অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক কারণসমূহের উপর ভিত্তি করে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা দেয় ।

শিক্ষার্থীর কাজ : বৈজ্ঞানিক ও লৌকিক ব্যাখ্যার পার্থক্যসমূহের একটি ছক তৈরি করুন ।

সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকে বিশ্লেষণ করলে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় । এ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো— বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অবরোহমূলক প্রক্রিয়া, এটি আরোহের সাথে সম্পর্কিত, এটি প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত, এটি শ্রেণিকরণের সাথে সম্পর্কিত, এটি সংযুক্তিকরণের সাথে সম্পর্কিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যৌক্তিক । অন্যদিকে লৌকিক ব্যাখ্যা কুসংস্কারপূর্ণ, বাহ্যিক সাদৃশ্যমূলক, অনুপপত্তিযুক্ত, স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন,অযৌক্তিক,সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনুপস্থিতি ও পশ্চাৎধর্মী ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন— ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন ।

১ । নিচের কোন্‌টি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরোহের সাথে সম্পর্কিত (খ) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত
(গ) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শ্রেণিকরণের সাথে সম্পর্কিত (ঘ) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কাল্পনিক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত

২ । লৌকিক ব্যাখ্যা—
(i) অযৌক্তিক (ii) সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনুসারী
(iii) স্থান-কাল- পাত্র ভেদে ভিন্ন

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩ । নিচের কোনটি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়?
(ক) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা । (খ) লৌকিক ব্যাখ্যায় আকস্মিকতার গুরুত্ব রয়েছে ।
(গ) লৌকিক ব্যাখ্যার পরিসর ব্যাপক । (ঘ) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পদ্ধতি ভিত্তিক ।

পাঠ-৬.৫ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Scientific Explanation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিভিন্ন ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিভিন্ন রূপের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

পূর্বের পাঠসমূহের আলোচনা থেকে এ কথা বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানেই কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানেই কোনো ঘটনা বা নিয়ম সম্পর্কিত ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যার অর্থ হলো বিশিষ্ট নিয়ম বা ব্যাপকতর নিয়মকে সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা করা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাস্তব কারণ সম্পর্কিত বলে এটি সর্বদাই প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক হয়ে থাকে। যুক্তিবিদ জে এস মিল নিয়মের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তিনটা রূপের উল্লেখ করেছেন। যথা—

১. বিশ্লেষণ (Analysis)
২. শৃঙ্খল-যোজন (Concatenation)
৩. অন্তর্ভূক্তি (Subsumption)

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তিনটি রূপকে ছকের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যায়—

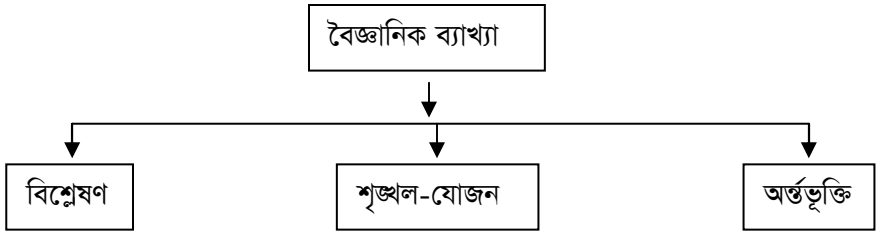

চিত্র: বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার বিভিন্ন রূপ

১। **বিশ্লেষণ (Analysis) :** ইংরেজি 'Analysis' শব্দের বাংলা অর্থ হলো বিশ্লেষণ। 'Analysis' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ 'Analuein' থেকে যার অর্থ হলো একটি সমগ্রকে তার অন্তর্ভুক্ত অংশসমূহে বিভক্তিকরণ।

কতগুলো পৃথক পৃথক কারণের মিলিত ক্রিয়ার ফলে একটা মিশ্র কার্য উৎপন্ন হয়। এই মিশ্র কার্যকে বর্ণনা করার সময় কারণের বিভিন্ন অংশকে বিভক্ত করে সেগুলির প্রভাব বিচারের মাধ্যমে কোনো জটিল ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এ ধরনের ব্যাখ্যায় একটি মিশ্র কার্যকে তার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন কারণাংশে বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ, বিশ্লেষণ বলতে কোনো ঘটনাকে মৌলিক অংশসমূহে ভাগ করে এর উৎপত্তি, আনুষঙ্গিক কারণ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উদঘাটন করাকে বুঝায়। আরো সহজ করে বলা যায়, যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকরণে কোনো মিশ্র কার্যকে স্বতন্ত্র কারণ সমূহের নিয়মের সাথে যুক্ত করা হয় তাকে বিশ্লেষণ বলে। এ ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কার্য সংমিশ্রণ জনিত ঘটনাকে ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহার করা হয়। কার্য-সংমিশ্রণে মিশ্র কার্যটি স্বতন্ত্র কার্যসমূহের সমষ্টির সমান। এরূপ একটি মিশ্র কার্যের পিছনে কয়েকটি স্বতন্ত্র কারণ কাজ করে এবং তারা একত্রে মিলিত হয়ে যৌথ কার্য উৎপন্ন করে। মিশ্র কার্যকে সহজভাবে প্রকাশ করার জন্য বিশ্লেষণ নামক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। কোনো মিশ্র

কার্য যখন এক সাথে সক্রিয় কতগুলি কারণের জন্য সংঘটিত হয় তখন একে সঠিকভাবে বর্ণনা করাকেই বিশ্লেষণ বলে। যেমন—নদীতে চলমান একটি নৌকার গতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে দেখা যায় যে, এটি একটি মিশ্র কার্য। নৌকার গতি বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে নদীর স্রোত, বাতাসের বেগ, দাঁড়ের ব্যবহার ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। এ কারণগুলো একসাথে কাজ করে নৌকার গতি সৃষ্টি করে।

২। **শৃঙ্খল-যোজন (Concatenation) :** শৃঙ্খল-যোজন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ ' Concatenation' এর উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Concatenare থেকে যার অর্থ হলো 'Link together'। যখন কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা কারণ ও তার দূরবর্তী কার্যের মধ্যবর্তী পর্যায়সমূহ আবিষ্কারের মাধ্যমে ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, তখন তাকে শৃঙ্খল-যোজন বলে। শৃঙ্খল-যোজনের সাহায্যে কোনো ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদানের সময় কারণ ও তার দূরবর্তী কার্যের মধ্যবর্তী পর্যায়সমূহ সংযোজন করা হয়। অনেক সময় কার্য সরাসরি কোনো কারণ দ্বারা ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী স্তর বা ধাপের মাধ্যমেই কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ শৃঙ্খল-যোজনের ক্ষেত্রে দূরবর্তী কারণ ও তার কার্যের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা আবিষ্কার করা হয় এবং দেখানো হয় যে, কার্য প্রত্যক্ষভাবে দূরবর্তী কারণ থেকে হয় না বরং কার্য ও দূরবর্তী কারণের মধ্যবর্তী কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। যেমন— পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতকে অনেক সময় সমৃদ্ধির কারণ বলা হয়। কিন্তু সমৃদ্ধির প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে, পর্যাপ্ত পরিমান বৃষ্টিপাতের ফলে ভালো ফসল জন্মে আর ভালো ফসল সমৃদ্ধি বয়ে আনে। অর্থাৎ, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে ভালো ফসলের কারণ এবং ভালো ফসল হচ্ছে সমৃদ্ধির কারণ। এখানে ভালো ফসল হচ্ছে মধ্যবর্তী অবস্থা যা ভালো বৃষ্টি ও সমৃদ্ধির মধ্যে শৃঙ্খলযোজন করে।

৩। **অন্তর্ভুক্তি (Subsumption) :** 'অন্তর্ভুক্তি' এর ইংরেজি 'Subsumption' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ `Subsumere' থেকে যার অর্থ হলো— include or absorb in something else বা কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত করা। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো কম ব্যাপক নিয়মকে ব্যাপকতর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা করাকেই অন্তর্ভুক্তি বলে। অর্থাৎ কোনো ক্ষুদ্রতর নিয়মকে বৃহত্তর নিয়মের অবরোহী সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখানো কিম্বা কোনো ব্যাপকতর নিয়মকে কারণ ও ব্যাখ্যার নিয়মের পরিনতি হিসেবে দেখানোই অন্তর্ভুক্তি নামক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। প্রায় ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় একটা কম ব্যাপক নিয়মকে অধিক ব্যাপক নিয়মের অধীনে এনে প্রকাশ করা হয়। যেমন—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জড়বস্তুরই ভূপৃষ্ঠে পতন ঘটে। এই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে যখন সাধারণ 'মহাকর্ষণ' নিয়মের অধীনে আনা হয় তখন অর্ন্তভুক্তি' নামক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হয়। তেমনিভাবে চুম্বকত্বের নিয়মকে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপকতর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা করা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত তিন প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যেই মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। ব্যাখ্যাকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ (Particular) ঘটনা বা নিয়ম থেকে সার্বিক (Universal) নিয়মে গমন করা হয়। আর এটা বিশ্লেষণ, শৃঙ্খল-যোজন ও অন্তর্ভুক্তি এ তিনটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তিনটি রুপ লিপিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

যুক্তিবিদ জে এস মিল নিয়মের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তিনটা রূপের উল্লেখ করেছেন। যথা— বিশ্লেষণ, শৃঙ্খল-যোজন ও অন্তর্ভূক্তি। বিশ্লেষণ বলতে কোনো ঘটনাকে মৌলিক অংশসমূহে ভাগ করে এর উৎপত্তি, আনুষঙ্গিক কারণ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উদঘাটন করাকে বুঝায়। যখন কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা কারণ ও তার দূরবর্তী কার্যের মধ্যবর্তী পর্যায়সমূহ আবিষ্কারের মাধ্যমে ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, তখন তাকে শৃঙ্খল যোজন বলে। আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোনো কম ব্যাপক নিয়মকে ব্যাপকতর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা করাকেই অন্তর্ভুক্তি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন ।

১ । বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার রূপ কয়টি?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (৫) ৫টি

২ । কোনো ঘটনাকে মৌলিক অংশসমূহকে ভাগ করে এর উৎপত্তি, আনুষঙ্গিক কারণ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য উদঘাটন করাকে বলে—
(ক) সংশ্লেষণ (খ) শৃংখল-যোজন
(গ) বিশ্লেষণ (ঘ) অন্তর্ভুক্তি

৩ । ব্যাখ্যাকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ম বা ঘটনা থেকে সার্বিক নিয়মে গমন করা হয় ।" এ নিয়মটি যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহলো—
(i) বিশ্লেষণ; (ii) শৃঙ্খল-যোজন;
((iii) সংশ্লেষণ

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৬ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতাসমূহ (Limitations of Scientific Explanation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠসমূহে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিভিন্নভাবে আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যে কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গেলে বাস্তবের সাথে মিল বা সাদৃশ্যমূলক অন্য আরেকটি বিষয়কে খুঁজে বের করা হয়। কেননা, সাদৃশ্যমূলক বিষয়ের ব্যাখ্যাকরণের মাধ্যমে জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয় সহজ ও বোধগম্য হয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক ঘটনা বা নিয়ম আছে যেগুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ ঘটনাগুলোকে যেমন অন্য কোনো বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য দেখিয়ে সংযুক্ত করা যায় না তেমনি এগুলোকে অন্য কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্তও করা যায় না। অথচ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সংযুক্তকরণ ও অন্তর্ভুক্তকরণ। এজন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ব্যাপ্তির শেষ সীমা আছে যার বাইরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। নিম্নে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতাসমূহ আলোকপাত করা হলো :

১। **বিশ্বের উৎপত্তি :** এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, এ জগতের উৎপত্তির আদি সত্তা কী প্রভৃতি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা, কোনো একটি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে হলে তাকে বিশ্লেষণ, শৃঙ্খল যোজন এবং অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনতে হয়। কিন্তু বিশ্বের উৎপত্তি বা ঐ জাতীয় মৌলিক বিষয়কে বিশ্লেষণ, শৃঙ্খলযোজন ও অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনা সম্ভব হয় না। এ জন্য বিশ্বের উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়।

২। **অনন্য বিষয় :** যে সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র অর্থাৎ অন্যান্য ঘটনা বা বিষয় থেকে একেবারেই আলাদা বা অনন্য, সে সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। যেমন— মানুষের মনের চেতনা, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি বিষয় নিজেরা অনন্য এবং এগুলো অন্য কোনো বিষয় বা ঘটনার সাথে সম্পর্কিত নয়। কাজেই এসব বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না।

৩। **বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু :** বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মাঝে অসংখ্য বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে সবগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এদের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। আবার, বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর বৈশিষ্ট্যের মিল খুজে পাওয়া যায় না বিধায় এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া অসম্ভব হয়।

৪। **জড়বস্তুর মুখ্য গুণ :** বিস্তার, আকার, ওজন, গতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ হচ্ছে বস্তুর মুখ্য বা মৌলিক গুণ। এসব গুণ পরস্পর ভিন্ন ও এগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বলে এদের সংযুক্ত করা যায় না। এজন্য জড় বস্তুর মুখ্য গুণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না।

৫। **মনের মৌলিক অনুভূতি :** মনের বিভিন্ন অনুভূতিসমূহ যেমন— সুখ, দু:খ, আনন্দ, বেদনা এদের প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র এবং একটি থেকে অন্যটি আলাদা। এদের কোনো একটিকে অন্যটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করা কিম্বা সংযুক্ত করা যায় না। ফলে মনের এই অনুভূতিসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না।

৬। **চেতনার মৌলিক অবস্থা :** মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব। চিন্তাশক্তি মানুষের মৌলিক গুণ। চেতনার মৌলিক অবস্থা বলতে বুঝায় কোনো কিছুর রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, বর্ণ, স্পর্শ, স্বাদ প্রভৃতি বিষয়কে। ব্যক্তি ও অবস্থা ভেদে চেতনার

এ মৌলিক বিষয়গুলির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। চেতনার অবস্থা সর্বদাই আপেক্ষিক এবং পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এছাড়াও চেতনার এ বিভিন্ন অবস্থাগুলোর একটির সাথে অপরটির মিল নেই এবং এদের একটির সাথে অপরটি সংযুক্তও করা যায় না ফলে এদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়াও সম্ভব হয় না।

৭। **মৌলিক বা পরম নিয়ম :** মৌলিক বা পরম নিয়মসমূহকে সার্বিক নিয়ম বলা হয়। এসব নিয়মসমূহকে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এই মৌলিক নিয়মগুলো সর্বাপেক্ষা ব্যাপক তাই এদের চেয়ে ব্যাপকতর কোনো নিয়ম হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাকরণের ক্ষেত্রে কোনো নিয়মকে উচ্চতর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। অথচ পরম নিয়মসমূহ সবচেয়ে ব্যাপক বলে এগুলোকে অন্য কোনো উচ্চতর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, আবার অন্য কোনো নিয়মের সাথে সাদৃশ্যও দেখানো সম্ভব হয় না। ফলে প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি, কার্যকারণ নীতি, বিরোধ নিয়ম, অভেদ নিয়ম, চিন্তার মৌলিক নিয়ম ইত্যাদি মৌলিক বা পরম নিয়মসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।

শিক্ষার্থীর কাজ : বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতার একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ব্যাপ্তির শেষ সীমা আছে যার বাইরে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়। বিশ্বের উৎপত্তি, অনন্য বিষয়, বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু, জড়বস্তুর মুখ্য গুণ, মনের মৌলিক অনুভূতি, চেতনার মৌলিক অবস্থা, মৌলিক বা পরম নিয়ম ইত্যাদি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন ।

১। নিচের কোন্ বিষয়গুলো অনন্য?
(ক) বস্তুর আকার, আয়তন ও ওজন (খ) মনের চেতনা, আত্মা ও ঈশ্বর
(গ) সুখ, দু:খ ও আনন্দ (ঘ) রূপ, রস ও স্পর্শ

২। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেয়া যায় না, কারণ এগুলো—
(ক) অনন্য বিষয় (খ) জড়বস্তুর মুখ্য গুণ
(গ) চেতনার মৌলিক অবস্থা (ঘ) বিশিষ্ট বস্তু

৩। মৌলিক বা পরম নিয়মগুলো হলো–
(i) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি; (ii) বিরোধ নিয়ম;
(iii) অভেদ নিয়ম

নিচের কোন্টি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট- ৬

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। লৌকিক ব্যাখ্যা-
(ক) বিজ্ঞানসম্মত (খ) যুক্তিযুক্ত
(গ) বিচারবিযুক্ত (ঘ) আধুনিক

২। মিশ্র কার্যকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করাকে বলে-
(ক) বিশ্লেষণ (খ) শৃংখল-যোজন
(গ) সংজ্ঞায়ন (ঘ) অন্তর্ভুক্তি

৩। কোনো ঘটনায় ব্যখ্যার অন্যতম কাজ হলো-
(i) তথ্য আবিষ্কার করা (ii) তথ্য প্রমাণ করা
(iii) জটিল, কঠিন ও দুর্বোধ্য তথ্যকে সহজ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে রায়হান বললো, রাহু দেবতা চাঁদকে গ্রাস করায় এমন হয় । কিন্তু তাঁর শিক্ষক জনাব মাজেদ বললেন, চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত সঠিক ব্যাখ্যা হলো- পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে অবস্থান করায় এমন হয় ।

৪ । উদ্দীপকটিতে রায়হানের বক্তব্যে কিসের প্রতিফলন ঘটেছে?

(ক) লৌকিক ব্যাখ্যার (খ) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার

(গ) আরোহের (ঘ) শ্রেণিকরণের

৫ । উদ্দীপকটিতে রায়হান ও তার শিক্ষকের বক্তব্য তুলনা করলে দেখা যায় যে-

(i) রায়হানের ব্যাখ্যাটি হলো লৌকিক ব্যাখ্যা

(ii) শিক্ষকের ব্যাখ্যাটি হলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

(iii) উভয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

রচনামূলক প্রশ্ন :

১ । এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সুনামির ক্ষয়ক্ষতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, ঘন্টায় ৮০ কি. মি. গতিতে সুনামি উপকূলে আঘাত হানে । তাই উপকূলবর্তী ঘরবাড়ী ও গাছপালা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষের জানমালের ক্ষতি হয় । কিন্তু এলাকার বয়স্ক ব্যক্তি রমিজ মিয়া বললেন, "সমুদ্রদেবতা অসন্তুষ্ট হলেই কেবলমাত্র এমন ঘটনা ঘটে ।"

ক. বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কাকে বলে? ১

খ. লৌকিক ব্যাখ্যা কেন যথার্থ ব্যাখ্যা নয় ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রমিজ মিয়ার উক্তিটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন । ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রমিজ মিয়ার ও এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ব্যাখ্যার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন । ৪

২ । রীনা তার পড়ার টেবিলে বসে মনোযোগ সহকারে পরীক্ষার পড়া পড়ছিল । কিন্তু হঠাৎ সে অনুভব করলো যে তার বসার চেয়ার ও পড়ার টেবিল কাঁপছে । তার এক প্রশ্নের জবাবে মা বললেন, হয়তো ভূমিকম্প হচ্ছে । এমন সময় বাসার কাজের মেয়ে আছিয়া দৌড়ে এসে বললো, "এই পৃথিবীটা একটি বড় মাছের পিঠের উপর অবস্থান করছে । মাছটি যখন নড়ে উঠে তখনি ভূমিকম্প হয় ।" আছিয়ার এ কথা শুনে রীনার মা হেসে বললেন, আরে বোকা ঘটনাটি আসলে তা নয় । ভূ-আলোড়নের ফলে ভূত্বকের কোনো স্থানে শীলা ধ্বসে পড়লে বা শীলাচ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয় ।

ক. ব্যাখ্যা কত প্রকার ও কী কী? ১

খ. অন্তর্ভূক্তি বলতে কী বুঝায় ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আছিয়ার উক্তিটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আছিয়ার ও রীনার মার বক্তব্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ ঃ ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ ঃ ১-গ, ২-গ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ ঃ ১-ক, ২-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ ঃ ১-ঘ, ২-খ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-ঘ

ইউনিট
৭

শ্রেণিকরণ
(Classification)

ভূমিকা

বৈচিত্র্যময় এ বিশ্বজগতের বিভিন্ন প্রকার বস্তু বা ঘটনাবলির মধ্যে নানা ধরনের সম্বন্ধ রয়েছে। এসব বস্তু বা ঘটনাবলির মধ্যে আমরা কখনো বাহ্যিক আবার কখনো অন্তর্নিহিত মিল বা অমিল দেখতে পাই। প্রকৃতির মাঝে বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনাবলি এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে থাকে। বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকলে কোনো বিষয়ের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। এ জন্য জাগতিক বিষয় সমূহকে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা রীতিতে সাজাতে হয়। বিশ্ব প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় বস্তু ও ঘটনাকে একত্রে সন্নিবেশিত করার জন্যই শ্রেণিকরণের উদ্ভব হয়েছে। আরোহ অনুমানের একটি অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় হলো শ্রেণিকরণ। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি অপরিহার্যও বটে। শ্রেণিকরণ একটি মানসিক প্রক্রিয়া।

ইউনিট সমাপ্তির সময় : সর্বোচ্চ ০৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৭.১ : শ্রেণিকরণের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও নিয়মাবলি
পাঠ - ৭.২ : শ্রেণিকরণের ভিত্তি
পাঠ - ৭.৩ : শ্রেণিকরণের প্রকারভেদ
পাঠ - ৭.৪ : প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ
পাঠ - ৭.৫ : শ্রেণিকরণের সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ

পাঠ-৭.১ শ্রেণিকরণের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও নিয়মাবলি (Definition, Nature and Rules of Classification)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- শ্রেণিকরণ সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- শ্রেণিকরণের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শ্রেণিকরণের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবেন।

শ্রেণিকরণের সংজ্ঞা (Definition of Classification)

স্বভাবগতভাবেই মানুষ চায় কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সুসংঘবদ্ধ জ্ঞান লাভ করতে। কিন্তু বিশ্বজগতে সকল ঘটনাই সুবিন্যস্ত অবস্থায় থাকে না। আর তাই শ্রেণিকরণের মাধ্যমে আমরা কোনো বস্তু বা ঘটনাবলির মধ্যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে এক একটি শ্রেণির অন্তর্গত করে এদেরকে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করি। ফলে প্রকৃতিতে যেমন আমরা বস্তুসমূহকে চিনতে পারি তেমনি খুব সহজেই কোনো বিশেষ শ্রেণির অন্তর্গত বিশেষ কোনো বস্তু বা ঘটনাবলিকেও জানতে পারি। অর্থাৎ শ্রেণিকরণের মাধ্যমে বিশ্বজগতের অসংখ্য বিষয় বা ঘটনাবলি সম্পর্কে অতি সহজেই সুবিন্যস্ত জ্ঞান লাভ করা যায়।

বিশ্বজগতের বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনাবলিকে বিশেষ কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে সাজানোর মানসিক প্রক্রিয়াই হলো শ্রেণিকরণ। শ্রেণিকরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড (Carveth Read) বলেন যে— কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলিকে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে একত্রে সন্নিবেশিত করার মানসিক প্রক্রিয়াকে শ্রেণিকরণ বলে।

অর্থাৎ শ্রেণিকরণের মাধ্যমে কোনো বস্তু বা ঘটনাবলির স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে নিম্নতর শ্রেণিকে উচ্চতর শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন-প্রাণিজগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, এর মধ্যে কিছু রয়েছে মেরুদণ্ডী প্রাণী আবার কিছু রয়েছে অমেরুণ্ডী প্রাণী। এই প্রাণিকুলের ক্ষেত্রে শ্রেণিকরণ করতে গেলে যেসব প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই তাদেরকে অমেরুদণ্ডী শ্রেণিতে বিভক্ত করতে হবে। আবার, যেসব প্রাণী উড়তে পারে তাদেরকে পতঙ্গ শ্রেণিতে, যারা জলে বাস করে তাদেরকে জলজ শ্রেণিতে, যারা স্থলে বাস করে তাদেরকে স্থলজ শ্রেণিতে, যারা জলে ও স্থলে উভয় স্থানে থাকতে পারে তাদেরকে উভচর শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। ঠিক তেমনি উদ্ভিদজগতের মধ্য থেকে যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় তাদেরকে সপুষ্পক শ্রেণিতে এবং যেসব উদ্ভিদের ফুল হয় না তাদেরকে অপুষ্পক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

শ্রেণিকরণের প্রকৃতি (Nature of Classification)

আমরা আগেই জেনেছি যে, প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা বিভিন্ন ধরনের বস্তু বা ঘটনাবলিকে সন্নিবেশিত করে এগুলো সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে অনুমানের সহায়ক প্রক্রিয়া হিসেবে শ্রেণিকরণের উদ্ভব হয়েছে। জানার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম বা সূত্র মেনে না চললে এসব এলোমেলো ঘটনাবলিকে তাৎক্ষনিকভাবে সনাক্ত করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি শ্রেণিকরণের পেছনে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্য যেমন জ্ঞান লাভের জন্য হতে পারে আবার তা কোনো ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যও হতে পারে।

একজন বিজ্ঞানী বা গবেষকের শ্রেণিকরণের মধ্যে সাধারণ ও বিশেষ এ দুই ধরণের উদ্দেশ্য থাকে। বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যই হলো সাধারণ উদ্দেশ্য যার সাহায্যে একজন বিজ্ঞানী বা গবেষক শ্রেণিকরণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করেন। যেমন-একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী উদ্ভিদের স্বরূপ ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে উদ্ভিদকে বিভিন্ন প্রজাতিতে শ্রেণিভুক্ত করেন। উদ্ভিদ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করার জন্যই তিনি উদ্ভিদ জগতকে সপুষ্পক, অপুষ্পক, বীরুৎ, গুল্ম, একবর্ষজীবী, বহুবর্ষজীবী প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত করে থাকেন।

আবার তেমনিভাবে একজন প্রাণিবিজ্ঞানী প্রাণীর প্রকৃতিগত ও আচরণের দিক লক্ষ্য করে প্রাণিজগতকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করে থাকেন। যেমন— জলজ প্রাণী, জেলি ফিস, অ্যামিবা, ফিতা কৃমি, গোলকৃমি, কেঁচো, চিংড়ি, তারা মাছ, ঝিনুক প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। অর্থাৎ শ্রেণিকরণের বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান অর্জন করা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য হলো ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণ করা। ব্যবহারিক প্রয়োজন আবার ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত এ দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন— একজন লাইব্রেরিয়ান বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লাইব্রেরিতে বইগুলোকে বইয়ের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে থাকেন। এর ফলে লাইব্রেরিয়ানের যেমন বই বিতরণ করতে সুবিধা হয় তেমনি পাঠকদেরও বই অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না।

অবশ্য এ ধরনের শ্রেণিকরণ সকল স্তরের মানুষের চাহিদা পূরণ করে না। অর্থাৎ, ব্যক্তি বা সমষ্টিগত মানুষের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে এ ধরনের শ্রেণিকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তাই বলা যায়, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞান অর্জন কিম্বা ব্যবহারিক প্রয়োজনে কোনো বিষয় বা ঘটনাবলিকে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে যৌক্তিকভাবে একত্রে বিন্যাস করার মানসিক সংযোজনকে শ্রেণিকরণ বলে। শ্রেণিকরণ সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে এর কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে এগুলো তুলে ধরা হলো:

১। **বিন্যাসকরণ প্রক্রিয়া:** প্রকৃতির মাঝে বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলি বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকে। বিশেষ কোনো বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান বরাদ্দ থাকে না। তবে এসব এলোমেলো ঘটনার মধ্যেও শৃঙ্খলা রয়েছে। তাই শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে এসব বিষয় বা ঘটনাবলিকে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে একত্রিত করে বিন্যাস করা হয়। এ কারণে শ্রেণিকরণকে একটি বিন্যাসকরণ প্রক্রিয়া বলা হয়। যেমন— প্রাণিজগতের মধ্যে মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী একত্রে থাকলেও শ্রেণিকরণের মাধ্যমে মেরুদণ্ডী প্রাণী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণিকে পৃথকভাবে বিন্যস্ত করা হয়।

২। **ব্যাখ্যাকরণ প্রক্রিয়া :** পূর্বের অধ্যায়ে আমরা জেনেছি যে, ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সংযুক্তিকরণ ও অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক। কোনো একটি নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্যাপক নিয়মের অধীনে এনে ব্যাখ্যা করতে হয়। শ্রেণিকরণেও তেমনি কতগুলো বিচ্ছিন্ন বস্তু বা ঘটনাকে একটি শ্রেণির অর্ন্তভূক্ত করা হয় এবং নিম্নতর শ্রেণিকে উচ্চতর শ্রেণির মধ্যে বিন্যস্ত করা হয়। অর্থাৎ শ্রেণিকরণেও সংযুক্তিকরণ ও অর্ন্তভুক্তি আবশ্যক। তাই বলা যায়, শ্রেণিকরণও এক প্রকারের ব্যাখ্যাকরণ।

৩। **উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া:** বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কখনোই বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলির শ্রেণিকরণ করা হয় না। তবে শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে সবসময়ই উদ্দেশ্য একরকম থাকে না। যেমন— জ্ঞানচর্চা বা গবেষণার জন্য সাধারণ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী প্রকৃতির বিভিন্ন উদ্ভিদকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে থাকেন। আবার ব্যবহারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য একজন লাইব্রেরিয়ান তাঁর লাইব্রেরির সমস্ত বই নানাভাবে শ্রেণিবিন্যাস করে থাকেন। অর্থাৎ শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকে।

৪। **সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক প্রক্রিয়া:** সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যই হচ্ছে শ্রেণিকরণের মূল ভিত্তি। শ্রেণিকরণের সময় যেসব বস্তু ও ঘটনাবলির মধ্যে সাদৃশ্য থাকে তাদেরকে একটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়। আবার যেসব বস্তু বা ঘটনাবলির মধ্যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তাদেরকে আলাদা শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন— পায়ের সংখ্যার সাদৃশ্যের ভিত্তিতে আমরা প্রাণিজগতকে দ্বিপদী (মানুষ, পাখি), চতুস্পদী (বিড়াল, কুকুর), বহুপদী (তেলাপোকা, মাকড়সা) শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে থাকি।

৫। **মানসিক প্রক্রিয়া :** শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে বস্তুসমূহকে লোকচক্ষুর সামনে সশরীরে একত্রীকরণ করা হয় না। একটি চিড়িয়াখানায় পশু পাখিকে কিম্বা একটি বুকশেলফ এ বইগুলিকে যেভাবে সাজিয়ে রাখা হয় শ্রেণিকরণে ঠিক তেমনটি করা হয় না। এক্ষেত্রে বিষয়সমূহ বা ঘটনাবলিকে কাল্পনিকভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। প্রত্যেকটি বস্তু, বিষয় বা ঘটনা প্রকৃতির মাঝে স্ব স্ব অবস্থানে একে অপরের সাথে মিলে-মিশে থাকে। আমরা এগুলোকে মনে মনে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে থাকি। এজন্য যেসব বস্তু আমরা কখনো দেখিনি সেগুলোকেও শ্রেণিকরণ করা যায়। তাই মানসিক প্রক্রিয়া হলো শ্রেণিকরণের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

৬। **নিয়মের প্রক্রিয়া:** বিশৃঙ্খলভাবে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া সংগতিহীন চিন্তা থেকে শ্রেণিকরণ হয় না। শ্রেণিকরণ নির্দিষ্ট কতগুলো নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। সাধারণত তিনটি নিয়মের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে।

৭। **জাগতিক বিষয় সম্পর্কিত :** অতিপ্রাকৃত কিম্বা অলৌকিক কোনো বস্তু বা ঘটনাবলির শ্রেণিকরণ করা হয় না। প্রকৃতিতে বিদ্যমান জাগতিক কোনো বিষয় বা ঘটনারই কেবল শ্রেণিকরণ হয়ে থাকে।

৮। **যৌক্তিক বিভাগের সাথে সম্পর্কিত:** যৌক্তিক বিভাগের ক্ষেত্রে গুণের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে একটি বৃহত্তর শ্রেণিকে তার অন্তর্গত ক্ষুদ্রতর শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তেমনি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতর শ্রেণিকে বৃহত্তর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন- মৌলিক কিছু সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীকে প্রাণী জাতির মধ্যে শ্রেণিকরণ করা যায়। যৌক্তিক বিভাগ ও শ্রেণিকরণ উভয় প্রক্রিয়াতেই মানসিক বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৯। **যৌক্তিক সংজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত:** কোনো বিষয়ের মৌলিক ও আবশ্যিক গুণকে যৌক্তিক সংজ্ঞায় প্রকাশ করা হয়। যেমন— মানুষের যৌক্তিক সংজ্ঞায় বলা হয় যে, মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও জীববৃত্তি এ দুটি গুণ রয়েছে। ঠিক তেমনি শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রেও বস্তুসমূহের সঠিক গুণ অনুসরণ করা হয়। যেমন— উদ্ভিদ জগতে ফুলের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে সপুষ্পক ও অপুষ্পক উদ্ভিদে শ্রেণিকরণ করা হয়। এজন্য শ্রেণিকরণ ও যৌক্তিক সংজ্ঞা ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ।

শ্রেণিকরণের নিয়মাবলি
(Rules of Classification)

প্রকৃতিতে বিরাজমান বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলিকে সঠিকভাবে শ্রেণিকরণ করার জন্য কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। যুক্তিবিদ বেইন (Bain) তাঁর Logic-Induction গ্রন্থে শ্রেণিকরণের কিছু নিয়ম বা শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এই নিয়মগুলো শুধু প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নিয়মগুলো হলো—

১। যে সকল বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একই প্রকার গুণাবলি উপস্থিত সেগুলোকে একই শ্রেণিভূক্ত করা

উক্ত নিয়ম মেনে চললে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ সঠিক হয়। এ নিয়ম অনুসারে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকে শ্রেণিকরণের সময় বস্তুগুলোর মধ্যকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সাদৃশ্যের বিষয়গুলোকে অনুসরণ করতে হবে। যুক্তিবিদ বেইন এই নিয়মটিকে শ্রেণিকরণের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ম বলে অভিহিত করেছেন।

২। শ্রেণিসমূহকে তাদের সাদৃশ্যের মাত্রা অনুসারে বিন্যস্ত করা

উক্ত নিয়মটি ক্রমিক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বস্তু বা ঘটনাবলিকে তাদের অন্তর্গত গুণের মাত্রার ক্রম অনুসারে সাজানো হয়। যেমন— 'প্রাণ' গুণটির উপস্থিতির মাত্রাগত সাদৃশ্যের ক্রম অনুসারে শ্রেণিকরণ হবে প্রথমে মানুষ, তারপর ইতর প্রাণী এবং সবশেষে উদ্ভিদ।

৩। উচ্চতম শ্রেণিতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণিকরণকে উর্ধ্বমুখে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া

উক্ত নিয়মানুসারে নিম্নতর শ্রেণিকে উচ্চতর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এভাবে কোনো উচ্চতম শ্রেণিতে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়া চলমান অবস্থায় থাকে। এ প্রক্রিয়ায় যেসব সমব্যাপক শ্রেণির মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য থাকে সেগুলোকে পাশাপাশি স্থাপন করে একটি বড় শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত করা হয়। এ বড় শ্রেণিটিকে আবার অন্যান্য অনুরূপ সমব্যাপক বড় শ্রেণির সাথে একত্রিত করে অপেক্ষাকৃত আরো বড় একটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : শ্রেণিকরণের প্রকৃতি সম্পর্কিত একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বজগতের বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনাবলিকে বিশেষ কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে সাজানোর মানসিক প্রক্রিয়াই হলো শ্রেণিকরণ। শ্রেণিকরণের মাধ্যমে কোনো বস্তু বা ঘটনাবলির স্বরূপ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। শ্রেণিকরণের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো— এটি একটি বিন্যাসকরণ প্রক্রিয়া, এটি একটি ব্যাখ্যাকরণ প্রক্রিয়া, এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া, এটি একটি সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক প্রক্রিয়া এবং এটি একটি মানসিক প্রক্রিয়া। যুক্তিবিদ বেইন শ্রেণিকরণের কিছু নিয়ম বা শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। "কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলিকে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে একত্রে সন্নিবেশিত করার মানসিক প্রক্রিয়াকে শ্রেণিকরণ বলে।"— শ্রেণিকরণের এ সংজ্ঞাটি কে প্রদান করেছেন?

(ক) যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড (খ) যুক্তিবিদ জে. এস. মিল
(গ) যুক্তিবিদ যোসেফ (ঘ) যুক্তিবিদ বেইন

২। যুক্তিবিদ বেইন শ্রেণিকরণের কয়টি নিয়মের কথা বলেছেন?
(ক) ২ টি (খ) ৩ টি
(গ) ৪ টি (ঘ) ৫ টি

৩। শ্রেণিকরণ হলো একটি—
(i) মানসিক প্রক্রিয়া (ii) ব্যখ্যাকরণ প্রক্রিয়া
(iii) উদ্দেশ্যমূলক প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.২ শ্রেণিকরণের ভিত্তি (Ground of Classification)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শ্রেণিকরণের ভিত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শ্রেণিকরণের ভিত্তি সম্পর্কে যুক্তিবিদগণের মতামত জানতে পারবেন।

শ্রেণিকরণের ভিত্তি (Ground of Classification)

শ্রেণিকরণের প্রকৃতি আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলির মধ্যকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেই শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষককে আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হয় এবং চিন্তা করতে হয় বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলিকে কিভাবে কোন্ মানদণ্ডের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করবে।

শ্রেণিকরণের ভিত্তি নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিছু যুক্তিবিদ মনে করেন শ্রেণিকরণ প্রতীক বা লক্ষণ নির্ভর, আবার কিছু যুক্তিবিদ মনে করেন শ্রেণিকরণ সংজ্ঞানির্ভর। যেমন— যুক্তিবিদ হুইওয়েল এর মতে শ্রেণিকরণের ভিত্তি প্রতীকনির্ভর, সংজ্ঞা নির্ভর নয়। তিনি বলেন যে, শ্রেণিকরণে প্রথমে নমুনা গ্রহণ করা হয় তারপরে নমুনাকে কেন্দ্র করে সাদৃশ্যমূলক বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলিকে একই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়। নমুনা হলো এ ধরনের প্রতীক। অর্থাৎ, প্রতীক হলো কোনো শ্রেণির এমন একটা গুণ যাকে কেন্দ্র করে ঠিক তারই অনুরূপ অন্যসব বস্তুসমূহকে একটা বিশেষ শ্রেণিভুক্ত করা হয়। যেমন— পাখি জগতের শ্রেণিকরণ করার সময় উড়তে পারে এমন পাখি দোয়েলকে নমুনা বা প্রতীক হিসেবে নিয়ে এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ চড়ুই, বুলবুলি, ময়না, টিয়া, শালিক, ঘুঘু প্রভৃতিকে একটা শ্রেণিভুক্ত করা হয়।

অপরদিকে যুক্তিবিদ জে.এস.মিল মনে করেন যে, শ্রেণিকরণ সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল, এটি প্রতীকভিত্তিক কোনো বিষয় নয়। শ্রেণিকরণের সময় কোনো বস্তু বা ঘটনার মৌলিক ও অপরিহার্য গুণ প্রকাশ করা হয়। সংজ্ঞা শ্রেণিকরণের মৌলিক ও সাধারণ গুণসমূহকে নির্দেশ করে। একটি বস্তু বা ঘটনা কোন্ শ্রেণিভুক্ত হবে তা নির্ভর করে ঐ বস্তু বা ঘটনার প্রয়োজনীয় ও মৌলিক গুণের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর। মিলের মতে, প্রতীকের সাহায্যে কখনও সঠিকভাবে শ্রেণিকরণ করা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণিতেই কিছু ভিন্ন ধরণের গুণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণে যেসব মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য বিবেচনা করা হয় সেগুলো বস্তুর অনিবার্য গুণ। যুক্তিবিদ মিল আরো বলেন যে, প্রতীক বা নুমনা একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত কোনো শ্রেণির সংকেত দিতে পারে। তবে সেই সংকেত শ্রেণিকরণের যাচাই চূড়ান্তভাবে গ্রহণযোগ্য হবে কি না তা যাচাই করা হয় সংজ্ঞার মাধ্যমে। এজন্য সংজ্ঞাই হলো শ্রেণিকরণের আসল ভিত্তি।

শ্রেণিকরণের ভিত্তি সম্পর্কিত উভয় যুক্তিবিদের বক্তব্যেরই কমবেশি গুরুত্ব রয়েছে। হুইওয়েল শ্রেণিকরণের ভিত্তি হিসেবে বাহ্যিক সাদৃশ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর মতে, প্রথমে একটা প্রতীক নির্ধারণ করে এরপর ঐ প্রতীকের সাথে আকৃতিগত সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়সমূহকে একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই হুইওয়েলের প্রতীকনির্ভর শ্রেণিকরণকে কৃত্রিম শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বলা যায়।

অপরদিকে যুক্তিবিদ মিল শ্রেণিকরণের জন্য বস্তুর মৌলিক, সাধারণ ও আবশ্যকীয় গুণকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর মতে শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে সংজ্ঞায়নের দরকার। তাই মিলের সংজ্ঞানির্ভর শ্রেণিকরণকে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য বলা যায়। সবশেষে যুক্তিবিদ মিলের মতামতকে বেশি সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে মেনে নিয়ে বলা যায় যে, প্রতীকের সাহায্যে শ্রেণিকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র, আর সংজ্ঞার সাহায্যে পাওয়া যায় শ্রেণিকরণের নিশ্চয়তা।

শিক্ষার্থীর কাজ : শ্রেণিকরণের ভিত্তি সম্পর্কে ১০টি বাক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

শ্রেণিকরণের ভিত্তি নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কিছু যুক্তিবিদ মনে করেন শ্রেণিকরণ প্রতীক বা লক্ষণ নির্ভর, আবার কিছু যুক্তিবিদ মনে করেন শ্রেণিকরণ সংজ্ঞানির্ভর। যুক্তিবিদ হুইওয়েল এর মতে শ্রেণিকরণের ভিত্তি প্রতীকনির্ভর, সংজ্ঞা নির্ভর নয়। অপরদিকে যুক্তিবিদ জে.এস.মিল মনে করেন যে, শ্রেণিকরণ সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল, এটি প্রতীকভিত্তিক কোনো বিষয় নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদ হুইওয়েলের মতে শ্রেণিকরণ হলো—

(ক) প্রতীক নির্ভর (খ) সংজ্ঞা নির্ভর
(গ) প্রতীক নির্ভর ও সংজ্ঞা নির্ভর উভয়ই (ঘ) কোনোটিই নয়

২। "শ্রেণিকরণ হলো সংজ্ঞা নির্ভর"— এটি কার মত?

(ক) যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড-এর (খ) যুক্তিবিদ জে. এস. মিল-এর
(গ) যুক্তিবিদ যোসেফ-এর (ঘ) যুক্তিবিদ বেইন-এর

৩। যুক্তিবিদ জে. এস. মিল শ্রেণিকরণের জন্য বস্তুর যে গুণগুলো বেছে নিয়েছেন সেগুলো হলো—

(i) মৌলিক (ii) অনাবশ্যকীয়
(iii) সাধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৩ শ্রেণিকরণের প্রকারভেদ (Kinds of Classification)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ক্রমিক শ্রেণিকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

শ্রেণিকরণের সংজ্ঞার আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি যে, শ্রেণিকরণ হলো কোনো বিষয় বা ঘটনাবলির মাঝে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ভিত্তিতে এদেরকে একত্রে সন্নিবেশিত করার মানসিক প্রক্রিয়া। শ্রেণিকরণে সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষ বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যের সূত্র ধরে শ্রেণিকরণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা।

(ক) প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ (Natural Classification)
এবং
(খ) কৃত্রিম শ্রেণিকরণ (Artificial Classification)

শ্রেণিকরণের প্রকারভেদ নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো—

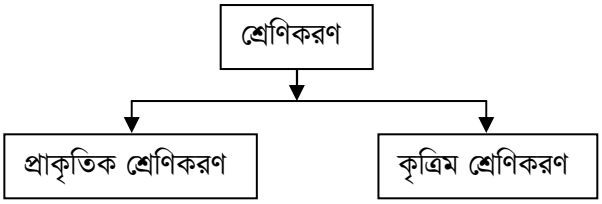

(ক) প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ (Natural Classification)

যে শ্রেণিকরণে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বস্তুসমূহকে মৌলিক ও অপরিহার্য সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মানসিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় তাকে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ বলে। এ ধরণের শ্রেণিকরণে বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে অর্থাৎ, বস্তুসমূহের সাধারণ জ্ঞানলাভের জন্য সেগুলোর মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য দেখে শ্রেণিভুক্ত করা হয় বলে একে বৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণও বলা হয়। এই শ্রেণিকরণকে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ বলা হয় কারণ যেসব সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের শ্রেণিকরণ করা হয় সেগুলো মূলত প্রকৃতি প্রদত্ত। বস্তুসমূহের মধ্যকার মৌলিক ও অপরিহার্য গুণ মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয় বা এতে মানুষের কোনো হাত নেই। যেমন— একটি মৌলিক ও অপরিহার্য গুণ 'বুদ্ধিবৃত্তি' কে ভিত্তি করে আমরা যখন মানব শ্রেণিকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে ফেলি তখন এই প্রক্রিয়াটি হবে প্রাকৃতিক বা বৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণ। আবার জরায়ুজ শ্রেণি এবং ডিম্বজ শ্রেণির ক্ষেত্রে যখন মাতৃদেহের জরায়ুর ভেতরে বেড়ে ওঠা বাচ্চাদেরকে ডিম ফোটানো বাচ্চাদের থেকে আলাদা করে শ্রেণিকরণ করা হয় তখন সেটিও হবে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ। কেননা, এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণকে আবার সাধারণ শ্রেণিকরণও বলা হয়। কারণ সাধারণ জ্ঞান অর্জনের জন্য আমরা প্রকৃতিতে বিরাজমান বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনাবলিকে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে মানসিকভাবে বিন্যস্ত করে থাকি। এই শ্রেণিকরণকে আবার তত্ত্বগত শ্রেণিকরণও বলা হয়। তত্ত্বগত জ্ঞানকে সুসংঘবদ্ধ করা প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের কাজ। মানুষ ইচ্ছেমতো মনগড়াভাবে এ ধরনের শ্রেণিকরণ করতে

পারে না। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ হলো বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিভিত্তিক। নিম্নে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ সম্পর্কিত একটি ছক উল্লেখ করা হলো—

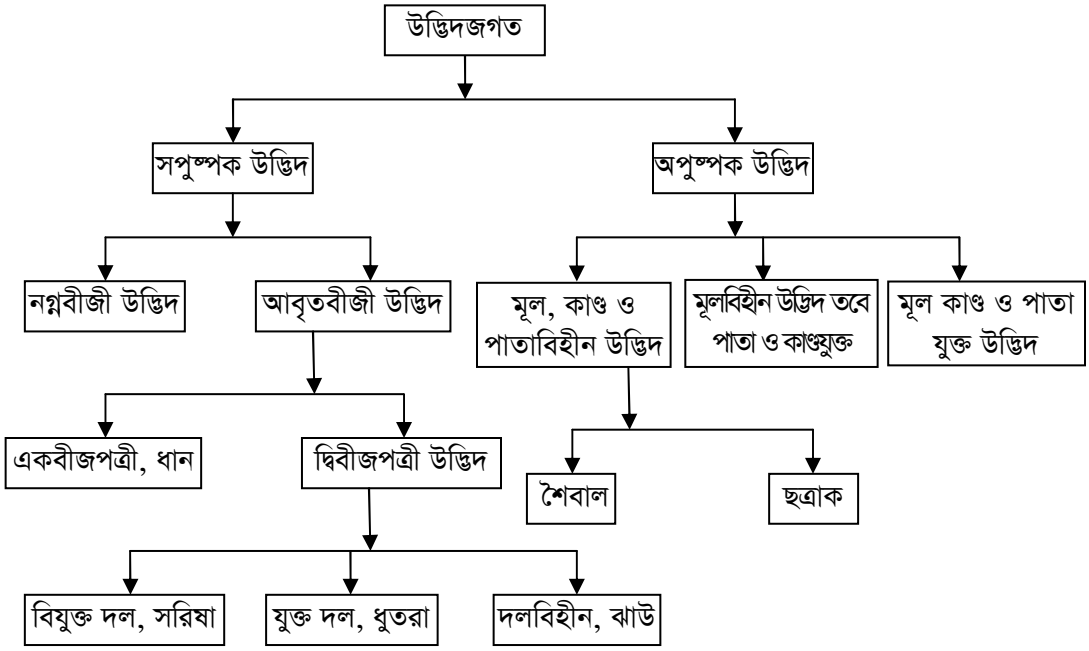

উপরের ছক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে মৌলিক ও অপরিহার্য সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে উদ্ভিদ জগতের শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। প্রকৃতিতে বিরাজমান কোনো কিছু যদি উদ্ভিদ হয়ে থাকে তবে সেটি হয় সবীজ পুষ্পক উদ্ভিদ অথবা বীজহীন অপুষ্পক উদ্ভিদ হবে। যেসব উদ্ভিদে ফুলের উপস্থিতি রয়েছে সেগুলোকে সপুষ্পক আর যেগুলোতে ফুলের অনুপস্থিতি রয়েছে সেগুলোকে অপুষ্পক উদ্ভিদে শ্রেণিকরণ করা হয়। এভাবে বীজের উপস্থিতির ভিত্তিতে সপুষ্পক উদ্ভিদ নগ্নবীজী ও আবৃতবীজী, বীজপত্রের সংজ্ঞার ভিত্তিতে একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী এবং দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ দলের ভিত্তিতে বিযুক্ত দল, যুক্তদল ও দলবিহীন শ্রেণিতে বিন্যাস করা হয়ে থাকে। আবার অপুষ্পক উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড ও পাতার ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয় এবং এগুলোর অনুপস্থিতির ভিত্তিতে শৈবাল ও ছত্রাক নামে শ্রেণিকরণ করা হয়।

যুক্তিবিদ মিল মনে করেন যে, প্রকৃতিতে অবস্থানরত বিভিন্ন শ্রেণির বস্তুর মধ্যে যেমন মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি এক শ্রেণির সাথে অন্য শ্রেণির অনেক বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে থাকা এই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিকে যুক্তিবিদ মিল প্রাকৃতিক জাতি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন- কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল, আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি একেকটি প্রাকৃতিক জাতি। এদের প্রত্যেকটি শ্রেণিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং অন্যান্য শ্রেণি থেকে আলাদা। এসব বৈশিষ্ট্যগুলো মানবসৃষ্ট নয় বরং প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত বলে সময়ের পরিবর্তনেও এরা একই রকম থাকে। যুক্তিবিদ মিল প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণকে প্রাকৃতিক জাতির সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন।

যুক্তিবিদ মিলের উক্ত যুক্তির সমালোচনা করে অবশ্য একথা বলা যায় যে, প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ প্রাকৃতিক জাতি থেকে আলাদা। যেমন— মেরুদণ্ডের উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ করলে এর মধ্যে প্রাকৃতিক জাতিতে বিভক্ত করা বিভিন্ন শ্রেণির কুকুর বিড়াল, গরু, ছাগলসহ আরো অনেক কিছুই 'মেরুদণ্ডী প্রাণী' -এই একটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে।

(খ) কৃত্রিম শ্রেণিকরণ
(Artificial Classification)

যে শ্রেণিকরণে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুরুত্বহীন ও বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় তাকে কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বলে। এ ধরনের শ্রেণিকরণে মৌলিক সাদৃশ্যের বিষয়গুলো উপেক্ষা করে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা বা সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়া হয় বলে একে বিশেষ শ্রেণিকরণ বা অবৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণও বলা হয়ে

থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানোর সুবিধার্থে একজন গ্রন্থাগারিক তাঁর গ্রন্থাগারে বইয়ের প্রথম অক্ষর অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে বইগুলোর বিষয়বস্তুকে বিবেচনায় না নিয়ে কিভাবে খুব সহজে বইগুলোকে খুঁজে বের করা যায় সেদিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। ঠিক একইভাবে ঔষধের ফার্মেসীতে ঔষধ বিক্রেতাগণ নানা ধরনের শত শত ঔষধের মধ্য থেকে খুব সহজে প্রয়োজনীয় ঔষধটি খুঁজে বের করার জন্য নিজেদের সুবিধামতো ঔষধগুলির কৃত্রিম শ্রেণিকরণ করে থাকেন।

ক্রমিক শ্রেণিকরণ
(Classification by Series)

আমরা এতোক্ষণ শ্রেণিকরণ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের বিষয়ে জানতে পেরেছি। উল্লেখ্য যে, এই দুই প্রকারের শ্রেণিকরণ ছাড়াও আরো এক প্রকারের শ্রেণিকরণ আছে, সেটি হলো ক্রমিক শ্রেণিকরণ। সাধারণত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতেই বস্তুসমূহের শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে। সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুসমূহকে এক শ্রেণিতে এবং বৈসাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে, একই গুণ বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। তখন গুণের মাত্রা অনুসারে শ্রেণিগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়। এরূপ শ্রেণিকরণকেই ক্রমিক শ্রেণিকরণ বলা হয়। অর্থাৎ ক্রমিক শ্রেণিকরণ হলো বিশেষ কোনো গুণের উপস্থিতির মাত্রা (আধিক্য এবং স্বল্পতা) অনুসারে কতগুলো শ্রেণিকে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন— 'মানুষ,' 'প্রাণী' এবং 'উদ্ভিদ' এদের সবার জীবন আছে। কিন্তু এই তিন শ্রেণির মধ্যে জীবনের প্রকাশের মাত্রার তারতম্য রয়েছে। মানুষের মধ্যে জীবনের প্রকাশ সবচেয়ে বেশি, প্রাণীর মধ্যে জীবনের প্রকাশ মানুষের চেয়ে কম এবং উদ্ভিদের মধ্যে জীবনের প্রকাশের মাত্রা সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়। কাজেই এখানে জীবনের মাত্রা অনুসারে পর্যায়ক্রমে প্রথমে মানুষ, তারপর প্রাণী এবং সবশেষে উদ্ভিদকে সাজানো হয়। আর এটাই হলো ক্রমিক শ্রেণিকরণ। সহজে বোঝার জন্য বিষয়টিকে ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। যেমন—

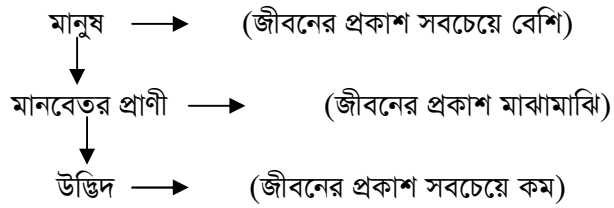

যুক্তিবিদ জে.এস.মিল ক্রমিক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে দুটি নিয়ম পালন করার কথা বলেন। তাহলো—
প্রথমত: বিশেষ কোনো একটি গুণ যেসব শ্রেণির মধ্যে বিভিন্ন মাত্রায় (পরিমানে কম কিম্বা বেশি যাই হোক) উপস্থিত থাকে তাদের সবগুলোকে একটি বৃহত্তর শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

দ্বিতীয়ত: শ্রেণিগুলোকে গুণের মাত্রার তারতম্য অনুসারে ক্রমবিন্যাস করা।
এই ক্রমবিন্যাসের শুরুতে থাকবে যার মধ্যে আলোচ্য গুণটি সর্বাপেক্ষা বেশি এবং ক্রমবিন্যাসের সবশেষে থাকবে যার মধ্যে আলোচ্য গুণটির মাত্রা সবচেয়ে কম উপস্থিত থাকে। অর্থাৎ, যেসব শ্রেণির মধ্যে কোনো একটি বিশেষ গুণ সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত নয়, তবে গুণটি তাদের সবগুলোর মধ্যেই কম বা বেশি মাত্রায় উপস্থিত সেসব শ্রেণির ক্ষেত্রে ক্রমিক শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য হয়।
মৌলিকভাবে বিশ্লেষণ করার প্রেক্ষিতে আমরা প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম এ দু'প্রকারের শ্রেণিকরণ পেয়ে থাকি। আবার সার্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে শ্রেণিকরণের তিনটি প্রকাশ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে শ্রেণিকরণের ছক হবে নিম্নরূপ:

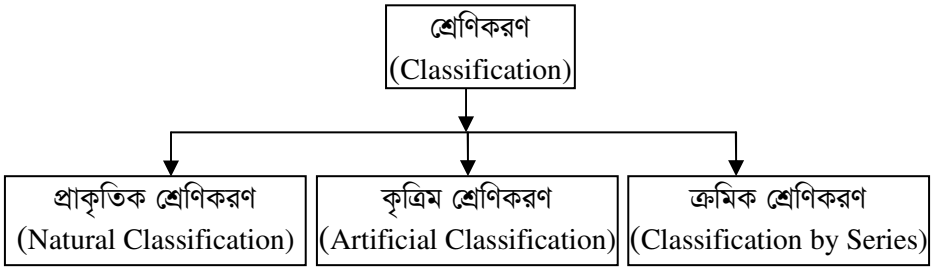

যুক্তিবিদ মিল ক্রমিক শ্রেণিকরণের দু'টি প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।
যথা —

১। কৃত্রিম শ্রেণিকরণ যেমন বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের ভিত্তিতে হয়, ঠিক তেমনি বিশেষ কোনো আরোহাত্মক অনুসন্ধানের জন্য ক্রমিক শ্রেণিকরণের প্রয়োজন হয়। ক্রমিক শ্রেণিকরণের ফলে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করা শ্রেণিগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এবং এদের তুলনামূলক আলোচনা করা যায়।

২। সহ পরিবর্তন পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য ক্রমিক শ্রেণিকরণ অপরিহার্য। কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যুক্তিবিদ মিলের মতে, যেসব কারণে সহ-পরিবর্তন পদ্ধতির প্রয়োজন, সেসব কারণে আবার ক্রমিক শ্রেণিকরণও প্রয়োজন হয়।

এক্ষেত্রে অবশ্য যুক্তিবিদ হুইওয়েল ভিন্ন ধরনের মত পোষণ করেন। তিনি ক্রমিক শ্রেণিকরণের সমালোচনা করে একে 'মন্দ ও অনুদার দর্শন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। হুইওয়েলের মতে ক্রমিক শ্রেণিকরণ কোনো শ্রেণিকরণের পর্যায়ে পড়ে না, এটি 'একদিক মুখী রৈখিক অগ্রগতি' মাত্র। তবে ক্রমিক শ্রেণিকরণ সম্পর্কে যুক্তিবিদ হুইওয়েলের সমালোচনা সত্ত্বেও এর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে সহপরিবর্তন পদ্ধতির সাথে ক্রমিক শ্রেণিকরণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ সম্পর্কিত একটি ছক তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

শ্রেণিকরণে সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক এবং বিশেষ বা ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থাকে। এই উদ্দেশ্যের সূত্র ধরে শ্রেণিকরণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ এবং কৃত্রিম শ্রেণিকরণ। যে শ্রেণিকরণে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বস্তুসমূহকে মৌলিক ও অপরিহার্য সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মানসিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয় তাকে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ বলে। যে শ্রেণিকরণে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুরুত্বহীন ও বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের শ্রেণি বিন্যাস করা হয় তাকে কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বলে। যে শ্রেণিকরণে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুরুত্বহীন ও বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহের শ্রেণি বিন্যাস করা হয় তাকে কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বলে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন হয় যে, একই গুণ বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় উপস্থিত থাকে। তখন গুনের মাত্রা অনুসারে শ্রেণিগুলোকে বিন্যস্ত করা হয়। এরূপ শ্রেণিকরণকেই ক্রমিক শ্রেণিকরণ বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন –৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শ্রেণিকরণকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

২। কৃত্রিম শ্রেণিকরণ হয়-
(ক) ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে (খ) মৌলিক ও অপরিহার্য গুণের ভিত্তিতে
(গ) তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে (ঘ) কোনোটিই নয়

৩। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ হয়-
(i) সাধারণ জ্ঞান অর্জনের লক্ষে (ii) মৌলিক ও অপরিহার্য সাদৃশ্যের ভিত্তিতে
(iii) ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ (Differences between Natural and Artificial Classifications)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যকার পার্থক্যের মতভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণে কোনো সাধারণ জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিলের ভিত্তিতে বস্তুগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। যেমন— জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে আমরা মেরুদণ্ডের উপস্থিতির ভিত্তিতে মানুষ, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীগুলোকে মেরুদণ্ডী প্রাণী' শেণিতে বিন্যস্ত করি। এ ধরনের বিন্যাসকরণকে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ বলে। আবার, কৃত্রিম শ্রেণিকরণের বেলায় কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুরুত্বহীন ও বাইরের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তুগুলোর শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। যেমন— ব্যক্তিগত সুবিধাকে প্রাধান্য দিয়ে একজন গ্রন্থাগারিক ইচ্ছেমতো তাঁর গ্রন্থাগারে বইসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে থাকে। এ ধরনের বিন্যাসকরণকে কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বলে।

নিম্নে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো অপরিহার্য, গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক গুণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর কৃত্রিম শ্রেণিকরণে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো হয়ে থাকে গুরুত্বহীন ও বাইরের গুণের ভিত্তিতে। যেমন— প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ দ্বারা বাদুড়কে পাখি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত না করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর মৌলিক গুণের সাথে বাদুড়ের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কৃত্রিম শ্রেণিকরণের বেলায় পাখি ও বাদুড়ের মধ্যে বাহ্যিক মিল দেখে বাদুড়কে পাখি মনে করা হয়।

২। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলো প্রকৃতির মাঝেই বিরাজ করে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষের কোনো হাত নেই। অপরপক্ষে, কৃত্রিম শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলো ব্যক্তি মানুষের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মের দিকে নজর দেয়া হয় না।

৩। সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ করা হয়। আর কৃত্রিম শ্রেণিকরণ করা হয় বিশেষ বা ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের জন্য। যেমন—একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে বাগানে গাছ লাগান প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের নিয়ম অনুসারে। আর একজন মালি বাগানে গাছ লাগায় একান্তই তার নিজের সুবিধা অনুসারে। অর্থাৎ এই প্রক্রিয়াটি হলো কৃত্রিম শ্রেণিকরণ।

৪। সার্বজনীন উদ্দেশ্য সাধন করাই প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের মূল লক্ষ্য। আর কৃত্রিম শ্রেণিকরণে ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধন করা হয়।

৫। বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকায় প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ স্থান, কাল-পাত্র ভেদে একই রকম হয়। কিন্তু কৃত্রিম শ্রেণিকরণে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য নিহিত থাকে বিধায় স্থান-কাল পাত্রভেদে এটি ভিন্ন রকমের হয়।

৬। সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ করা হয় বলে একে বৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণও বলা হয়। অন্যদিকে কৃত্রিম শ্রেণিকরণে ব্যক্তি মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে বিধায় একে অবৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণ বলে।

৭। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণে বিষয় বা বস্তুসমূহকে ক্রমানুসারে শ্রেণিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কৃত্রিম শ্রেণিকরণে বিষয় বা বস্তুসমূহকে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকে না।

৮। প্রাকৃত্রিক শ্রেণিকরণে বিষয় বা বস্তুসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয় বলে আমাদেরকে সংজ্ঞার উপর নির্ভর করতে হয়। তাই এরূপ শ্রেণিকরণ হলো সংজ্ঞাভিত্তিক। পক্ষান্তরে, কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বাহ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে করা হয়। অনেক সময় একটা নমুনা নির্বাচন করে এর সাথে মিল রেখে বস্ত সমূহকে বিন্যস্ত করা হয়। কাজেই, কৃত্রিম শ্রেণিকরণ হলো নমুনাভিত্তিক, সংজ্ঞাভিত্তিক নয়।

৯। বস্তুসমূহের মৌলিক ও অপরিহার্য সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ করা হয় বলে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা বা সুবিধা অনুসারে কৃত্রিম শ্রেণিকরণ করা হয় বিধায় এটি অতি সহজ প্রক্রিয়া।

১০। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে সার্বিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকার কারণে এই শ্রেণিকরণ সকলে সমানভাবে ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা সকল পর্যায়ের জনগণই উপকৃত হয়। আর কৃত্রিম শ্রেণিকরণে ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্য সাধন করার ফলে ব্যক্তি ভেদে এর ব্যবহার ভিন্ন হয় এবং এর দ্বারা শুধু ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গই উপকৃত হয়।

১১। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ বিজ্ঞানসম্মত বলে এর সাহায্যে জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে। কিন্তু কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে এর সাহায্যে জ্ঞানের প্রসার ঘটে না।

১২। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ শ্রেণিকরণ বলা হয়। আর কৃত্রিম শ্রেণিকরণ হলো ব্যক্তিনির্ভর শ্রেণিকরণ।

১৩। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

১৪। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু কৃত্রিম শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন অনুসরণ করার বাধ্যবাধকতা নেই।

১৫। তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জনের পর তা সুসংঘবদ্ধ করা প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের কাজ। এজন্য একে তাত্ত্বিক শ্রেণিকরণ বলা হয়। অপরদিকে প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক সুবিধাকে প্রাধান্য দেয়া কৃত্রিম শ্রেণিকরণের কাজ বিধায় একে ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক শ্রেণিকরণ বলা হয়।

প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যকার উপর্যুক্ত পার্থক্যসমূহ বর্ণনা থেকে বলা যায় যে, এ দুটি শ্রেণিকরণ সাদৃশ্যগত, উদ্দেশ্যগত, বিষয়বস্তুগত, যৌক্তিক বিভাগ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাগত, সংজ্ঞাগত, নমুনাগত, প্রায়োগিকগত, পদ্ধতিগত, তত্ত্বগত, প্রকৃতিগত, প্রভৃতি বিষয়ের দিক থেকে আলাদা।

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের পার্থক্য নিয়ে মতভেদঃ

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুক্তিবিদ বেন, জেভন্স সহ আরো অনেকেই মনে করেন যে, এই দুই ধরনের শ্রেণিকরণের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তাঁদের মতে, এক অর্থে সকল শ্রেণিকরণকে প্রাকৃতিক বলা যায়। আবার, অন্য অর্থে সকল শ্রেণিকরণকেই কৃত্রিম বলা যায়।

প্রথম যুক্তিঃ সকল শ্রেণিকরণই প্রাকৃতিক

সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের বিষয়সমূহ মৌলিক না হয়ে অবান্তর ও মূল্যহীন হলেও সেগুলো প্রকৃতির বস্তুগুলোর মধ্যেই থাকে। আমরা যখন গ্রন্থাগারের বইগুলোকে প্রথম অক্ষরের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করি তখন এই বাহ্যিক সাদৃশ্যগুলো বইগুলোর মধ্যেই থাকে। বইয়ের বিন্যাসকরণের সময় এই বাহ্যিক সাদৃশ্য ব্যক্তি নিজে সৃষ্টি করে না। এ অর্থে বিন্যাসকরণের উক্ত ভিত্তিকে প্রাকৃতিক বলা চলে। সুতরাং এ দিক থেকে সকল কৃত্রিম শ্রেণিকরণকেই প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণও বলা যায়।

দ্বিতীয় যুক্তি: সকল শ্রেণিকরণই কৃত্রিম

সব ধরনের শ্রেণিকরণই ব্যক্তির মানসিক অবস্থা দ্বারা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। মানুষ নিজেই বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলিকে মানসিকভাবে একত্রীকরণ করে বিন্যাস করে থাকে। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ঘটনা ভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয় না। বস্তুসমূহের মধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো আমরা নিজেরাই আবিষ্কার করি এবং সে অনুসারে বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করি। একজন বিজ্ঞানী যখন প্রাণীকূলকে মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী এ দু শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেন তখন তিনি তার নিজের প্রয়োজনেই সাদৃশ্যের ভিত্তিটি স্থির করেন। সুতরাং ,এ অর্থে সকল প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণকেই কৃত্রিম শ্রেণিকরণ বলা যেতে পারে।

প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের পার্থক্য অস্বীকার করে এসব যুক্তিবিদগণ বলেন যে, এই দুই ধরনের শ্রেণিকরণের মধ্যে কোনো বিভেদ রেখা টানা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এরা উভয়েই এক জাতীয়। এদের মধ্যে মূলত উদ্দেশ্যগত পার্থক্য রয়েছে। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণের উদ্দেশ্য হলো শ্রেণিবিন্যস্ত বস্তুগুলো সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা এবং কৃত্রিম শ্রেণিকরণের উদ্দেশ্য হলো আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা। কাজেই প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই বরং উভয় শ্রেণিকরণই একই প্রকৃতির ও একই জগতের । এ অর্থে শ্রেণিকরণ কেবল প্রাকৃতিক নয় বা কেবল কৃত্রিম নয় বরং শ্রেণিকরণ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উভয়ই।

শিক্ষার্থীর কাজ : প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যকার পার্থক্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলোর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো- প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো অপরিহার্য, গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক গুণের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর কৃত্রিম শ্রেণিকরণে সাদৃশ্যের বিষয়গুলো হয়ে থাকে গুরুত্বহীন ও বাইরের গুণের ভিত্তিতে। প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম শ্রেণিকরণের মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুক্তিবিদ বেন, জেভন্স সহ আরো অনেকেই মনে করেন যে, এই দুই ধরনের শ্রেণিকরণের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। তাঁদের মতে, এক অর্থে সকল শ্রেণিকরণকে প্রাকৃতিক বলা যায়। আবার, অন্য অর্থে সকল শ্রেণিকরণকেই কৃত্রিম বলা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। কৃত্রিম শ্রেণিকরণ হলো—
(ক) সর্বজনীন শ্রেণিকরণ (খ) বৈজ্ঞানিক শ্রেণিকরণ
(গ) বিশেষ শ্রেণিকরণ (ঘ) ব্যক্তিগত শ্রেণিকরণ

২। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণে-
(ক) নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপকৃত হয় (খ) বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে
(গ) সার্বিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে (ঘ) সবগুলোই সঠিক

৩। প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ করা হয়-
(i) সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য (ii) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের জন্য
(iii) ব্যক্তিগত জ্ঞান লাভের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৫ শ্রেণিকরণের সীমাবদ্ধতা ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ (Limitations and Necessities of Classification)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- শ্রেণিকরণের সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শ্রেণিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

শ্রেণিকরণের সীমাবদ্ধতাসমূহ (Limitations of Classification)

আমরা জানি যে, প্রকৃতিতে বিরাজমান বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনাবলির শ্রেণিকরণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ সসীম জীব। বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্যময় এ বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা ও বস্তুসমূহ সম্পর্কে মানুষের সুষ্ঠু, সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত জ্ঞান থাকে না। শ্রেণিকরণ করার সময় এমন কিছু বিষয় বা বস্তু বা ঘটনা পাওয়া যায় যেগুলোকে শ্রেণিকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। কেননা, এসব বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে মানুষের পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব রয়েছে। যেসব বিষয়ের শ্রেণিকরণ করা সম্ভব হয় না নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো:

১। বৃহত্তম বা পরমতম জাতিকে শ্রেণিকরণ করা যায় না

পরমতম জাতি বলতে সর্বোচ্চ বা উচ্চতম জাতিকে বোঝায়। শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে বিষয় বা ঘটনাবলির মাঝে উপস্থিত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদেরকে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় এবং ক্ষুদ্রতর শ্রেণিকে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু বৃহত্তম বা পরমতম জাতি হলো এমন একটি সর্বোচ্চ শ্রেণি যাকে এর চেয়ে বৃহত্তর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ পরমতম জাতির চেয়ে বৃহত্তর আর কোনো শ্রেণি নেই। যেমন- 'দ্রব্য' একটি পরমতম জাতি। একে অন্য কোনো ব্যাপক জাতির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এ জন্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে শ্রেণিকরণ সম্ভব নয়।

২। প্রান্তস্থিত বস্তুকে শ্রেণিকরণ করা যায় না

যে সকল বস্তু বা ঘটনার মধ্যে কাছাকাছি অন্য বিষয় বা ঘটনার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তাদের বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণিকরণ করা সম্ভব হয় না। এ রকম প্রান্তস্থিত বস্তুর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না। এ ধরণের বস্তুর মধ্যে এক শ্রেণির কিছু গুণ যেমন থাকে তেমনি অন্য শ্রেণির কিছু গুণও বিদ্যমান থাকে। ফলে এদেরকে নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, জেলীর মধ্যে কিছু কঠিন পদার্থ এবং কিছু তরল পদার্থের গুণ বা লক্ষণ রয়েছে। তাই জেলীর মতো প্রান্তস্থিত বস্তুকে নির্ভুলভাবে শ্রেণিকরণ করা সম্ভব নয়।

৩। পরিবর্তনশীল বস্তুর শ্রেণিকরণ করা যায় না

বস্তুসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার সময় এদের মধ্যে বিদ্যমান স্থায়ী ও আবশ্যিক গুণসমূহকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু যেসব বস্তুর গুণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকে এবং সেসব বস্তু অন্যান্য বস্তুর মধ্যে মিশ্রিত হয়ে অবস্থান করে তাদেরকে শ্রেণিকরণ করা যায় না।

৪। সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন বিষয়ের শ্রেণিকরণ করা যায় না

কোনো বিষয় বা ঘটনার শ্রেণিকরণ করতে হলে সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। বস্তুসমূহের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ জানা না থাকলে এদের মধ্যকার সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করা কষ্টকর হয়। তাই যেসব

বিষয়ে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত, যাদের মৌলিক ও অপরিহার্য গুণ আমাদের জানা নেই, সেসব বিষয়ের শ্রেণিকরণ করা সম্ভব হয় না।

৫। যেসব বস্তুর সংজ্ঞা দেয়া যায় না সেসব বস্তুর শ্রেণিকরণও সম্ভব নয়

প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ সংজ্ঞার উপর নির্ভরশীল সংজ্ঞায় কোনো কিছুর মৌলিক ও আবশ্যিক গুণাবলি উল্লেখ করা হয়, যা শ্রেণিকরণের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তাই যেসব বস্তু বা বিষয়ের সংজ্ঞা দেয়া যায় না সেগুলোর শ্রেণিকরণও করা যায় না। কাজেই বলা যায়, সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা হচ্ছে শ্রেণিকরণের সীমাবদ্ধতা।

শ্রেণিকরণের প্রয়োজনীয়তা
(Necessity of Classification)

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এবং জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্রেণিকরণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শ্রেণিকরণের মাধ্যমে জগতের বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনাকে জানা যায় এবং এদেরকে মনে রাখাও সহজ হয়। বিভিন্ন যুক্তিবিদ শ্রেণিকরণের গুরুত্বকে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তার ভিত্তিতে প্রধানত তিন ধরণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা যায়। তা হলো—

প্রথমতঃ শ্রেণিকরণের সাহায্যে প্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়

শ্রেণিকরণ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ ও ঘটনাবলিকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়। শ্রেণিকরণে বস্তুর সাথে বস্তুর, ঘটনার সাথে ঘটনার এবং শ্রেণির সাথে শ্রেণির সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় বলে এদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারি। শ্রেণিকরণ করতে গিয়ে বস্তু বা ঘটনাবলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এদিক থেকে শ্রেণিকরণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই শ্রেণিকরণের মাধ্যমে আমরা বিশ্ব জগত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ শ্রেণিকরণ স্মৃতিশক্তির সহায়ক

প্রকৃতির অসংখ্য বৈচিত্র্যময় বস্তুসমূহ বা ঘটনাবলিকে সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতি ছাড়া স্মৃতিতে সহজে ধরে রাখা যায় না। স্মৃতি শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো বিভিন্ন ধরনের বস্তুর মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য খুঁজে বের করা। প্রকৃতিতে বিরাজমান বস্তুসমূহরে মধ্যে যেমন রয়েছে অজস্র গুণাবলি, তেমনি এদের মধ্যে বহু বিষয়ে সাদৃশ্যও বিদ্যমান থাকে। ফলে সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুসমূহকে একত্রিত করে কোনো শ্রেণিভুক্ত করা হলে তাদেরকে খুব সহজেই মনে রাখা যায়। যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড মনে করেন যে, শ্রেণিকরণের মাধ্যমে আমাদের স্মৃতিশক্তিকে উন্নত করা সম্ভব। এ জন্য বলা যায়, যেহেতু সাদৃশ্য হলো স্মৃতি শক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত তাই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বস্তুসমূহকে শ্রেণিবদ্ধ করে সেগুলোকে খুব সহজেই স্মৃতির মনিকোঠায় ধরে রাখা যায়।

তৃতীয়তঃ শ্রেণিকরণ আরোহ অনুমানের জন্য অপরিহার্য

আরোহ অনুমানে একটা শ্রেণির অন্তর্গত কয়েকটা দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতার আলোকে ঐ শ্রেণির সবগুলো সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাজেই আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্তে পৌছাঁনোর ক্ষেত্রে আলোচ্য শ্রেণির শ্রেণিকরণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, সাদৃশ্যের ভিত্তিতে শ্রেণিবদ্ধ করা বস্তুসমূহের কয়েকটা সম্পর্কে যা সত্য তা ঐ শ্রেণির সকলের ক্ষেত্রেও সত্য হয়। তাই বলা যায়, আরোহ অনুমানকে ফলপ্রসূ করতে শ্রেণিকরণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং শ্রেণিকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান আরোহ অনুমানের জন্য অপরিহার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ : শ্রেণিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ১৫টি বাক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

শ্রেণিকরণ করার সময় এমন কিছু বিষয় বা বস্তু বা ঘটনা পাওয়া যায় যেগুলোকে শ্রেণিকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। যেসব বিষয়ের শ্রেণিকরণ করা সম্ভব হয় না সেগুলো হলো— বৃহত্তম বা পরমতম জাতিকে শ্রেণিকরণ করা যায় না, প্রান্তস্থিত বস্তুকে শ্রেণিকরণ করা যায় না, পরিবর্তনশীল বস্তুর শ্রেণিকরণ করা যায় না এবং সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন বিষয়ের শ্রেণিকরণ করা যায় না। শ্রেণিকরণের মাধ্যমে জগতের বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনাবলিকে জানা যায় এবং এদেরকে মনে রাখাও সহজ হয়। তাই আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এবং জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শ্রেণিকরণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। শ্রেণিকরণের ক্ষেত্রে কোন্‌টি যথার্থ নয়?
(ক) বস্তুর স্থায়ী গুণের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা হয় (খ) বস্তুর পরিবর্তনশীল গুণের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা হয়
(গ) বস্তুর আবশ্যিক গুণের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা হয় (ঘ) সকল প্রকার শ্রেণিকরণেই উদ্দেশ্য নিহিত থাকে

২। শ্রেণিকরণ হলো একটি সীমিত প্রক্রিয়া, কারণ—
(i) পরিবর্তনশীল বস্তুর শ্রেণিকরণ করা যায় না (ii) সীমিত জ্ঞান সম্পন্ন বিষয়ের শ্রেণিকরণ করা যায় না
(iii) প্রান্তিক গুণ সম্পন্ন বস্তুর শ্রেণিকরণ করা যায় না

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট- ৭

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। নিচের কোনটি শ্রেণিকরণের বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) একটি বিশষ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে (খ) এক ধরনের বিন্যস্তকরণ
(গ) একটি মানসিক প্রক্রিয়া (ঘ) সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবেচ্য নয়

২। শ্রেণিকরণ কত প্রকার?
(ক) দুই (খ) তিন
(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৩। নিচের কোনগুলো শ্রেণিকরণের সীমা নির্দেশ করে?
(i) পরতম জাতি (ii) প্রান্তিক বস্তু
(iii) সংজ্ঞায়নযোগ্য বিষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রন্ধন শিল্পী নাজমা আক্তার তাঁর কাজের সুবিধার্থে রান্নার সব উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখেন। অন্যদিকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী সারোয়ার উদ্দিন খান বীজের ভিত্তিতে উদ্ভিদকে একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী এ দু'ভাগে ভাগ করেন।

৪। উদ্দীপকটিতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তাহলো-
(ক) প্রকল্প (খ) ব্যাখ্যা
(গ) আরোহ (ঘ) শ্রেণিকরণ

৫। উদ্দীপকটিতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে নিচের কোনগুলি প্রযোজ্য?
(i) নাজমা আক্তারের কাজটি হলো কৃত্রিম শ্রেণিকরণ
(ii) সারোয়ার উদ্দিন খানের কাজটি হলো প্রাকৃতিক শ্রেণিকরণ
(iii) উভয়ের কাজে কোনো পার্থক্য নেই

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী তার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য গাছগাছড়ার রোগ নিরাময় ক্ষমতার ভিত্তিতে এগুলোর শ্রেণিবিণ্যাস করেন। অন্যদিকে একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফুলের ভিত্তিতে সপুষ্পক ও অপুষ্পক এ দু'ভাগে ভাগ করেন।
ক. শ্রেণিকরণ কী? ১
খ. শ্রেণিকরণের সীমা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীর গাছের শ্রেণিবিণ্যাসের প্রক্রিয়াটি কী নির্দেশ করে? আলোচনা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীর গাছের শ্রেণিবিণ্যাসের প্রক্রিয়াটির পার্থক্য নির্দেশ করুন। ৪

২। দৃশ্যকল্প-১ : একজন জীববিজ্ঞানী বস্তুতন্ত্রের উপাদানগুলোর মধ্য থেকে জীব উপাদানকে উৎপাদক, খাদক ও বিয়োজক এ তিন ভাগে বিভক্ত করলেন।
দৃশ্যকল্প-২ : লাইব্রেরিয়ান নাসরীন জাহান তাঁর নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বইগুলো গল্প, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি অনুসারে বিভিন্ন তাকে সাজিয়ে রাখলেন।
ক. শ্রেণিকরণ কত প্রকার ও কী কী? ১
খ. কৃত্রিম শ্রেণিকরণকে ব্যবহারিক শ্রেণিকরণ বলা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জীববিজ্ঞানীর জীব উপাদানকে শ্রেণিবিণ্যাসের প্রক্রিয়াটি কী নির্দেশ করে? আলোচনা করুন। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত জীববিজ্ঞানী ও লাইব্রেরিয়ানের বই সাজানোর প্রক্রিয়াটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে" এ উক্তির যথার্থতা নিরূপণ করুন? ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪ ঃ ১-ঘ, ২-গ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫ ঃ ১-খ, ২-ঘ

সম্ভাব্যতা
(Probability)

ইউনিট ৮

ভূমিকা

আমরা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কথাবার্তায় প্রায়ই বিভিন্ন প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গে 'হয়তো', 'বিশ্বাসযোগ্য', 'হতে পারে' ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে সম্ভাবনা শব্দটি প্রয়োগ করে থাকি। এছাড়া গাণিতিক যুক্তিতে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে 'সম্ভাবনা তত্ত্বের' ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক দিক লক্ষ্য করা যায়। এতে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, 'সম্ভাবনা' ধারণাটি ব্যবহারের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সম্ভাবনা তত্ত্বের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এর প্রথম সূচনা হয়েছিল ফরাসি গণিতবিদ ব্লেইজি প্যাসকেল (*Blaise Pascal*) এবং ফরাসি আইন বিশেষজ্ঞ ও গণিতবিদ পিয়ারে ডি ফারমা (*Pierre de Fermat*) নামক তদানিন্তন দু'জন বিখ্যাত চিন্তাবিদের পত্রালাপের মাধ্যমে। পরবর্তীতে সুইজারল্যান্ডের প্রখ্যাত গণিত বিশেষজ্ঞ বারনৌলি (Daniel *Bernoulli*) এবং ফরাসি জ্যোতির্বিদ পিয়ারে সিমন মারকুইস ডি ল্যাপ্লাস (Pierre-Simon marquis de Laplace) সম্ভাবনা তত্ত্বের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন। এরই ধারাবাহিকতায় সম্ভাবনা তত্ত্ব (probability theory) সমকালীন যুক্তিবিদ্যায় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ ইউনিটে আমরা সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা, এর প্রকৃতি ও ভিত্তি, আকস্মিকতা, এর প্রকৃতি ও অপনয়ন, সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সম্পর্ক, সম্ভাব্যতা ও আরোহ, জেভন্স, মিল, কার্ভেথ রীড ও ফাউলারের মতবাদ এবং সম্ভাব্যতা পরিমাপের নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময় : সর্বোচ্চ ০৪ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১: সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা
পাঠ-৮.২: সম্ভাব্যতার প্রকৃতি ও ভিত্তি
পাঠ-৮.৩: আকস্মিকতা: প্রকৃতি ও অপনয়ন
পাঠ-৮.৪: সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সম্পর্ক
পাঠ-৮.৫: সম্ভাব্যতা ও আরোহ
পাঠ-৮.৬ : সম্ভাব্যতা পরিমাপের নিয়মাবলি

পাঠ-৮.১ সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা ও প্রাসঙ্গিকতা (Definition and Relevance of Probability)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- এর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা (Definition of Probability)

সাধারণভাবে যখন কোনো একটি ঘটনা সংঘটিত হতে পারে বলে মনে করা হয় তখন তাকে সম্ভাব্যতা বলে। 'সম্ভাব্যতা' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Probability' কথাটির উৎস হলো ল্যাটিন শব্দ 'Probabilitatem' অথবা 'Probabilis' যার বাংলা অর্থ 'সত্য হতে পারে'। সুতরাং শব্দার্থের দিক থেকে বলা যায় যে, যা সত্য হতে পারে তাকে সম্ভাব্যতা বলে। কিন্তু যুক্তিবিদ্যায় সম্ভাব্যতা শব্দটি আরও বস্তুনিষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা দিতে হলে আমাদের প্রথমে এর অর্থ জানা প্রয়োজন। সম্ভাবনার ধারণাটি সাধারণত দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা : লৌকিক অর্থ (Popular meaning) ও বৈজ্ঞানিক অর্থ (Scientific meaning)।

লৌকিক অর্থ (Popular Meaning)

সাধারণ মানুষ যখন কোনো একটি ঘটনাকে সম্ভাব্য বলে মনে করে বা কোনো ঘটনা না ঘটার চেয়ে ঘটার বিষয়টিই বিশ্বাস্য মনে করে তখন তাকে লৌকিক অর্থে সম্ভাব্যতা বলে। অর্থাৎ লৌকিক অর্থে সম্ভাব্যতা বলতে কোনো ঘটনা ঘটার বিষয়ে কেবলমাত্র প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশাকেই নির্দেশ করে।

বৈজ্ঞানিক অর্থ (Scientific Meaning)

সম্ভাবনার যে অর্থ অনুসারে মনে করা হয় যে, কোনো একটি ঘটনা ঘটা একেবারে অসম্ভব নয়, আবার ঘটনাটি ঘটা নিশ্চিতও নয়, তখন তাকে বৈজ্ঞানিক অর্থে সম্ভাব্যতা বলে। বৈজ্ঞানিক অর্থে সম্ভাব্যতা বলতে বুঝানো হয় যে, ঘটনাটি ঘটতেও পারে, আবার তা নাও ঘটতে পারে। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভাব্যতা হলো অসম্ভব ও নিশ্চিত এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা।

উদাহরণস্বরূপ, আকাশে মেঘ দেখে বৃষ্টি হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে সম্ভাব্যতা। এক্ষেত্রে 'বৃষ্টি হতে পারে' শুধুমাত্র এমন ধারণা করা হলো লৌকিক অর্থে সম্ভাব্যতা। আর 'বৃষ্টি হতে পারে' আবার 'বৃষ্টি নাও হতে পারে' এমন ধারণা করা হলো বৈজ্ঞানিক অর্থে সম্ভাব্যতা।

সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত অর্থ, ধারণা ও উদাহরণ থেকে এর যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় তাহলো, যখন কোনো একটি ঘটনা ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা হয় এবং ঐ প্রত্যাশা যদি নিশ্চয়তার চেয়ে কম থাকে, তখন সেই অবস্থাকেই সম্ভাব্যতা বলে।

সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতা
(Relevance of Probability)

অনেক সময় আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা সহকারে কিছু বলা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় সম্ভাব্যতা তত্ত্বের সাহায্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিষয়টিকে আমাদের জানতে চেষ্টা করতে হয়। তাই সম্ভাব্যতা তত্ত্ব সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকলে যুক্তিবিদ্যায় ব্যবহৃত পদ, বাক্য, বচন বা বিবৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুসারে সম্ভাব্যতাকে দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সম্ভাব্যতা তত্ত্ব একটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়। নিম্নে এ প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো—

১। **সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে জৈন মত :** সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে জৈন মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা মনে করতেন, জগতের প্রত্যেকটি বস্তুই অসংখ্য গুণ বা ধর্ম বিশিষ্ট। তাই বস্তু সম্পর্কিত কোনো বর্ণনাকেই তাঁরা সম্পূর্ণ বলে মনে করতেন না। তাঁদের মতে, বস্তু সম্পর্কে প্রতিটি বর্ণনার পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দ ব্যবহার করা উচিত। কারণ 'স্যাৎ' শব্দের অর্থ হলো হওয়া, হতে পারে, হয়তো , সম্ভবত ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দের প্রয়োগ অন্যান্য বর্ণনার সম্ভাবনাকে আরো সম্প্রসারিত করে। কেননা জৈনদের মতে, প্রতিটি বর্ণনা আংশিকভাবে সত্য, সম্পূর্ণভাবে নয়। তাই প্রতিটি উক্তি, বচন বা বর্ণনার পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দটি ব্যবহার করে তাঁরা মূলত কোনো বিষয় বা ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতা ব্যক্ত করেন।

২। **সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে পাইরোর মত :** প্রখ্যাত গ্রিক দার্শনিক পাইরোও জৈন দার্শনিকদের মতো মনে করতেন যে, কোনো মানুষের পক্ষেই বস্তুর সামগ্রিক জ্ঞান বা চূড়ান্ত সত্য লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই পাইরো ও তাঁর অনুসারীরা কোনো বিষয় সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে সংশয়বাচক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। যেকোনো বাক্য, বচন বা বিবৃতির আগে তাঁরা 'সম্ভবত', 'হয়তো', 'এরূপ হতে পারে', 'আমার মনে হয়', 'আমি নিশিচত জানি না', 'তবে', ইত্যাদি শব্দ বা শব্দাবলি ব্যবহার করতেন।

৩। **যুক্তিবিদ্যায় :** যুক্তিবিদ্যায় সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কতগুলো আরোহাত্মক বা পরীক্ষণাত্মক পদ্ধতিকে সম্ভাবনামূলক বলে জানতে পারি। বিশেষত নিরীক্ষণ নির্ভর পদ্ধতি হিসেবে অন্বয়ী পদ্ধতি, ব্যতিরেকী পদ্ধতির নিরীক্ষণমূলক প্রয়োগ, যৌথ অন্বয়ী ব্যতিরেকী পদ্ধতি এবং সহ-পরিবর্তন পদ্ধতিকে যখন অন্বয়ী পদ্ধতির রূপান্তর হিসেবে প্রয়োগ করা হয় তখন এর সিদ্ধান্ত সম্ভাবনামূলক হয়ে যায়। তাই এসব ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা তত্ত্বের ব্যবহার ও এর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে।

৪। **গণিতে :** গাণিতিক বিজ্ঞানে 'সম্ভাবনামূলক গণনা প্রণালি' বর্তমানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে পরিগণিত হয়েছে। যেকোনো গাণিতিক সমস্যার সমাধান ও ক্যালকুলেশনে সম্ভাবনামূলক গণনা প্রণালি বা সম্ভাবনার হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত একারণেই এটি গণিতের একটি শাখা হিসেবে বিবেচিত হয়। তাছাড়া সম্ভাবনা তত্ত্বের সূচনা পর্বে গণিতবিদগণই সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে গাণিতিক সম্ভাব্যতার আলোচনা ও এর প্রয়োগ সাম্প্রতিক কালেই বেশি বিকশিত হয়েছে। এ থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে গণিতের ক্ষেত্রেও সম্ভাব্যতা একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়।

৫। **কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে :** কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা দূর করার জন্য যুক্তিবিদগণ আকস্মিকতা ও সম্ভাব্যতার কতিপয় নিয়ম প্রণয়ন করেছেন। যেক্ষেত্রে একই কার্যের একাধিক বিকল্প কারণের সম্ভাবনা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার নিয়মাবলি প্রয়োগ করে বিকল্প কারণগুলোর মধ্যে কোন্‌টির প্রকৃত কারণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি তা জানার চেষ্টা করা হয়। যদি একটি বিকল্প কারণকে বহুক্ষেত্রে আলোচ্য ঘটনার সাথে ঘটতে দেখা যায়, তাহলে তাকে আকস্মিক না বলে সম্ভাব্য হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা স্বীকার করে নেয়া হয়। তাই কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে সম্ভাব্যতার ধারণাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়।

৬। **আপেক্ষিক তত্ত্বে :** বিজ্ঞানের আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এ তত্ত্ব অনুসারে, যে বিষয়টি একটি প্রেক্ষাপটে এক রকম তা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অন্যভাবে প্রতিফলিত হয়। তাহলে এক্ষেত্রে

প্রশ্ন উঠে, কোন্ অংশটির সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু? আর এ জাতীয় প্রশ্ন থেকেই আপেক্ষিক তত্ত্ব নানাভাবে বিকশিত হয়েছে।

৭। **দৈনন্দিন জীবনে :** আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে সম্ভাব্যতা তত্ত্বটি প্রয়োগ করে থাকি। বিভিন্ন বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার, চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়, সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি বা অবনতি নির্ণয়, কৃষকের ফসলের মাঠে ফসল উৎপাদনের হার নির্ণয়, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ফলাফল সম্পর্কে ধারণা নির্ণয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা তত্ত্বটি একটি মৌলিক সূত্রের ন্যায় কাজ করে। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ : সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে ২০টি বাক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ

যখন কোনো একটি ঘটনা ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা হয় ঐ প্রত্যাশা যদি নিশ্চয়তার চেয়ে কম থাকে, তখন আমাদের প্রত্যাশার সেই অবস্থাকেই সম্ভাব্যতা বলে। সম্ভাবনা তত্ত্বের প্রথম সূচনা হয়েছিল দু'জন ফরাসি গণিতবিদ ব্লেইজি প্যাসকেল এবং পিয়ারে ডি ফারমা নামক তদানিন্তন দু'জন বিখ্যাত চিন্তাবিদের পত্রালাপের মাধ্যমে। সম্ভাবনার ধারণাটি সাধারণত লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যুক্তিবিদ্যাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সম্ভাব্যতার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সম্ভাবনার ধারণাটি সাধারণত ক'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়?
(ক) দু'টি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। সম্ভাবনা তত্ত্বের প্রথম সূচনা হয়েছিল—
(ক) প্যাসকেল ও বারনৌলির পত্রালাপের মাধ্যমে (খ) বারনৌলি ও ফারমার পত্রালাপের মাধ্যমে
(গ) ল্যাপ্লাস ও ফারমার পত্রালাপের মাধ্যমে (ঘ) প্যাসকেল ও ফারমার পত্রালাপের মাধ্যমে

৩। বৈজ্ঞানিক অর্থে সম্ভাব্যতা হলো—
(i) ঘটনা না ঘটার চেয়ে ঘটার বিষয়টিই বিশ্বাস্য(ii) ঘটনাটি ঘটতেও পারে, আবার তা নাও ঘটতে পারে
(iii) অসম্ভব ও নিশ্চিত এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.২ সম্ভাব্যতার প্রকৃতি ও ভিত্তি (Nature and Ground of Probability)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সম্ভাব্যতার প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারবেন।
- সম্ভাব্যতার ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সম্ভাব্যতার প্রকৃতি (Nature of Probability)

পূর্বোক্ত পাঠে আলোচিত সম্ভাব্যতার অর্থ ও সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় নিম্নে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো—

১। **সম্ভাব্যতা একটি মাত্রাগত বিষয় :** সম্ভাব্যতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটি একটি মাত্রাগত বিষয়। কারণ যে ঘটনাটিকে আমরা সম্ভাব্য বলি সেটি যেমন সত্য হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। অর্থাৎ একটি সম্ভাব্য ঘটনাকে যেমন অসম্ভব বলা যায় না, তেমনি নিশ্চিতও বলা যায় না। কিছু ঘটনা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সংশয় প্রকাশ করে বলা যায় যে, ঘটনাটি ঘটা অসম্ভব। যেমন- কোনো প্রকার খাবার না খেয়েই আমি বেঁচে আছি। আবার কিছু ঘটনা রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ঘটনাটি ঘটবেই। যেমন- প্রতিটি মানুষকে মৃত্যুবরন করতে হবে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যেগুলোকে আমরা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবও বলতে পারি না, আবার অসম্ভবও বলতে পারি না। যেমন- কোনো একজন শিক্ষার্থীর পড়ালেখার প্রতি আগ্রহ দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে, সে জীবনে সফল হতে পারে, আবার সফল নাও হতে পারে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সফলতা সম্পর্কে সম্ভাব্যতা প্রকাশ করা হয়েছে। তাই সম্ভাব্যতা হচ্ছে অসম্ভব ও নিশ্চয়তার মধ্যবর্তী স্তর বা একটি মাত্রাগত বিষয়।

২। **সম্ভাব্যতা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে :** সম্ভাব্যতা হলো কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার প্রকাশ। কেননা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্যই আমরা অনেক সময় কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে নির্ভুলভাবে মত প্রকাশ করতে পারি না। ফলে আমরা উক্ত বিষয় সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা প্রকাশ করি এবং বলি যে, এমনটি হতে পারে। যেমন- যদি কোনো শিক্ষার্থীকে আমরা পড়ালেখায় অমনোযোগী দেখি তাহলে অনুমান করি যে, তার ভবিষ্যৎ হয়তো ভালো নয়। অর্থাৎ এ বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা মূলত তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাই প্রকাশ করছি।

৩। **সম্ভাব্যতাকে ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় :** যেকোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মাত্রাকে গাণিতিক ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। সম্ভাব্যতাকে প্রথাগতভাবে বা বিশুদ্ধ গণিতে '০' থেকে '১' - এই মানদন্ডে প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে '১'-কে নিশ্চয়তার প্রতীক এবং '০' -কে অসম্ভাব্যতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। একারণেই সাধারণত '১'-এর চেয়ে ছোট এবং '০'-এর চেয়ে বড় ভগ্নাংশকে সম্ভাব্যতার মাত্রা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- '০' (শূন্য)-কে অসম্ভাব্যতার প্রতীক এবং '১০০'-কে নিশ্চয়তার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করলে ১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো হবে সম্ভাব্যতা। তাহলে কোনো ঘটনা যদি ১০০টি দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রেই ঘটে, সেটি হবে নিশ্চিত। আর যেক্ষেত্রে ১০০টি দৃষ্টান্তের কোনোটিতেই ঘটেনা, সেটি হবে অনিশ্চিত। কিন্তু যে ঘটনা ১০০টি দৃষ্টান্তের মধ্যে ১টি থেকে ৯৯টিতে ঘটে, তা হবে সম্ভাব্য। সুতরাং $\frac{১}{১০০}$ থেকে $\frac{৯৯}{১০০}$ পর্যন্ত ভগ্নাংশগুলো হবে সম্ভাব্যতার মাত্রা

প্রকাশক। এতে $\frac{১}{১০০}$ ভগ্নাংশটি হচ্ছে সম্ভাব্যতার সর্বনিম্ন মাত্রা এবং $\frac{৯৯}{১০০}$ ভগ্নাংশটি হচ্ছে সম্ভাব্যতার সর্বোচ্চ মাত্রা।

৪। **সম্ভাব্যতা অনুপাতের সাহায্যে প্রকাশযোগ্য :** যেকোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার মাত্রাকে অনুপাতের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। যেমন- কোনো গ্রামে যদি ১০০ জন মানুষের মধ্যে ২০ জন বিসিএস পাশ করে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করে, তাহলে ঐ গ্রামের মানুষের বিসিএস পাশ করে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করার সম্ভাবনা ২০ ঃ ১০০ বা ১ ঃ ৫ ভাগ। অর্থাৎ প্রতি ৫ জনে ১ জন মানুষের বিসিএস পাশ করে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে ২০ জন বিসিএস পাশ করে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করা হলো অনুকূল দৃষ্টান্ত এবং ১০০ - ২০ = ৮০ জন মানুষ বিসিএস পাশ না করে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করতে না পারা হলো প্রতিকূল দৃষ্টান্ত। অতএব মোট দৃষ্টান্ত = (অনুকূল দৃষ্টান্ত + প্রতিকূল দৃষ্টান্ত) = (২০ + ৮০) = ১০০। এখন এই অনুপাতকে ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করলে দাঁড়ায়-

অর্থাৎ ১০০ জনের মধ্যে ২০ জন বিসিএস পাশ করে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করার সম্ভাবনা = $\frac{২০}{১০০}$ জন = $\frac{১}{৫}$ জন। এবং ১০০ জনের মধ্যে ৮০ জন বিসিএস পাশ না করে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করতে না পারার সম্ভাবনা = $\frac{৮০}{১০০}$ জন = $\frac{৪}{৫}$ জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আনুপাতিক হারেও সম্ভাব্যতার মাত্রা প্রকাশ করা যায়।

৫। **সম্ভাব্যতা সতর্কতামূলক :** সম্ভাব্যতার স্বরূপ অনেক সময় সতর্কতামূলক হয়ে থাকে। অর্থাৎ সম্ভাবনামূলক বক্তব্যের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে সতর্কতার ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। কারণ যিনি বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে সম্ভাব্যতা প্রকাশ করেন, তিনি মূলত ঐ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই বিয়য়টিকে সম্ভাব্য হিসেবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

৬। **সম্ভাব্যতা বৈধ প্রকল্পের অনুরূপ :** সম্ভাব্যতাকে বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প বা বৈধ প্রকল্পে অনুরূপ বলে গণ্য করা যেতে পারে। যেমন— বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আলোর স্বরূপ সম্পর্কিত 'ফোটন তত্ত্ব' একটি বৈধ প্রকল্প যা যথার্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং কোনো একটি প্রকল্প বৈধ হওয়ার সাথে তা সম্ভাব্য হওয়ার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

৭। **সম্ভাব্যতা নিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছতে পারে :** সম্ভাব্যতার প্রকৃতি এমনি যে তা কোনো কোনো সময় নিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছতে পারে। যেমন- যদি একটি মুদ্রা উপরের দিকে ছুড়ে দেয়া হয় তাহলে এর হেড বা টেল পড়ার সম্ভাবনা $\frac{১}{২}$। অর্থাৎ এক্ষেত্রে হেড বা টেল পড়ার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত।

৮। **সম্ভাব্যতা অনিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছতে পারে :** সম্ভাব্যতার প্রকৃতি এমনি যে কোনো কোনো সময় এর গাণিতিক মাত্রা অনিশ্চয়তার স্তরেও পৌঁছতে পারে। যেমন— যদি বলা হয় যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লব ঘটতে পারে, তাহলে এক্ষেত্রে প্রদত্ত বক্তব্য অনুযায়ী সম্ভাব্যতার গাণিতিক মাত্রা অনিশ্চয়তার স্তরে পৌঁছে।

পরিশেষে সম্ভাব্যতার প্রকৃতি সম্পর্কিত উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে বলা যায় যে, কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই হলো সম্ভাব্যতা। আর জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা বলতে বুঝায় কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে কিছু জানা এবং কিছু না জানার অবস্থা। আর এই জানা-অজানার মধ্যবর্তী অবস্থাই হলো সম্ভাব্যতা।

সম্ভাব্যতার ভিত্তি
(Ground of Probability)

আমরা জানি, যার উপর নির্ভর করে কোনো কিছু অস্তিত্বশীল হয় তাকে ঐ বিষয়ের ভিত্তি বলে। অতএব সম্ভাব্যতা যার উপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয় তাই হলো এর ভিত্তি। এখন প্রশ্ন হলো সম্ভাব্যতার ভিত্তি কী? এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিবিদগণ একমত পোষণ করতে পারেননি। অর্থাৎ সম্ভাব্যতার ভিত্তি কী বা সম্ভাব্যতা কী বস্তুগত না আত্মগত-এ নিয়ে যুক্তিবিদগণের

মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো যুক্তিবিদের মতে, সম্ভাব্যতার ভিত্তি আত্মগত বা বিষয়ীগত (subjective)। আবার কোনো কোনো যুক্তিবিদের মতে, সম্ভাব্যতার ভিত্তি বস্তুগত বা বিষয়গত (objective)। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

সম্ভাব্যতার আত্মগত বা বিষয়ীগত ভিত্তি
(Subjective Ground of Probability)

যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স (William Stanley *Jevons)* এর মতে, সম্ভাব্যতার ভিত্তি আত্মগত বা বিষয়ীগত (Subjective)। কারণ কোনো একটি ঘটনা সংঘটনের সম্ভাবনার পরিমাণ নির্ভর করে আমাদের বিশ্বাসের উপর। যুক্তিবিদ জেভন্সের এ আত্মগত বা বিষয়ীগত মতের সমর্থন পাওয়া যায় জ্যোতির্বিদ পিয়ারে সিমন মারকুইস ডি ল্যাপ্লাস (Pierre-Simon marquis de Laplace), যুক্তিবিদ জে. এন. কীনস (J. N. Keynes) এবং লুইস হেনরি মরগান (Lewis Henry Morgan) এর বক্তব্যে। তাঁদের মতে, বাস্তব জগতে সম্ভাবনা বলে কিছু নেই। সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে একটি মানসিক বিষয়। অর্থাৎ তাঁরা 'সম্ভাব্যতা' বিষয়টিকে ব্যক্তির বিশ্বাসের বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ কোনো ঘটনা বা বিষয়ের পক্ষে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ বেড়ে যায় তাহলে সেই ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসও বেড়ে যায়। সুতরাং ব্যক্তির বিশ্বাসের তারতম্য থেকেই সম্ভাব্যতার ভিত্তি সূচিত হয়। আর এ কারণেই সম্ভাব্যতার ভিত্তি আত্মগত বা বিষয়ীগত।

সম্ভাব্যতার বস্তুগত বা বিষয়গত ভিত্তি
(Objective Ground of Probability)

যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড (Carveth Read) ও তাঁর সমর্থকগণ সম্ভাব্যতা সম্পর্কে আত্মগত মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, সম্ভাব্যতার ভিত্তি আত্মগত বা বিষয়ীগত নয়, বরং এর ভিত্তি বস্তুগত বা বিষয়গত। অর্থাৎ তাঁদের মতে, সম্ভাব্যতা মূলত বাস্তব জগতে ঘটে যাওয়া ঘটনার অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভাব্যতার ভিত্তি সম্পর্কে আত্মগত মতের সমালোচনা করে যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড (Carveth Read) নিম্নোক্ত যুক্তি উপস্থাপন করেন :

প্রথমত, বিশ্বাস এক প্রকার মানসিক অবস্থা বলে এটি পরিমাপের কোনো পদ্ধতি নেই। এছাড়া একে গাণিতিক ভগ্নাংশের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, কোনো ঘটনা সংঘটনের বিষয়টি মানুষের বিশ্বাস বা মনের ওপর নির্ভর করে না। যখন বাস্তবে কোনো ঘটনা ঘটে কেবলমাত্র তখনই মানুষ সেই ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মন সেই ঘটনাকে জানে। তাই বাস্তবে একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনার মাত্রা যত বেশি হয় ঘটনাটি সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাসের মাত্রা ততই বেড়ে যায়। সুতরাং বাস্তবে সংঘটিত ঘটনাই মানুষের বিশ্বাস ও মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সম্ভাব্যতার ভিত্তি বস্তুগত বা বিষয়গত।

তৃতীয়ত, ঘটনাবলির প্রতি মানুষের বিশ্বাস সব সময় একই রূপ হয় না। বিশ্বাস এক প্রকার মানসিক অবস্থা বলে এটি মানুষের মনের বিভিন্ন অবস্থা; যেমন- প্রত্যাশা, আবেগ, ভয়-ভীতি, মেজাজ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ একই ঘটনা বা বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু কোনো ঘটনা সংঘটনের সম্ভাব্যতা তা হয় না। যেমন- অন্ধকার রাতে পথ চলার সময় পাশের বাগানে মরে যাওয়া ডালপালাহীন গাছকে ভুত বলে কেউ বিশ্বাস করতে পারেন, আবার অন্য জন এরূপ বিশ্বাস নাও করতে পারেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, একই ঘটনার প্রতি মানুষের বিশ্বাস সব সময় একই রূপ হয় না। তাই বিশ্বাসের সাহায্যে সম্ভাব্যতার মাত্রা পরিমাপ করা যায় না।

চতুর্থত, অনেক সময় ঘটনার প্রতি মানুষের বিশ্বাস বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। কিন্তু সম্ভাব্যতার সাথে বাস্তব তথ্যের সাধারণত মিল থাকে। তাই সম্ভাব্যতার ভিত্তি কেবল বিশ্বাস হতে পারে না।

পঞ্চমত, সম্ভাব্যতা যদি কেবল আত্মগত হতো তাহলে এটি যুক্তিবিদ্যার বিষয় না হয়ে মনোবিজ্ঞানের বিষয় হতো। কিন্তু সম্ভাব্যতা যেহেতু যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় সেহেতু এটি অবশ্যই বস্তুগত ।

সম্ভাব্যতার ভিত্তি সম্পর্কি উপর্যুক্ত যুক্তিগুলোর আলোকে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, সম্ভাব্যতার ভিত্তি আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ই। কারণ সম্ভাব্যতার আত্মগত ভিত্তি হচ্ছে বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস, আর এর বস্তুগত ভিত্তি হচ্ছে বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে মানুষের প্রত্যক্ষণলব্দ অভিজ্ঞতা।

শিক্ষার্থীর কাজ : সম্ভাব্যতার বস্তুগত ভিত্তি সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করুন।

সারসংক্ষেপ

সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় সেগুলো হলো-এটি একটি মাত্রাগত বিষয়, এটি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে, একে ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, এটি অনুপাতের সাহায্যে প্রকাশযোগ্য, এটি সতর্কতামূলক ও এটি বৈধ প্রকল্পের অনুরূপ। যুক্তিবিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সম্ভাব্যতার ভিত্তি আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সম্ভাব্যতার আত্মগত ভিত্তির পক্ষে মত দেন–
(ক) যুক্তিবিদ যোসেফ (খ) যুক্তিবিদ ফাউলার
(গ) যুক্তিবিদ মিল (ঘ) যুক্তিবিদ জেভন্স

২। নিচের কোন্‌টিকে গাণিতিক ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না?
(ক) সম্ভাব্যতা (খ) বস্তুর ওজন
গ) বিশ্বাস (ঘ) আকস্মিকতা

৩। সম্ভাব্যতার প্রকৃতি হলো–
(i) এটি একটি মাত্রাগত বিষয় (ii) ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না
(iii) এটি সতর্কতামূলক

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৩ আকস্মিকতা: প্রকৃতি ও অপনয়ন (Chance: Nature and Elimination)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- আকস্মিকতা কী তা জানতে পারবেন।
- আকস্মিকতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- আকস্মিকতার অপনয়ন সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আকস্মিকতা (Chance)

সাধারণত অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে আকস্মিকতা বলে। অর্থাৎ যে ঘটনার কার্য-কারণ আমাদের জানা নেই কিন্তু ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে, এমন ঘটনাকেই বলা হয় আকস্মিকতা। তবে যুক্তিবিদ্যায় আকস্মিকতা কথাটিকে দু'টি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; যথা-ব্যাপক অর্থ ও সংকীর্ণ অর্থ।

আকস্মিকতার ব্যাপক অর্থ : আকস্মিকতার ব্যাপক অর্থ অনুযায়ী, কোনো একটি ঘটনার বা একাধিক ঘটনার কারণ যখন আমাদের জানা না থাকে, এমন ঘটনা ঘটে যাওয়াকেই বলা হয় আকস্মিকতা। এ জাতীয় ঘটনাকে আকস্মিক বলা হয় এ জন্য যে, সংঘটিত ঘটনাটির জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না এবং এটি আমাদের মনের মধ্যে হঠাৎ কোনো বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে। ব্যাপক অর্থে কোনো একক ঘটনাও আকস্মিক হতে পারে।

আকস্মিকতার সংকীর্ণ অর্থ : আকস্মিকতার সংকীর্ণ অর্থ অনুসারে, কোনো বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর বা একাধিক ঘটনা সংমিশ্রণের পর যদি উক্ত ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে তা হবে আকস্মিকতা। উল্লেখ্য কোনো একক ঘটনা কখনো আকস্মিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। একাধিক ঘটনার সংমিশ্রণের ফলেই কেবলমাত্র আকস্মিকতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সুতরাং আকস্মিকতার ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থ সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা এর একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি যে, হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যে সাময়িকভাবে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় না করতে পারার ফলে আমাদের মধ্যে যে চাঞ্চল্যকর ও রহস্যময় অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে আকস্মিকতা বলে।

উদাহরণস্বরূপ, রফিক ট্রেনে দিনাজপুর যাবে বলে জয়দেবপুর রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। এমতাবস্থায় জামালপুর গামী অগ্নিবীনা এক্সপ্রেস ট্রেনটির যাত্রাবিরতি না থাকায় দ্রুতবেগে জয়দেবপুর রেল স্টেশন অতিক্রম করে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখল যে, দ্রুতগতি সম্পন্ন ঐ ট্রেনটি থেকে এক যুবক লাফিয়ে পড়ছে। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যুবকটি কেনো ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুর মুখে পতিত হলো রফিক এর কোনো কারণ খুঁজে পেলোনা। তাই রফিকের সামনে ঘটে যাওয়া এ ঘটনাটিই হলো আকস্মিকতা।

তবে সংঘটিত ঘটনাটি সম্পর্কে রফিক একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখল যে, যুবকটি ভুলক্রমে তার গন্তব্যস্থলের জন্য ছেড়ে যাওয়া ট্রেনে না উঠে এ ট্রেনটিতে উঠেছিল। সুতরাং যুবকটির ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ার ঘটনাটি আকস্মিক হলেও এক্ষেত্রে কারণ বিদ্যমান। তাই বলা যায় যে, আকস্মিকতা কারণহীন কোনো ঘটনা বা ঘটনাবলি নয়, বরং এটি হলো সাময়িকভাবে কারণ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা।

আকস্মিকতার প্রকৃতি (Nature of Chance) : আকস্মিকতা সম্পর্কে প্রদত্ত সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করলে আমরা এর প্রকৃতিকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করতে পারি—

১। **আকস্মিকতা হলো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা :** সাধারণত যখন কোনো ঘটনা হঠাৎ ঘটে যায় তখন তাকে বলা হয় আকস্মিকতা। অর্থাৎ যে ঘটনা বা ঘটনাবলি সংঘটিত হওয়া সম্পর্কে আমরা প্রস্তুত থাকি না তা সংঘটিত হওয়াই আকস্মিকতা।

২। **আকস্মিকতা চাঞ্চল্যকর ও রহস্যময় অবস্থার সৃষ্টি করে :** আকস্মিকভাবে সংঘটিত ঘটনার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি না বলে তা আমাদের মনের মধ্যে হঠাৎ কোনো এক বিশেষ চাঞ্চল্যকর ও রহস্যময় অবস্থার সৃষ্টি করে। মূলত আমাদের মধ্যে এরূপ চাঞ্চল্যকর ও রহস্যময় অবস্থাই হলো আকস্মিকতা।

৩। **আকস্মিকতা হলো ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা :** যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) মনে করেন যে, যেসব ঘটনার সংযোগের নিয়মানুবর্তিতার কোনো ভিত্তি জানা নেই, তাকেই আকস্মিক বলে বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ হলো, প্রকৃতিতে সংঘটিত ঘটনাবলি অত্যন্ত জটিল বলে এর অনেক ঘটনার কারণই আমরা আবিষ্কার করতে পারি না। আর যেসব ঘটনার কারণ আমরা আবিষ্কার করতে পারি না সেসব ঘটনাকে আমরা আকস্মিক বলে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ করি মাত্র।

৪। **আকস্মিকতা কার্য-কারণ সম্পর্ক অস্বীকার করে না :** কোনো ঘটনাকে আকস্মিক বলার অর্থ এই নয় যে, তার কোনো কারণ নেই। আবার আমরা কোনো ঘটনাকে আকস্মিক বলে এটা বোঝাতে চাই না যে, ঐ ঘটনা কোনো কারণ ছাড়াই সংঘটিত হয়েছে। বরং এর সাহায্যে আমরা এটাই বোঝাতে চাই যে, ঘটনাটি যে কারণে ঘটেছে তা আমরা জানি না।

৫। **কোনো একক ঘটনা আকস্মিক হতে পারে না :** যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)-এর মতে, "দুই বা ততোধিক ঘটনার সংমিশ্রণের পর যদি কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে তা হবে আকস্মিকতা।" অর্থাৎ তাঁর মতে, কোনো একক ঘটনা কখনো আকস্মিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। একাধিক ঘটনার সংমিশ্রণের ফলেই কেবলমাত্র আকস্মিকতার সৃষ্টি হতে পারে।

৬। **আকস্মিকতা হলো কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে আমাদের ব্যর্থতা :** বৈচিত্র্য ও রহস্যময় এ পৃথিবীতে মানুষ সকল বিষয়ের কারণ সহজে জানতে ও বুঝতে পারে না। যখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারণ ও কার্য আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়, তখন মানুষ ঘটনাটিকে আকস্মিক বলে ধরে নেয়। তাই বলা যায় যে, আকস্মিকতা কারণহীন কোনো ঘটনা বা ঘটনাবলি নয়, বরং এটি হলো সাময়িকভাবে কারণ নির্ণয়ে আমাদের ব্যর্থতা।

৭। **আকস্মিকতার ধারণা হলো মানুষের মনগড়া :** বিজ্ঞানসম্মত কোনো ঘটনাই আকস্মিক নয়। কেননা প্রতিটি ঘটনার পিছনেই কোনো না কোনো কারণ বা হেতু আছে। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি অনুযায়ী প্রকৃতিতে শৃঙ্খলার কোনো অভাব নেই। মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি অতি সুশৃঙ্খল। প্রকৃতি সর্বদা সুশৃঙ্খলভাবে জগতের সবকিছু সৃষ্টি করে চলেছে। কাজেই প্রতিটি ঘটনারই কারণ আছে এবং ঘটনা মাত্রই কারণ শৃঙ্খলে বাঁধা। তাই কারণহীন কোনো ঘটনা থাকতে পারে না। সুতরাং আকস্মিকতার ধারণা একেবারেই মানুষের মনগড়া এবং এর কোনো ভিত্তি নেই।

আকস্মিকতা অপনয়ন
(Elimination of Chance)

আকস্মিকতা অপনয়ন বলতে এমন এক বিশেষ পদ্ধতিকে বুঝায় যার সহায্যে আমরা দেখাতে পারি যে, প্রতিটি ঘটনাই কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ পদ্ধতিটি একটি বিশেষ নীতি বা পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আকস্মিকতা অপনয়ন প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) তাঁর *Logic Induction* গ্রন্থে যে সূত্র বা নিয়মটি প্রণয়ন করেছেন তাহলো, "ঘটনা দু'টি কত ঘন ঘন সংঘটিত হয় এবং তাদের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ না থকলে কত ঘন ঘন সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল, তার হিসেব করতে হবে। যদি দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে বাস্তব যোগাযোগ হিসেবের চেয়ে বেশি, তাহলে বুঝতে হবে যে, ঘটনা দু'টির মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। আর যদি তাদের মধ্যে বাস্তব যোগাযোগ হিসেবের চেয়ে কম হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, ঘটনা দু'টির মধ্যে বিরোধ বর্তমান।" ("Consider the positive frequency of the phenomena themselves, and how great frequency of coincidence must follow

from that, supposing there is neither connection nor repugnance. If there be a greater frequency, there is connection; if a less , repugnance." P-86)

যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) এর এ সূত্রটির অর্থ হলো, দু'টি ঘটনার মধ্যে যদি খুব ঘন ঘন সংযোগ ঘটতে থাকে, তাহলে তাদের সংযোগকে নিছক আকস্মিক বলা যায় না। তখন ধরে নিতে হয় যে, তাদের মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে।

আবার যুক্তিবিদ জয়েস (Joyce) আকস্মিকতা অপনয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন যে, "যদি দু'টি ঘটনার মধ্যকার সম্পর্ক শুধু আকস্মিক হয়, তবে তাদের সম্বন্ধ আকস্মিক হবে। কিন্তু ঘটনা দু'টির একটি যদি অন্যটিকে এমনভাবে অনুসরণ করে যে, তাকে নিতান্ত আকস্মিক বলে গণ্য করা যায় না, তবে তাদের মধে কার্য-কারণ সম্পর্কের সুসংগত প্রমাণ রয়েছে বলাই যথার্থ হবে।"

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্কের স্বরূপ জানতে চাই, তাহলে এদের মধ্যে কত ঘন ঘন সংযোগ ঘটছে তা জানতে হবে। দেখা গেলো যে, প্রতি চার দিনে একবার আকাশে মেঘ দেখা দেয়, আর বৃষ্টিপাত হয় প্রতি ছয় দিনে একবার। অর্থাৎ প্রতি চব্বিশ দিনে একবার মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে সংযোগ ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে সংযোগের প্রকৃতি আকস্মিক। কিন্তু বাস্তবে যদি ঘটনা দু'টির মধ্যে ঘন ঘন সংযোগ ঘটে, তবে বুঝতে হবে যে, উভয় ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে। আর বাস্তবে যদি ঘটনা দু'টির মধ্যকার সংযোগ খুব কম হয়, অর্থাৎ চব্বিশ দিনেও একবার মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে সংযোগ না ঘটে, তবে বুঝতে হবে যে, উভয় ঘটনার মধ্যে বিরোধ আছে।

উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, আকস্মিকতার অপনয়নের মাধ্যমে আমরা দু'টি ঘটনার মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণ করতে পারি। তাই প্রকৃত বা যথার্থ কারণ আবিষ্কারের জন্য আকস্মিকতার অপনয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : আকস্মিকতা অপনয়ন প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন এর সূত্রটি লিখুন।

সারসংক্ষেপ

সাধারণত অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে আকস্মিকতা বলে। তবে আকস্মিকতার প্রকৃতি অনুযায়ী বলা যায় যে, হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যে সাময়িকভাবে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় না করতে পারার ফলে আমাদের মধ্যে যে চাঞ্চল্যকর ও রহস্যময় অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে আকস্মিকতা বলে। যুক্তিবিদ্যায় আকস্মিকতা কথাটিকে দু'টি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে; যথা-ব্যাপক অর্থ ও সংকীর্ণ অর্থ। আকস্মিকতার মূল প্রকৃতি হলো- এটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা, এটি হলো ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে আমাদের ব্যর্থতা। আকস্মিকতার অপনয়নের মাধ্যমে আমরা দু'টি ঘটনার মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণ করতে পারি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সাধারণত অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়াকে বলে
(ক) আকস্মিকতা (খ) সম্ভাব্যতা
(গ) নিশ্চয়তা (ঘ) অনিশ্চয়তা

২। আকস্মিকতার অপনয়নের মূল সূত্রটি প্রণয়ন করেছেন—
(ক) যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (খ) যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন
(গ) যুক্তিবিদ এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (ঘ) যুক্তিবিদ এরিস্টটল

৩। আকস্মিকতা হলো—
(i) হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা (ii) ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা
(iii) কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থতা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৪ সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সম্পর্ক (Relation between Probability and Chance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারবেন।
- সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার মধ্যকার সাদৃশ্য জানতে পারবেন।
- সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারবেন।
- সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সম্পর্ক (Relation between Probability and Chance)

কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা দেখা দেয় সেসব অসুবিধা দূর করার জন্য যুক্তিবিদগণ আকস্মিকতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত কিছু নিয়ম প্রণয়ন করেছেন। যেখানে একই কার্যের একাধিক বিকল্প কারণের সম্ভাবনা দেখা দেয় সেখানে সম্ভাব্যতার নিয়মাবলি প্রয়োগ করে আমরা জানার চেষ্টা করি বিকল্প কারণগুলোর মধ্যে কোন্‌টির প্রকৃত কারণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যদি একটি বিকল্প কারণকে বহুক্ষেত্রে আলোচ্য ঘটনার সাথে ঘটতে দেখা যায়, তাহলে তাকে আর আকস্মিক ঘটনা বলে গ্রহণ করা যায় না। তখন আমাদের ধরে নিতে হয় যে, ঘটনা দু'টির মধ্যে একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা আকস্মিক হলে এত ঘন ঘন দু'টি ঘটনাকে একসাথে ঘটতে দেখা যেতো না। তবে সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সম্পর্ক নির্ণয় করতে হলে আমাদেরকে এদের স্বরূপ, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা জানতে হবে।

সম্ভাব্যতার স্বরূপ : সাধারণভাবে যখন কোনো একটি ঘটনা সংঘটিত হতে পারে বলে মনে করা হয় তখন তাকে সম্ভাব্যতা বলে। তবে যুক্তিবিদ্যায় সম্ভাব্যতা বলতে যা বুঝায় তাহলো, যখন কোনো একটি ঘটনা ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা হয় এবং ঐ প্রত্যাশা যদি নিশ্চয়তার চেয়ে কম থাকে, তখন সেই অবস্থাকেই সম্ভাব্যতা বলে। সম্ভাব্যতার ধারণাটি বিশ্লেষণ করলে এর স্বরূপ সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো- এটি একটি মাত্রাগত বিষয়, এটি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে, একে ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, এটি অনুপাতের সাহায্যে প্রকাশযোগ্য, এটি সতর্কতামূলক ও এটি বৈধ প্রকল্পের অনুরূপ। যুক্তিবিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সম্ভাব্যতার ভিত্তি আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ই।

আকস্মিকতার স্বরূপ : সাধারণভাবে কোনো একটি ঘটনার বা একাধিক ঘটনার কারণ যখন আমাদের জানা না থাকে, এমন ঘটনা ঘটে যাওয়াকেই বলা হয় আকস্মিকতা। আকস্মিকতা তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে এর স্বরূপ সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় সেগুলো হলো- এটি হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা, এটি হলো ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে আমাদের ব্যর্থতা। আকস্মিকতার অপনয়নের মাধ্যমে আমরা দু'টি ঘটনার মধ্যকার কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণ করতে পারি।

সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সাদৃশ্য : সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সংজ্ঞা ও উদাহরণ, এদের প্রকৃতি বা স্বরূপ ইত্যাদির ব্যাখ্যা থেকে উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত সাদৃশ্যগুলো লক্ষ করা যায়-

১। আকস্মিকতা ও সম্ভাব্যতা উভয়ই ঘটনা সম্পর্কে আমাদের যথার্থ জ্ঞানের অভাব বা অপূর্ণতা থেকে সৃষ্টি।

২। কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধা দেখা দেয় সেসব অসুবিধা দূর করার জন্য আকস্মিকতা ও সম্ভাব্যতা উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। সম্ভাব্যতার নিয়ম ও আকস্মিকতার অপনয়ন প্রক্রিয়া আমাদেরকে বহুকারণজনিত সমস্যা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

৪। আকস্মিকতা ও সম্ভাব্যতা উভয়ই আরোহের বস্তুগত সত্যতা নির্ণয়ে প্রাথমিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে।

সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার বৈসাদৃশ্য : সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার মধ্যে কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ করা গেলেও উভয়ের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের পরিমাণই বেশি। উভয়ের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যগুলো হলো—

১। সম্ভাব্যতা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে আমরা আগে থেকেই প্রস্তুত থাকি। কিন্তু আকস্মিকতা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যার সম্পর্কে আমরা প্রস্তুত থাকি না।

২। সম্ভাব্যতার ভিত্তি হচ্ছে কার্য-কারণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অপূর্ণতা। পক্ষান্তরে, আকস্মিকতার ভিত্তি হচ্ছে কার্য-কারণ সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা।

৩। সম্ভাব্যতা এক বা একাধিক উভয় প্রকার ঘটনাতেই দেখা দিতে পারে। কিন্তু যুক্তিবিদ মিলের মতকে অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, কোনো একক ঘটনার ক্ষেত্রে আকস্মিকতা সৃষ্টি হতে পারে না, দুই বা ততোধিক ঘটনার ক্ষেত্রেই কেবল আকস্মিকতা সৃষ্টি হতে পারে।

৪। সম্ভাব্যতা হলো নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যবর্তী অবস্থা। পক্ষান্তরে আকস্মিকতার ক্ষেত্রে এরূপ কোনো মধ্যবর্তী পর্যায় বা অবস্থা নেই।

৫। গাণিতিক তত্ত্ব ও পৌনঃপুনিকতা তত্ত্ব দিয়ে সম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু আকস্মিকতার ক্ষেত্রে এসব তত্ত্ব প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই।

৬। সম্ভাব্যতা পরিমাপের সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে। অন্যদিকে আকস্মিকতা পরিমাপের সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই।

৭। বিভিন্ন বিজ্ঞানের গবেষণামূলক কার্যক্রমে সম্ভাবনা তত্ত্ব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে আকস্মিকতার তেমন কোনো ভূমিকা নেই।

সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা গেলেও এরা মূলত জটিল কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে থাকে। কেননা আকস্মিকতার অপনয়ন তত্ত্ব আরোহ যুক্তি প্রক্রিয়ার বস্তুগত যথার্থতা নির্ণয়ে আমাদের অজ্ঞতা দূর করে যেমন কার্য-কারণ সম্পর্কের সূচনা করে, সম্ভাব্যতা তত্ত্বও তেমনি কোনো ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতা পরস্পর নির্ভরশীল।

শিক্ষার্থীর কাজ : সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার মধ্যকার পার্থক্যসমূহের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার সম্পর্ক এদের স্বরূপ, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে নির্ণয় করা যায়। যখন কোনো একটি ঘটনা সংঘটিত হতে পারে বলে মনে করা হয় তখন তাকে সম্ভাব্যতা বলে। আর কোনো একটি ঘটনার বা একাধিক ঘটনার কারণ যখন আমাদের জানা না থাকে, এমন ঘটনা ঘটে যাওয়াকেই আকস্মিকতা বলে। সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতার মধ্যে যেমন কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্যও রয়েছে। তবে আকস্মিকতা ও সম্ভাব্যতা উভয়ই আরোহের বস্তুগত সত্যতা নির্ণয়ে প্রাথমিক দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাই সম্ভাব্যতা ও আকস্মিকতা পরস্পর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদগণ আকস্মিকতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত কিছু নিয়ম প্রণয়ন করেছেন-
(ক) কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থতার জন্য (খ) আকস্মিকতার ত্রুটি দূর করার জন্য
(গ) সম্ভাব্যতার নিয়মগুলো জানার জন্য (ঘ)) কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে অসুবিধা দূর করার জন্য

২। নিচের কোন্‌টি বিজ্ঞানের গবেষণামূলক কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে
(ক) আকস্মিকতা (খ) নিশ্চয়তা
(গ) সম্ভাবনা তত্ত্ব (ঘ) অনিশ্চয়তা

৩। সম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায় -
(i) গাণিতিক তত্ত্ব দিয়ে (ii) পৌনঃপুনিকতা তত্ত্ব দিয়ে
(iii) আকস্মিকতা দিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৫ সম্ভাব্যতা ও আরোহ (Probability and Induction)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সম্ভাব্যতা ও আরোহের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সম্ভাব্যতা ও আরোহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

সম্ভাব্যতা ও আরোহ (Probability and Induction)

সম্ভাব্যতা ও আরোহ অনুমানের সম্পর্কের স্বরূপ নিয়ে যুক্তিবিদগণের মধ্যে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়। যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স (William Stanley *Jevons)* -এর মতে, সম্ভাব্যতাই আরোহ অনুমানের ভিত্তি এবং আরোহই সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), কার্ভেথ রীড (Carveth Read), থমাস ফাউলার (Thomas Fowler) ও অধিকাংশ যুক্তিবিদের মতে, সম্ভাব্যতা আরোহের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে সম্ভাব্যতা ও আরোহ অনুমানের সম্পর্ক বিষয়ক মত দু'টি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো—

যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স-এর মত : যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স মনে করেন যে, আরোহ অনুমানকে সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ আরোহ অনুমানের সিদ্ধান্ত সব সময়ই সম্ভাব্য হয়ে থাকে। যুক্তিবিদ জেভন্স তাঁর মতের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দিয়েছেন তাহলো—

১। বৈচিত্র্যময় এ বিশ্বে ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনার পিছনে রয়েছে অসংখ্য কারণ। আবার এসব ঘটনার মধ্যে এমন কিছু জটিল ঘটনা রয়েছে যার প্রকৃত কারণ আমাদের জানা নেই। ফলে আমাদের পক্ষে নির্ভুলভাবে কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা তা বলা সম্ভব নয়। অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন ঘটনার জন্য যে কার্য-কারণ নিয়ম মেনে নিয়েছি তাকে চূড়ান্ত বা সন্দেহাতীত সত্য বলা যায় না। সবই সম্ভাব্য। সুতরাং আরোহ অনুমান সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল।

২। আরোহের অন্যতম ভিত্তি হলো প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি। আর প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর ভিত্তি করেই আরোহ অনুমানে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি যে সব সময় নিয়মানুবর্তী থাকবে তা আমরা কীভাবে নিশ্চিত করে বলতে পারি। প্রকৃতি নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনো এক সময় বিশৃঙ্খল আচরণ করতে পারে। তাই প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে আমরা পরম সত্য পেতে পারি না। সুতরাং প্রকৃতির সব ঘটনাই সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। আর এ জন্যই আরোহ সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল।

৩। আরোহ অনুমান পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না। কারণ সমগ্র বিশ্বজগতে যত কারক (agents*)* শক্তির অস্তিত্ব আছে তাদের সবগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারি না। আবার যে শক্তি এই বিশ্বকে সৃষ্টি করেছে তা কোনো আকস্মিক পরিবর্তন ছাড়াই একে চলতে দেবে কী-না সে বিষয়েও আমরা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করতে পারি না। তাই এই বিশ্ব সম্ভাব্যতায় পরিপূর্ণ, আর একারণেই আরোহ অনুমানকে সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করতে হয়।

তবে যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স-এর উপর্যুক্ত যুক্তিসমূহের প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করতে হলে 'নিশ্চয়তা' কথাটির অর্থ বোঝা প্রয়োজন। 'নিশ্চয়তা' কথাটির দু'টি অর্থ আছে; যথা- (ক) পরম বা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা (absolute certainty*)* ও (খ) মানবিক নিশ্চয়তা (human certainty*)*। পরম বা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা বলতে বুঝায় একেবারে নিশ্চিত সত্যকে, যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। আর মানবিক নিশ্চয়তা হচ্ছে মানুষের পক্ষে যতটুকু নিশ্চয়তা অর্জন করা সম্ভব, ততটুকু নিশ্চয়তা। এখন নিশ্চয়তার প্রথম অর্থ অনুসারে যুক্তিবিদ জেভন্স-এর

মত, অর্থাৎ সম্ভাব্যতা আরোহ অনুমানের ভিত্তি এবং আরোহ সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল, এ কথা গ্রহণ করা যায়। কারণ আরোহ অনুমানের সাহায্যে পরম বা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় যে, কোনো এক সময়ের চূড়ান্ত সত্য বলে স্বীকৃত বিষয় কালের পরিক্রমায় মিথ্যায় রূপ নিয়েছে। কিন্তু নিশ্চয়তার দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে তাঁর মত গ্রহণ করা যায় না। কারণ মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ নিশ্চয়তা আহরণ করা সম্ভব হয়, আরোহ অনুমান অবশ্যই সেটুকু নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে।

যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল, কার্ভেথ রীড ও থমাস ফাউলার-এর মত : যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), কার্ভেথ রিড (Carveth Read), থমাস ফাউলার (Thomas Fowler) ও অন্যান্য যুক্তিবিদগণ জেভন্স-এর মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, সম্ভাব্যতাই আরোহের উপর নির্ভরশীল, আরোহ সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল নয়। আর এ কারণেই 'সম্ভাব্যতা' আরোহের একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয়। তাছাড়া আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয় বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। আবার এ অনুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যথাযথ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদিও শক্তি যোগায়। আবার নিশ্চয়তা ও সম্ভাব্যতা কথা দু'টি ব্যবহারের পার্থক্যই আমাদের নিকট নিশ্চয়তার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যেমন- 'সব মানুষ মরণশীল' এবং 'আগামী কাল বৃষ্টি হবে'- এ বাক্য দু'টি নিঃসন্দেহে একই অর্থে নিশ্চয়তা অথবা সম্ভাব্যতার মাত্রা প্রকাশ করে না। তাই মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ নিশ্চয়তা আহরণ করা সম্ভব হয়, আরোহ অনুমান অবশ্যই সেটুকু নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। এজন্যই যুক্তিবিদ থমাস ফাউলার (Thomas Fowler) তাঁর *Inductive Logic* গ্রন্থে বলেন, "মানব জ্ঞান যতখানি নিশ্চয়তা অর্জনে সক্ষম, অনেক আরোহ অনুমানেরই তা আছে। আরোহ থেকে প্রাপ্ত সত্যের মধ্যে বিশেষ কোনো অনিশ্চয়তা নেই। বস্তুত অন্যসব সত্যের মত এগুলো প্রকৃতির বর্তমান সংগঠন এবং মানব মনের বর্তমান সংগঠনের সাথে আপেক্ষিক সম্বন্ধযুক্ত। আর আমাদের সব জ্ঞান একইভাবে সীমাবদ্ধ এবং আমাদের পক্ষে এই সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।"

পরিশেষে সম্ভাব্যতা ও আরোহের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স এবং যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল, কার্ভেথ রীড ও থমাস ফাউলার-এর মত পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি যে, নিশ্চয়তার দ্বিতীয় অর্থই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সুতরাং সম্ভাব্যতাই আরোহের উপর নির্ভরশীল, আরোহ সম্ভাব্যতার উপর নির্ভরশীল নয়।

শিক্ষার্থীর কাজ : সাম্ভাব্যতা ও আরোহের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

সম্ভাব্যতা ও আরোহ অনুমানের সম্পর্ক নিয়ে যুক্তিবিদগণের মধ্যে দ্বিমত লক্ষ্য করা যায়। যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স-এর মতে, সম্ভাব্যতাই আরোহ অনুমানের ভিত্তি। কিন্তু যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল, কার্ভেথ রীড, থমাস ফাউলার প্রমুখ যুক্তিবিদের মতে, সম্ভাব্যতা আরোহের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে আরোহ অনুমানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতি ও কার্য-কারণ নিয়ম অনুসরণ করা হয় বলে এর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত হয়। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে যে পরিমাণ নিশ্চয়তা আহরণ করা সম্ভব হয়, আরোহ অনুমান সেটুকু নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। তাই সম্ভাব্যতা আরোহের উপর নির্ভরশীল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন—৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবিদ উইলিয়াম স্ট্যান্‌লি জেভন্স-এর মতে—
(ক) আরোহ অনুমান সম্ভাব্যতার ভিত্তি (খ) সম্ভাব্যতা আরোহ অনুমানের ভিত্তি
(গ) আরোহ অনুমান আকস্মিকতার ভিত্তি (ঘ) আকস্মিকতা আরোহ অনুমানের ভিত্তি।

২। 'নিশ্চয়তা' কথাটির ক'টি অর্থ আছে?
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৩। 'সম্ভাব্যতা আরোহের উপর নির্ভরশীল' এ বক্তব্যটি হলো—
(i) যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল-এর (ii) যুক্তিবিদ থমাস ফাউলার-এর
(iii) যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড-এর

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.৬ সম্ভাব্যতা পরিমাপের নিয়মাবলি (Rules of Estimation of Probability)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি—

- সম্ভাব্যতা পরিমাপের নিয়মাবলি জানতে পারবেন।
- সম্ভাব্যতা পরিমাপের নিয়মাবলি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

সম্ভাব্যতা পরিমাপের নিয়মাবলি (Rules of Estimation of Probability)

সম্ভাব্যতা পরিমাপের জন্য যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন (Alexander Bain) কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এগুলো থেকে নিম্নে চারটি প্রধান নিয়ম উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হলো :

নিয়ম-১ : একটি সরল ঘটনার সম্ভাব্যতার মাত্রা ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, যার লব হবে অনুকূল ঘটনার সংখ্যা এবং হর হবে ঘটনাটি ঘটার মোট সংখ্যা।

উদাহরণস্বরূপ, একটি লুডুর গুটির ছয় দিকে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকে। এর মধ্যে ৬ সংখ্যা বসানো দিকটি না উঠলে কোনো প্রতিযোগী খেলায় চাল দিতে পারে না। ফলে এখানে ৬ সংখ্যা বসানো দিকটিকে অনকূল বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ এখানে স্বপক্ষের বিকল্পের সংখ্যা ১ এবং মোট বিকল্পের সংখ্যা ৬। সুতরাং লুডু খেলার সময় ৬ লেখা দিকটি উঠার সম্ভাব্যতার মাত্রা হবে $\frac{১}{৬}$ ।

নিয়ম-২ : যে দু'টি ঘটনা একসাথে ঘটা সম্ভব নয়, তাদের মধ্যে যেকোনো একটি ঘটার সম্ভাব্যতা হবে ঘটনা দু'টির পৃথক পৃথক সম্ভাব্যতার যোগফল।

উদাহরণস্বরূপ, একটি লুডুর গুটির ছয় দিকে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকে। ফলে এখানে ১ থেকে ৬ সংখ্যা উঠার সম-সম্ভাব্যতা রয়েছে। একটি চালে একই সাথে ৬ এবং ৩ উঠা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিযোগী খেলোয়ারদের মধ্যে একজন চাচ্ছে ৬ উঠুক এবং অন্য জন চাচ্ছে ২ উঠুক। এখন নিয়মানুসারে সংখ্যা দু'টির মধ্যে যেকোনো একটি উঠার সম্ভাব্যতা হবে:

যেহেতু এখানে স্বপক্ষের বিকল্পের সংখ্যা ১ এবং মোট বিকল্পের সংখ্যা ৬।

সুতরাং লুডু খেলার সময় পৃথকভাবে ৬ লেখা দিকটি উঠার সম্ভাব্যতার মাত্রা হবে $\frac{১}{৬}$ ভাগ।

আবার, লুডু খেলার সময় পৃথকভাবে ২ লেখা দিকটি উঠার সম্ভাব্যতার মাত্রা হবে $\frac{১}{৬}$ ভাগ।

অতএব ঘটনা দু'টির পৃথক পৃথক সম্ভাব্যতার যোগফল $= \left(\frac{১}{৬} + \frac{১}{৬} \right)$ ভাগ।

$$= \frac{২}{৬} \text{ ভাগ।}$$

$$= \frac{১}{৩} \text{ ভাগ।}$$

অর্থাৎ যে দু'টি ঘটনা একসাথে ঘটা সম্ভব নয়, তাদের মধ্যে যেকোনো একটি ঘটার সম্ভাব্যতা $= \frac{১}{৩}$ ভাগ।

নিয়ম-৩ : দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা একত্রে ঘটার সম্বাব্যতা হবে ঘটনা দু'টির পৃথক পৃথক সম্ভাব্যতার গুণফলের সমষ্টি।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা জানতে চাই যে, নিখুঁতভাবে গঠিত দু'টি মুদ্রা উপরের দিকে ছুড়ে দিলে মুদ্রা দু'টির একইভাবে হেড পড়ার সম্ভাব্যতা কত? আমরা জানি প্রতিটি মুদ্রার দু'টি পিঠ আছে। সুতরাং এ হিসেবে মুদ্রা দু'টির একসাথে হেড পড়ার সম্ভাব্যতার মাত্রা হবে :

প্রথম মুদ্রার হেড সম্ভাব্যতার মাত্রা হবে $\frac{১}{২}$ ভাগ।

দ্বিতীয় মুদ্রার হেড সম্ভাব্যতার মাত্রা হবে $\frac{১}{২}$ ভাগ।

অতএব দু'টি মুদ্রার একসাথে হেড সম্ভাব্যতার মাত্রা হবে $\frac{১}{২} \times \frac{১}{২}$ ভাগ।

$$= \frac{১}{৪} \text{ ভাগ।}$$

অর্থাৎ দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা একত্রে ঘটার সম্বাব্যতা হবে $= \frac{১}{৪}$ ভাগ।

নিয়ম-৪ : দু'টি ঘটনার মিলিত সম্ভাব্যতা নির্ণয় করতে হলে ঐ দু'টি ঘটনার স্বতন্ত্র অসম্ভাব্যতার মাত্রার গুণফলকে একক থেকে বিয়োগ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, একজন শিক্ষার্থী প্রতি ৬টি প্রশ্নের মধ্যে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তাহলে এক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার মাত্রা $\frac{৫}{৬}$ ভাগ এবং অসম্ভাব্যতার মাত্রা $\frac{১}{৬}$ ভাগ। আবার অপর একজন শিক্ষার্থী প্রতি ৩টি প্রশ্নের মধ্যে ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। তাহলে এক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার মাত্রা $\frac{২}{৩}$ ভাগ এবং অসম্ভাব্যতার মাত্রা $\frac{১}{৩}$ ভাগ ।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী দু'জনের স্বতন্ত্র অসম্ভাব্যতার মাত্রা $\frac{১}{৬} \times \frac{১}{৩}$ ভাগ।

$$= \frac{১}{১৮} \text{ ভাগ।}$$

এখন এই গুণফলকে একক থেকে বিয়োগ করলে বিয়োগফল দাঁড়ায় $= (১ - \frac{১}{১৮})$ ভাগ।

$$= \frac{১৭}{১৮} \text{ ভাগ।}$$

সুতরাং দু'টি ঘটনার মিলিত সম্ভাব্যতা হবে $= \frac{১৭}{১৮}$ ভাগ।

সারসংক্ষেপ

সম্ভাব্যতা পরিমাপের জন্য যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। এ নিয়মগুলো হলো- ১. একটি সরল ঘটনার সম্ভাব্যতার মাত্রা ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, যার লব হবে অনুকূল ঘটনার সংখ্যা এবং হর হবে ঘটনাটি ঘটার মোট সংখ্যা। ২. যে দু'টি ঘটনা একসাথে ঘটা সম্ভব নয়, তাদের মধ্যে যেকোনো একটি ঘটার সম্ভাব্যতা হবে ঘটনা দু'টির পৃথক পৃথক সম্ভাব্যতার যোগফল। ৩. দু'টি স্বতন্ত্র ঘটনা একত্রে ঘটার সম্ভাব্যতা হবে ঘটনা দু'টির পৃথক পৃথক সম্ভাব্যতার গুণফলের সমষ্টি। ৪. দু'টি ঘটনার মিলিত সম্ভাব্যতা নির্ণয় করতে হলে ঐ দু'টি ঘটনার স্বতন্ত্র অসম্ভাব্যতার মাত্রার গুণফলকে একক থেকে বিয়োগ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সম্ভাব্যতা পরিমাপের জন্য কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেছেন-
(ক) যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (খ) যুক্তিবিদ আলেকজেন্ডার বেইন
(গ) যুক্তিবিদ এরিস্টটল (ঘ) যুক্তিবিদ আই. এম. কপি

২। একটি সরল ঘটনার সম্ভাব্যতার মাত্রা কিসের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় ?
(ক) গুণফলের (খ) ভাগফলের
(গ) ভগ্নাংশের (ঘ) যোগফলের

৩। একটি লুডুর গুটির ছয় দিকে ১ থেকে ৬ পর্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকলে সেক্ষেত্রে -

(i) ১ উঠার সম্ভাব্যতা $\frac{৫}{৬}$ ভাগ (ii) ১ উঠার সম্ভাব্যতা $\frac{১}{৬}$ ভাগ

(iii) ৩ উঠার সম্ভাব্যতা $\frac{১}{৬}$ ভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ইউনিট- ৮

সৃজনশীল প্রশ্ন

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন :

১। সম্ভাব্যতার বস্তুগত ভিত্তির পক্ষে মত দেন—
(ক) যুক্তিবিদ যোসেফ (খ) যুক্তিবিদ ফাউলার
(গ) যুক্তিবিদ কার্ভেথ রীড (ঘ) যুক্তিবিদ জেভন্স

২। হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বা ঘটনাবলির মধ্যে সাময়িকভাবে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় না করতে পারার ফলে আমাদের মধ্যে যে চাঞ্চল্যকর ও রহস্যময় অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?
(ক) সম্ভাব্যতা (খ) ব্যাখ্যা
(গ) শ্রেণিকরণ (ঘ) আকস্মিকতা

৩। লৌকিক অর্থে সম্ভাব্যতা হলো—
(i) ঘটনা ঘটার বিষয়টি বিশ্বাস্য বলে মনে করা
(ii) ঘটনাটি ঘটতেও পারে, আবার তা নাও ঘটতে পারে

(iii) ঘটনা না ঘটার বিষয়টি গুরুত্ব না দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

যুক্তিবিদ্যায় এমন একটি বিষয় আছে যার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে এর প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় সেগুলো হলো- এটি একটি মাত্রাগত বিষয়, এটি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা প্রকাশ করে, একে ভগ্নাংশের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, এটি অনুপাতের সাহায্যে প্রকাশযোগ্য, এটি সতর্কতামূলক ও এটি বৈধ প্রকল্পের অনুরূপ। যুক্তিবিদগণের মতামত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর ভিত্তি আত্মগত ও বস্তুগত উভয়ই।

৪। উদ্দীপকটিতে কোন বিষয়টি অবতারণা করা হয়েছে ?

(ক) প্রকল্প (খ) ব্যাখ্যা

(গ) সম্ভাব্যতা (ঘ) শ্রেণিকরণ

৫। উদ্দীপক অনুযায়ী উক্ত বিষয়টির স্বরূপ হলো—

(i) এর ভিত্তি আত্মগত

(ii) এর ভিত্তি বস্তুগত

(iii) এর ভিত্তি আত্মগত ও বস্তুগত কোনোটিই নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। কায়েস অফিস থেকে বাসায় ফিরে হঠাৎ তার প্রবাসী বন্ধু খালেককে দেখে খুবই অবাক হলো। বন্ধুর সাথে গল্প করতে করতে কায়েস দেখল খুব জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। তা দেখে তার মা বলল, " জানালাগুলো বন্ধ করে দাও। এখনই ঝড় আসতে পারে।

ক. আকস্মিকতা কী? ১

খ. সম্ভাব্যতা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. কায়েসের বাসায় ফিরার পরের অনুভূতির স্বরূপ ব্যখ্যা করুন। ৩

ঘ. কায়েসের বাসায় ফিরার পরের অনুভূতি ও তার মা-এর উক্তির পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন। ৪

২। দৃশ্যকল্প - ১ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী ৭০০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫০ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলো।

দৃশ্যকল্প - ২ : তুলি বাড়ীর পাশের জমি চাষ করতে গিয়ে হঠাৎ একটি স্বর্ণের হার পেল।

ক. সম্ভাব্যতার সংজ্ঞা দাও। ১

খ. 'সম্ভাব্যতা একটি মাত্রাগত বিষয়'- বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ. দৃশ্যকল্প - ১ এ সম্ভাব্যতা পরিমাপের যে নিয়মটি প্রয়োগ করা যায় তা উল্লেখপূর্বক এর সম্ভাব্যতা নির্ণয় করুন। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প - ১ ও দৃশ্যকল্প - ২ এর একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রদান করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১ ঃ ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২ ঃ ১-ঘ, ২-গ, ৩-খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩ ঃ ১-ক, ২-খ, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪ ঃ ১-ঘ, ২-গ, ৩-ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫ ঃ ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬ ঃ ১-খ, ২-গ, ৩-গ

নমুনা প্রশ্ন
যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র
বিষয় কোড :HSC – 2860

রচনামূলক (সৃজনশীল)

পূর্ণমান : ৬০

সময় : ২ ঘন্টা ১০ মিনিট

[ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক ।]

নিচের উদ্দিপকগুলো পড়ে যে কোন ৬ টি প্রশ্নের উত্তর দিন । ৬×১০ = ৬০

১। নাবিহা তার পরিবারের সকলকে নিয়ে মা-বাবার সাথে গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্কে বেড়াতে গেল । সেখানে তারা অনেক জীবজন্তু পর্যবেক্ষণ করল । এক পর্যায়ে সিংহের খাঁচার নিকট গিয়ে নাবিহার বাবা তাকে বলল, " এটি পশুর রাজা ।"

ক. সংজ্ঞেয় পদ কাকে বলে ? ১

খ. সংজ্ঞা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যসূচীর কোন্ বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে কী কোন অনুপপত্তি ঘটেছে? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন । ৪

২। শিক্ষকের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থী বলল,"মুদ্রা পাঁচ প্রকার, যথা- স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা, তাম্রমুদ্রা, ব্রোঞ্জমুদ্রা ও কাগজের নোট ।" এরপর শিক্ষকের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা বলল," ত্রিভুজ দুই প্রকার, যথা- সমবাহু ত্রিভুজ ও বিষমবাহু ত্রিভুজ ।"

ক. দ্বিকোটিক বিভাগ কাকে বলে? ১

খ. উল্লম্ফন বিভাগ কেন ত্রুটিপূর্ণ হয়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন । ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শিক্ষার্থীদের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেকার একটি তুলনামূলক ব্যাখ্যা করুন । ৪

৩। জামিল ও রাব্বি দুই ভাই । তারা একই কলেজে লেখাপড়া করে । জামিলের মত রাব্বিও ক্রিকেট খেলতে ভালোবাসে । জামিল এবার মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে । তা দেখে সবাই ধারণা করল, আগামী বছর রাব্বিও বড় ভাই জামিলের মত মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ পাবে । এ জাতীয় ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়না ।

ক. কাকে আরোহের প্রাণ বলে? ১

খ. পূর্ণাঙ্গ আরোহ প্রকৃত আরোহ নয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে সকলের ধারণা অনুমানের কোন্ দিকটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করুন । ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে সকলের ধারণাটি এক ধরণের অনুপপত্তি নির্দেশ করে'-উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন । ৪

৪। ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় একাদশ শ্রেণির ক্লাস পরিদর্শনে গিয়ে দেখলেন যে ঐ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী শিক্ষকের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে । এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে বললেন যে, একাদশ শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী মনোযোগী । এরপর ক্লাসে উপস্থিত শিক্ষক জনাব শান্তনু অধ্যক্ষ মহোদয়কে বললেন যে, এ যাবত যে সব শিক্ষার্থী নিয়মিত ক্লাস করেছে তারা সকলেই পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পেরেছে ।

ক. বৈজ্ঞানিক আরোহ কাকে বলে? ১
খ. যুক্তিসাম্যমূলক আরোহকে কেনো প্রকৃত আরোহ বলা যায় না? ২
গ. উদ্দীপকে শিক্ষক জনাব শান্তনুর বক্তব্যে কোন্ ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. অধ্যক্ষ মহোদয়ের বক্তব্যে যে অনুমানের আভাস পাওয়া যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন। ৪

৫। দৃশ্যকল্প - ১ : জনাব আরিফুজ্জামান একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ না থাকায় তিনি পরীক্ষাগারে বিদ্যুৎকে এক জাতীয় তরল পদার্থ হিসেবে গণ্য করেন।

দৃশ্যকল্প - ২ : আকরাম সাহেব শরীরে জ্বর জ্বর অনুভব করছেন। এমতাবস্থায় তাঁর স্ত্রী রেবেকা এসে তাঁর হাতে একটি আইসক্রীম দিয়ে বললেন এটি খেয়ে নিন, তাহলে জ্বর সেরে যাবে।

ক. কাজ চালানো প্রকল্প কাকে বলে? ১
খ. সংকট উত্তরক দৃষ্টান্ত বলতে কী বুঝায়? ২
গ. দৃশ্যকল্প - ২ এ প্রকল্পের কোন্ শর্তটি অনুসরণ করা হয়নি? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ। দৃশ্যকল্প - ১ এ জনাব আরিফুজ্জামানের কাজটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন। ৪

৬। সম্রাট নেপোলিয়ন যখনই নিজে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তখনই তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে জয় লাভ করেছে। অন্যদিকে, যখনই নিজে অনুপস্থিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তখনই তাঁর সৈন্যদল যুদ্ধে পরাজয় বরন করেছে। অতএব, সম্রাট নেপোলিয়নের উপস্থিতিই যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কারণ।

ক. ব্যতিরেকী পদ্ধতির সংজ্ঞা দিন। ১
খ. অন্বয়ী পদ্ধতিকে কেন সাদৃশ্য বা মিলের পদ্ধতি বলা হয়। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টিতে আপনার পাঠ্যপুস্তকের কোন্ বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকটিতে নির্দেশিত বিষয়কে 'আবিষ্কার ও প্রমাণের পদ্ধতি হিসাবে গণ্য করা যায়'- আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

৭। এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সুনামির ক্ষয়ক্ষতির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, ঘন্টায় ৫০ কি. মি. গতিতে সুনামি উপকূলে আঘাত হানে। তাই উপকূলবর্তী ঘরবাড়ী ও গাছপালা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং মানুষের জানমালের ক্ষতি হয়। কিন্তু এলাকার বয়স্ক ব্যক্তি রমিজ মিয়া বললেন, " সমুদ্রদেবতা অসন্তুষ্ট হলেই কেবলমাত্র এমন ঘটনা ঘটে।"

ক. বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কাকে বলে? ১
খ. লৌকিক ব্যাখ্যা কেন যথার্থ ব্যাখ্যা নয় ? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রমিজ মিয়ার উক্তিটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রমিজ মিয়ার ও এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ব্যাখ্যার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৪

৮। একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী তার নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য গাছগাছড়ার রোগ নিরাময় ক্ষমতার ভিত্তিতে এগুলোর শ্রেণিবিণ্যাস করেন। অন্যদিকে একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী ফুলের ভিত্তিতে সপুষ্পক ও অপুষ্পক এ দু'ভাগে ভাগ করেন।

ক. শ্রেণিকরণ কী? ১
খ. শ্রেণিকরণের সীমা বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্ভিদবিজ্ঞানীর গাছের শ্রেণিবিণ্যাসের প্রক্রিয়াটি কী নির্দেশ করে? আলোচনা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীর গাছের শ্রেণিবিণ্যাসের প্রক্রিয়াটির পার্থক্য নির্দেশ করুন? ৪

৯। কায়েস অফিস থেকে বাসায় ফিরে হঠাৎ তার প্রবাসী বন্ধু খালেককে দেখে খুবই অবাক হলো। বন্ধুর সাথে গল্প করতে করতে কায়েস দেখল খুব জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে। তা দেখে তার মা বলল, " জানালাগুলো বন্ধ করে দাও। এখনই ঝড় আসতে পারে।

ক. আকস্মিকতা কী? ১

খ. সম্ভাব্যতা বলতে কী বুঝায়? ২

গ. কায়েসের বাসায় ফিরার পরের অনুভূতির স্বরূপ ব্যখ্যা করুন। ৩

ঘ. কায়েসের বাসায় ফিরার পরের অনুভূতি ও তার মা-এর উক্তির পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন। ৪

নমুনা প্রশ্ন
যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র
বিষয় কোড :HSC – 2860

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
পূর্ণমান : ৪০
সময় : ৪০ মিনিট

[প্রত্যেক প্রশ্নের মান সমান। সকল প্রশ্নের উত্তর দিন।]

১। যৌক্তিক সংজ্ঞার সাহায্যে মানব মনের বিভিন্ন বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূর করা যায়। কারণ-

(ক) এটি একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া (খ) এটি একটি অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া
(গ) এটি একটি লৌকিক প্রক্রিয়া (ঘ) এটি একটি সরল প্রক্রিয়া

২। আরোপক সংজ্ঞায়-

(i) ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নতুন শব্দ বা প্রতীকের অর্থ প্রদান করে থাকে
(ii) সত্যতা বা মিথ্যাত্ব কোনোটিই আরোপ করা যায় না
(iii) ব্যক্তির উদ্দেশ্যই মূখ্য

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) ii ও iii (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

৩। নিচের কোন্‌টিতে রূপক বা আলঙ্কারিক সংজ্ঞা অনুপপত্তি ঘটেছে?

(ক) পাপ নয় পূণ্য (খ) সিংহ হয় পশুর রাজা
(গ) মানুষ হয় মানব সন্তান (ঘ) মানুষ হয় এক শ্রেণীর প্রাণী

৪। নিচের কোন্‌টি কার্য-কারণ নীতির প্রকৃতি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়?
(ক) আরোহের আকারগত ভিত্তি (খ) আরোহের বস্তুগত ভিত্তি
(গ) বিজ্ঞানের স্বীকার্য সত্য (ঘ) কারণ ও কার্যের প্রকৃতি এক

৫। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল প্রবর্তিত মৌলিক পদ্ধতিগুলো হলো-

(i) অন্বয়ী পদ্ধতি (ii) ব্যতিরেকী পদ্ধতি
(iii) পরিশেষ পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। পরিশেষ পদ্ধতির অপনয়ন সূত্রটি প্রদান করেছেন-
(ক) যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (খ) যুক্তিবিদ আলেকজান্ডার বেইন
(গ) যুক্তিবিদ এইচ. ডব্লিউ. বি. যোসেফ (ঘ) যুক্তিবিদ এইচ. এস. মেলোন

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ নং ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে রায়হান বললো, রাহু দেবতা চাঁদকে গ্রাস করায় এমন হয়। কিন্তু তাঁর শিক্ষক জনাব মাজেদ বললেন, চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কিত সঠিক ব্যাখ্যা হলো- পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে অবস্থান করায় এমন হয়।

৭। উদ্দীপকটিতে রায়হানের বক্তব্যে কিসের প্রতিফলন ঘটেছে?
(ক) লৌকিক ব্যাখ্যার (খ) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার
(গ) আরোহের (ঘ) শ্রেণিকরণের

৮। উদ্দীপকটিতে রায়হান ও তার শিক্ষকের বক্তব্য তুলনা করলে দেখা যায় যে-
(i) রায়হানের ব্যাখ্যাটি হলো লৌকিক ব্যাখ্যা
(ii) শিক্ষকের ব্যাখ্যাটি হলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা
(iii) উভয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯। যুক্তিবিদ মিল ও বেইন কাকে আরোহের প্রাণ বা অন্তঃসার বলে অভিহিত করেছেন?
(ক) বাস্তব ঘটনার পর্যবেক্ষণকে (খ) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতিকে
(গ) কার্যকারণ নিয়মকে (ঘ) আরোহাত্মক উল্লম্ফনকে

১০। নিচের কোনটি শ্রেণিকরণের বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) একটি বিশষ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে (খ) এক ধরনের বিন্যস্তকরণ
(গ) একটি মানসিক প্রক্রিয়া (ঘ) সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবেচ্য নয়

১১। প্রকল্পের তৃতীয় স্তর কোন্‌টি ?
(ক) ঘটনার নিরীক্ষণ (খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ
(গ) আনুমানিক ধারণা (ঘ) সমর্থন

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১২ নং ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

অন্বয়ী পদ্ধতির প্রকৃতিগত ত্রুটি দূর করার জন্য যুক্তিবিদ জে. এস. মিল (J. S. Mill) একটি পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। এ পদ্ধতিতে মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত থাকে। এর একটিতে আলোচ্য ঘটনা ও তার সাথে অন্য একটি অবস্থা উপস্থিত থাকে। আবার অপরটিতে আলোচ্য ঘটনা এবং ঐ বিশেষ অবস্থা উভয়ই অনুপস্থিত থাকে। দৃষ্টান্ত দু'টির মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল থাকে এবং শুধুমাত্র একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকে। আর পার্থক্যের বিষয়টি হলো আলোচ্য ঘটনা ও একটি অবস্থার উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি। এ পার্থক্যের ভিত্তিতেই উক্ত পদ্ধতিতে ঘটনাটির সাথে ঐ অবস্থার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়।

১২। উদ্দীপকটিতে যে পদ্ধতির ইঙ্গিত রয়েছে তাহলো-
(ক) অন্বয়ী পদ্ধতি (খ) ব্যতিরেকী পদ্ধতি

(গ) যৌথ অন্বয়ী-ব্যতিরেকী পদ্ধতি (ঘ) পরিশেষ পদ্ধতি

১৩। উদ্দীপকটিতে প্রতিফলিত পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিচের কোনগুলি প্রযোজ্য?

(i) কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় (ii) অন্যান্য পদ্ধতির সিদ্ধান্ত যাচাই করা যায়

(iii) বহুকারণের সম্ভাবনা থেকে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৪। অবৈজ্ঞানিক আরোহ প্রতিষ্ঠিত -

(i) কার্য-কারণ নীতির উপর (ii) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর

(iii) অবাধ অভিজ্ঞতার উপর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫। শ্রেণিকরণ কত প্রকার?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

১৬। নিচের কোনগুলো শ্রেণিকরণের সীমা নির্দেশ করে?

(i) পরতম জাতি (ii) প্রান্তিক বস্তু

(iii) সংজ্ঞায়নযোগ্য বিষয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৭। প্রকল্পের উৎস হলো-

(i) সরল গণনামূলক আরোহ (ii) যুক্তিবাক্যের সরল আবর্তন

(iii) বৈজ্ঞানিক কল্পনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৮ নং ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রিনা ও মিনা এমন একটি বিষয় নিয়ে কথা বলছিল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যার কার্যাবলি বিভিন্ন ধাপে বিভক্ত এবং একে একটি একটি করে ধাপ অতিক্রম করতে হয়। সর্বশেষ ধাপে এসে তা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবের অনুরূপ হয়, তাহলে সেটি সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং তা তত্ত্ব বা সূত্র হিসেবে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এই তত্ত্বই আবার অন্য কোনো ঘটনার ব্যাখ্যায় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

১৮। উদ্দীপকটিতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তাহলো-

(ক) প্রকল্প (খ) ব্যাখ্যা

(গ) আরোহ (ঘ) শ্রেণিকরণ

১৯। উদ্দীপকটিতে যে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে নিচের কোনগুলি প্রযোজ্য?

(i) এতে চারটি স্তর পরিলক্ষিত হয় (ii) সিদ্ধান্ত গ্রহণ হলো এর তৃতীয় স্তর

(iii) এতে আনুমানিক ধারণা বিদ্যমান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০। মিশ্র কার্যকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করাকে বলে-

(ক) বিশ্লেষণ (খ) শৃংখল-যোজন

(গ) সংজ্ঞায়ন (ঘ) অন্তর্ভুক্তি

২১। নিচের কোন্‌টি বিজ্ঞানের গবেষণামূলক কার্যক্রমে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে?

(ক) আকস্মিকতা (খ) নিশ্চয়তা

(গ) সম্ভাবনা তত্ত্ব (ঘ) অনিশ্চয়তা

২২। "প্রকল্প হলো ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা; কোনো ঘটনাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যে সাময়িক ধারণা করা হয় তাকে প্রকল্প বলে।" প্রকল্পের এ সংজ্ঞাটি প্রদান করেছেন-

(ক) জন স্টুয়ার্ট মিল (খ) ই. নেগেল

(গ) কফি (ঘ) কোহেন মরিস

২৩। নিচের কোন্ যুক্তিবিদ মনে করেন যে, অবৈজ্ঞানিক আরোহের কোনো বৈজ্ঞানিক মূল্য নেই?

(ক) আলেকজান্ডার বেইন (খ) যুক্তিবিদ ফ্রান্সিস বেকন

(গ) যুক্তিবিদ কার্ভেথ রিড (ঘ) জন স্টুয়ার্ট মিল

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৪ নং ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

আরোহ অনুমানে আমরা প্রথমে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে যে অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান পাই তার উপর নির্ভর করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমুদয় ঘটনা সম্বন্ধে একটি সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমান করি। এভাবে কিছু জানা ঘটনাকে ভিত্তি করে অজানা ঘটনায়, বিশেষ থেকে সার্বিকে বা কম ব্যাপক ঘটনা থেকে বেশি ব্যাপক ঘটনায় গমনের প্রক্রিয়া একটি বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশ করে।

২৪। উদ্দীপকটিতে নিচের কোন প্রক্রিয়াটির কথা বলা হয়েছে?

(ক) প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা নীতির (খ) কার্য-কারণ নিয়মের

(গ) অবাধ অভিজ্ঞতার (ঘ) আরোহাত্মক উল্লম্ফনের

২৫। উদ্দীপকের আলোকে নিচের কোন বিষয়গুলো সঠিক?

(i) বৈজ্ঞানিক আরোহের একটি মূল বৈশিষ্ট্য (ii) বৈজ্ঞানিক আরোহের প্রাণ

(iii) সার্বিক সিদ্ধান্ত অনুমানে সহায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬। নিচের কোন্ ক্ষেত্রে যৌক্তিক বিভাগ সম্ভব?

(ক) ব্যক্তিবাচক পদের ক্ষেত্রে (খ) জাতিবাচক পদের ক্ষেত্রে

(গ) একক পদের ক্ষেত্রে (ঘ) বিশিষ্ট পদের ক্ষেত্রে

২৭। আকস্মিকতা হলো-

(i) হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা (ii) ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

(iii) কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ে ব্যর্থতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৮। প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রগুলো হলো-

(i) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান (ii) বাস্তব জীবনের জটিল ও রহস্যময় সমস্যা

(iii) অধিকতর নিশ্চয়তামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯। সম্ভাব্যতার আত্মগত ভিত্তির পক্ষে মত দেন-

(ক) যুক্তিবিদ যোসেফ (খ) যুক্তিবিদ ফাউলার

(গ) যুক্তিবিদ মিল (ঘ) যুক্তিবিদ জেভন্স

৩০। যৌক্তিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজ্য পদের ব্যক্ত্যর্থ বিভক্ত উপজাতিগুলোর ব্যক্ত্যর্থের যোগফলের -

(ক) বেশি হবে (খ) কম হবে

(গ) কম বা বেশি উভয়ই হবে (ঘ) সমান হবে

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩১ নং ও ৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :

রহমান সাহেব তার বড় ভাই ইয়াছিন সাহেবকে মানুষের সংজ্ঞা দিতে বলায় তিনি বললেন, "মানুষ হয় এক শ্রেণীর প্রাণী"। কিন্তু রহমান সাহেব তাঁর সংজ্ঞায় সন্তুষ্ট হতে না পেরে তিনি তাঁকে জানালেন যে, " মানুষ হয় এমন প্রাণী যার বিচার ক্ষমতা আছে"।

৩১। উদ্দীপকটির ইয়াছিন সাহেবের উক্তিতে কোন ধরনের অনুপপত্তি ঘটেছে?

(ক) সমষ্টি সংজ্ঞা অনুপপত্তি (খ) বাহুল্য সংজ্ঞা অনুপপত্তি

(গ) অতি ব্যাপক সংজ্ঞা অনুপপত্তি (ঘ) সমগ্র সংজ্ঞা অনুপপত্তি

৩২। উদ্দীপকে রহমান সাহেবের উক্তিতে-

(i) যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে

(ii) যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয়েনি

(iii) অতি ব্যাপক বা অসম্পূর্ণ সংজ্ঞাজনিত অনুপপত্তি ঘটেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৩। নিচের কোন্‌টি অন্বয়ী পদ্ধতির সুবিধা নয় ?
(ক) পরিসর ব্যাপক (খ) প্রকল্প গঠনে সহায়ক
(গ) ব্যতিরেকী পদ্ধতির পরিপুরক (ঘ) ব্যবহারিক ত্রুটি

৩৪। "যা ভিন্ন একটি ঘটনার কারণ বলে পরিচিত তা কিছুতেই আলোচ্য ঘটনার কারণ হতে পারে না।" সূত্রটি-
(i) পরিশেষ পদ্ধতির অপনয়ন সূত্র (ii) পরিশেষ পদ্ধতির সূত্র
(iii) যোসেফ প্রদান করেছেন

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৫। সম্ভাবনার ধারণাটি সাধারণত ক'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়?
(ক) দু'টি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৩৬। বৈজ্ঞানিক অর্থে সম্ভাব্যতা হলো-
(i) ঘটনা না ঘটার চেয়ে ঘটার বিষয়টিই বিশ্বাস্য
(ii) ঘটনাটি ঘটতেও পারে, আবার তা নাও ঘটতে পারে
(iii) অসম্ভব ও নিশ্চিত এ দু'য়ের মধ্যবর্তী অবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৭। যুক্তিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল কয়টি পরীক্ষণমূলক পদ্ধতির কথা বলেন?
(ক) দইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৩৮। দ্বিকোটিক বিভাগ হলো-
(i) আকারগত প্রক্রিয়া (ii) একটি নিখুঁত ও নির্ভুল প্রক্রিয়া
(iii) সহজ-সরল প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও ii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৯ নং ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
গণিতের শিক্ষার্থী আসাদ ত্রিভুজকে ভাগ করতে গিয়ে একে 'সমবাহু' ও 'বিষমবাহু' 'সমদ্বিবাহু' ও 'দ্বিবাহু' এ চারভাগে ভাগ করলো। অন্যদিকে পুষ্টিবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী জামান একটি আপেলকে এর বিভিন্ন রং, আকার, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি গুণে ভাগ করলো।

৩৯। উদ্দীপকটিতে গণিতের শিক্ষার্থী আসাদ ত্রিভুজকে ভাগ করতে গিয়ে -
(ক) অঙ্গগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটিয়েছে
(খ) অতিব্যাপক বিভাগ অনুপপত্তি ঘটিয়েছে
(গ) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটিয়েছে
(ঘ) কোনো অনুপপত্তি ঘটিয়নি

৪০। উদ্দীপকে পুষ্টিবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী জামান এর বিভাজন প্রক্রিয়ায় -

(i) যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয়েছে

(ii) যৌক্তিক বিভাগের নিয়ম যথাযথ অনুসরণ করা হয়েনি

(iii) গুণগত বিভাগ অনুপপত্তি ঘটিছে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

মান বন্টন: পূর্ণমান ১০০

- রচনামূলক (সৃজনশীল) প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহু নির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
- প্রতিটি রচনামূলক (সৃজনশীল) প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনী প্রশ্নের নম্বর ১।
- সৃজনশীল প্রশ্ন: রচনামূলক (সৃজনশীল) অংশে মোট ০৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং উত্তর দিতে হবে মোট ০৬টি প্রশ্নের।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: ৪০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ড. মো. মতিউর রহমান : *প্রচলিত পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা*, ঢাকা, দিব্য প্রকাশ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০২ ।

ড. এম. মতিউর রহমান : *সাবেকী ও প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা*, ঢাকা, পুথিঘর লিঃ, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬ ।

ডঃ আবদুল মতীন : *প্রতীকী যুক্তিবিদ্যা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২ ।

আবদুল মতীন : *দার্শনিক যুক্তিবিদ্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ ।

সরদার ফজলুল করিম : *দর্শন কোষ*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০২ ।

কালী প্রসন্ন দাস (অনূদিত) : *যুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০০ ।

রমাপ্রসাদ দাস : *সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৪ ।

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, শ্রীমৃন্ময় বসু : *পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞান*, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, ১৯৭৯ ।

ড. এম. হুদা, মোঃ আনছার উদ্দীন, আলেয়া আক্তার : *যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র*, মল্লিক ব্রাদার্স, সপ্তবিংশ সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৪ ।

সাইয়েদ আবদুল হাই : *দর্শন ও মনোবিদ্যা পরিভাষা কোষ* (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৬ ।

সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসাইন : *যুক্তিবিদ্যা পরিচয়*, প্রভাতী লাইব্রেরি, ঢাকা, ২০০১ ।

মোঃ মাহবুবুর রহমান : *যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র*, গ্লোব লইব্রেরি (প্রাঃ) লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ২০১৫ ।

প্রফেসর মোঃ গোলাম মোস্তফা, শামীম আরা, শাহানা দিলশাদ : *যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র*, পূর্বদেশ পাবলিকেশনস লিঃ, ঢাকা, ২০১৭ ।

প্রফেসর রুকুন উদ্দিন আহমেদ : *যুক্তিবিদ্যা দ্বিতীয় পত্র*, হাসান বুক হাউস, ঢাকা, ২০১৫ ।

রামদুলাল রায় : *সাধারণ যুক্তিবিদ্যা*, ঢাকা : সুরভী পাবলিকেশন্স, ২০০৭ ।

Alexander Bain : *Logic- Induction*, part second, Longmans, Green Reader and Dyer, London, 1870

Carveth Read : *Logic : Deductive and Inductive,* Grant Richards, 9 Henrietta Street, Covent Garden, London, 1898

Cohen, M.R. and E. Nagel : *An Introduction to Logic and Scientific Method.* Routledge & Kegan Paul Ltd. London, 1978.

Thomas Fowler : *The Elements of Inductive Logic,* 4th edition, Oxford At the Clarendon press, 1883.

H.W.B. Joseph : *An Introduction to Logic,* 2nd edition, revised, Oxford at the Clarendon press, 1916

J. N. Keynes : *Formal Logic,* 4th edition, Macmillan and Co. Ltd. London, 1900.

L. S. Stebbing : *A Modern Introduction To Logic,* Methuen & 00. Ltd. London, Third Edition, 1942

Latta and Macbeath : *The Elements of Logic,* Macmillan and Co. Ltd. London, 1929.

J.S.Mill : *A System of Logic.* People's edition, Longmans, Green, and Co. London, 1889.

S. H. Mellone : *An Introductory Textbook of Logic,* William Blackwood and Sons, Edinburgh and London, MCMII, 1902.

Irving M. Copi : *Symbolic Logic,* 5th edition, Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi, 1997.

Irving M. Copi : *Introduction to Logic,* The Macmillan Company, New York.